৭০০

২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স কমান্ডার খালেদের কথা



২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স কমান্ডার

খালেদের কথা

সম্পাদনা । মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

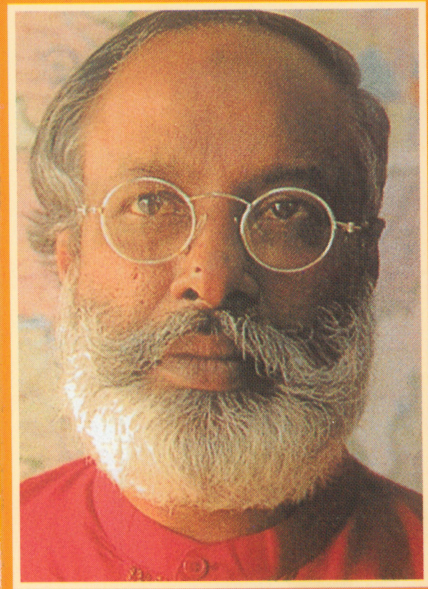


তখনো সেক্টর গঠিত হয়নি। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে মেজর খালেদ মোশাররফ ত্রিপুরা রাজ্যের মতিনগরে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করেছেন। ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, ফরিদপুর থেকে হাজার হাজার মুক্তিপাগল ছাত্র-জনতা উপস্থিত মতিনগরে। মেজর খালেদ এক বক্তৃতায় তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি তোমাদের দেশপ্রেম শেখাবো না। দেশপ্রেম এমনিতেই তোমাদের আছে, না হলে তোমরা এখানে আসতে না। আমার কাজ তোমাদের যুদ্ধ শেখানো। আর যেভাবে যুদ্ধ শেখানো উচিত তার সময় এবং সুযোগ এখানে নেই। তোমরা যুদ্ধ করেই যুদ্ধ শিখবে। যুদ্ধের মাঠই তোমাদের প্রশিক্ষণ একাডেমী'।

ছেলেরা অনুপ্রবেশের আগে বাংলাদেশ থেকে আনা একমুঠো মাটি যোদ্ধাদের হাতে দিয়ে শপথ করাতেন। বলতেন, 'তোমাদের হাতে একমুঠো বাংলাদেশের মাটি। এই একমুঠো মাটি যথেষ্ট নয়। আমাদের দরকার গোটা বাংলাদেশের মাটি'।

খালেদ ছিলেন দেশপ্রেম উজ্জীবিত করার এক জাদুকর।

সেই অনন্য জাদুকরকে নিয়ে এ বই।



আলোকচিত্র ▪ নাসির আলী মামুন

জন্ম : ২৪ জুলাই ১৯৫২। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে যখন তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তখনই ডাক এল মুক্তি সংগ্রামের। যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরে এক তরুণ গণযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের দুই কিংবদন্তি মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন হায়দারের সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের পাশে পাশে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হিরন্ময় দিনগুলিতে। একাত্তরে বীরযোদ্ধাদের পাশাপাশি নিজেকে শানিত করেছেন স্বদেশপ্রেমের এক প্রগাঢ় চেতনায়। বাহাত্তরের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হলেও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের কারণে চুয়াত্তরের ৯ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং পচাত্তরের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৩ সালের বেইজিং ল্যাংগুয়েজ ইউনিভার্সিটি থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ১২ জুলাই ১৯৯৬ সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন-এ যেমন উচ্চ শ্লাঘার, একমাত্র পুত্র শিশু সাবিতের মৃত্যু তেমনি তার হৃদয়ের গভীরতম ক্ষত। তবুও এ ক্ষত নিয়ে, এই বিক্ষত সময়ে তিনি সবুজআদৃত এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তার অপরাপার গ্রন্থের নাম *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা, বিজয়ী হয়ে ফিরব নইলে ফিরবই না, স্বাধীনতা (প্রথম খণ্ড)* সম্পাদনা।

২নং সেক্টর এবং কে ফোর্স কমান্ডার

খালেদের কথা

২নং সেক্টর এবং কে ফোর্স কমান্ডার

খালেদের কথা

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

২নং সেক্টর এবং কে ফোর্স কমান্ডার : খালেদের কথা
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া সম্পাদিত

প্রকাশক

CENTRE FOR
BANGLADESH
LIBERATION WAR STUDIES

সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ
এপার্টমেন্ট # ৪ বি, বাড়ি # ৪৪৮/এ
রোড # ৭ (পূর্ব), বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা ১২০৬
ফোন #০১৫৫২ ৪৪৯৪০৪, ০১৭১১ ৫৩৬৫০০
ই-মেইল : cblws 1971 @ yahoo. com

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
সুপার গ্রীন প্রেস
৬১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

একমাত্র পরিবেশক
অনন্যা
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১১৬৪৩

U.K Distributor □ **Sangeeta Limited**, 22, Brick Lane, London
U.S.A Distributor □ **Muktadhara**, 37-69, 74 St., 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372
Canada Distributor □ **Anyamela**, 300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202

মূল্য : দুইশত টাকা

Doi Nombor Sector Abong K Force Commander : Khaleder Kotha Edited by Major Qamrul Hassan Bhuiyan and also Published by him on behalf of Centre for Bangladesh Liberation War Studies, Apartment # 4B, House # 448/A, Road # 7 (East), Baridhara DOHS, Dhaka 1206. Cover Design by Dhrubo Esh. Price Taka : 200.00 Only US # 8

ISBN 984 70008 0001 5

উৎসর্গ

একাত্তরের খালেদকে
কখনো কমান্ডার, কখনো অভিভাবক, কখনো বন্ধু

সম্পাদকের কথা

খালেদ মানে খালেদ মোশাররফ অর্থাৎ আমাদের ২ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ—মুক্তিযুদ্ধের এক কিংবদন্তি।

ঊনিশ শ' সত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেজর খালেদ বৃটিশ আর্মির সাথে সংযুক্ত হন। ফিরে আসেন ছয় মাস পর একাত্তরের মার্চের মাঝামাঝি। এর মধ্যে দেশে পরিবর্তন বিশাল। বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিদের সশস্ত্র আক্রমণের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি চূড়ান্ত। মেজর খালেদ বৃটেন যাবার পূর্বে ছিলেন ঢাকাস্থ ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর। উনি ফেরত এসে স্বাভাবিকভাবে এ পদেই আবার যোগ দেন। কিন্তু ততদিনে ৫৭ ব্রিগেডের অবয়ব এবং তার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব খানের মননের এতই পরিবর্তন হয়েছে যে মেজর খালেদ আর তার ব্রিগেড মেজর থাকার যোগ্য রইলেন না। অপারেশন-সার্চলাইট ঢাকা এলাকায় কার্যকর করার দায়িত্ব পাকিস্তানী এই ব্রিগেডের। পাকিস্তান থেকে ফেব্রুয়ারির শেষে এসে যোগ দিয়েছে ১৮ পাঞ্জাব এবং ২২ বালুচ রেজিমেন্ট। ১৯ মার্চ মেজর খালেদকে জয়েনিং টাইম ছাড়া বদলী করা হয় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক হিসেবে, কুমিল্লা সেনানিবাসে। মেজর খালেদ পাকিস্তানিদের কাছে ছিলেন আতংকের বিষয়। তার স্থলে আনা হয় পাকিস্তানি এক অফিসার মেজর জাফর আহমদকে।

মেজর খালেদ মোশাররফ যখন ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি সৈনিক এবং লে. মাহবুবুর রহমানকে নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করতে সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি মৌলভীবাজারের শমশেরনগরে। তখন তার চাকুরি ১২ বছর ১১ মাস, বয়স ৩৩ বছর ৫ মাস। [জন্ম : ১ নভেম্বর ১৯৩৭, কমিশন : ২৭ এপ্রিল ১৯৫৮, ১৭ পিএমএ লং কোর্স]।

পরবর্তীতে ঢাকা-কুমিল্লা-নোয়াখালি এবং ফরিদপুরের একাংশ নিয়ে গঠিত ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় মেজর খালেদকে। ২ নম্বর সেক্টরের গুরুত্ব ছিল ভিন্ন মাত্রার। রাজধানী ঢাকা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ এবং ঢাকা-সিলেট সড়ক ও রেল যোগাযোগ ছিল ২ নম্বর সেক্টরের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মধ্যে। এই সেক্টরের গণযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। গোটা মুক্তিযুদ্ধের উত্তপ্ত রণাঙ্গন সালদা নদী ও বিলোনিয়া ছিল এ সেক্টরেরই অন্তর্ভুক্ত।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নির্দেশিত হয়ে মেজর খালেদ মোশাররফ একটি ব্রিগেড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের

অল্পকিছু পুরানো সৈনিক এবং গণযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত হয় নতুন ব্রিগেড—কে ফোর্স। মেজর জিয়া এবং মেজর সফিউল্লাহর জেড ও এস ফোর্সের মত মেজর খালেদের ইংরেজি নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে ব্রিগেডটির নামকরণ করা হয়। একই সময় তাকে লে. কর্নেল পদে উন্নীত করে কে ফোর্সের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭১ সনের ২২ অক্টোবর তিনি আহত হলে মেজর আবদুস সালেক চৌধুরী কে ফোর্সের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার নিযুক্ত হন। ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর এটিএম হায়দার।

১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমী মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। সে প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের বক্তব্য গ্রহণ করে। সেগুলি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৪ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয় *'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'* নামে পনের খণ্ড-এ। সশস্ত্র যুদ্ধ সংকুলান করা হয়েছে ৯ম, ১০ম এবং ১১শ খণ্ড-এ সশস্ত্র যুদ্ধ-১, সশস্ত্র যুদ্ধ-২ এবং সশস্ত্র যুদ্ধ-৩ নামে। ১১শ খণ্ড কেবল দলিলপত্র। ৯ম ও ১০ম খণ্ড-এ মেজর খালেদ মোশাররফের দীর্ঘ দুটি সাক্ষাৎকার পত্রস্থ করা হয়। এগুলি গ্রহণ করা হয় ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে। (লজ্জার কথা সে প্রকল্পের একটি ফটো ছাড়া একটি পাতাও আজ নেই বাংলা একাডেমীতে।) মেজর খালেদের সে দুটি সাক্ষাৎকার এত বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ যে পড়ে অবাক হতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের অনেক দলিল, চিঠিপত্র ও পরিস্থিতি প্রতিবেদন (Situation Report) সেনাবাহিনী সদর দপ্তর, মিলিটারী অপারেশন পরিদপ্তরে রক্ষিত ছিল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ছিলেন চীফ অফ জেনারেল স্টাফ। মিলিটারী অপারেশন পরিদপ্তর ছিল তারই অধীনে। ধারণা করি Situation Report-গুলি পর্যালোচনা করে এবং তার প্রখর স্মৃতি হাতড়িয়ে তিনি এ দুই প্রস্থপ্রবন্ধ লিখেছেন। এ যুদ্ধ কাহিনী বহুল পঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই পনের খণ্ড বই একসাথে কেনার কোনো বিকল্প নেই। বইগুলোও দুষ্প্রাপ্য এবং দামী। পাঠকের সুবিধার্থে ৯ম ও ১০ম খণ্ড-এ মেজর খালেদ মোশাররফের লেখা দুটি একসাথে করে বই আকারে মুদ্রিত করেছি।

বিলোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হয় নভেম্বরের ৫ তারিখ দিবাগত রাত থেকে। খালেদ আহত হন ২২ অক্টোবর। স্বভাবতই বিলোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ লিখতে তাকে পরনির্ভর হতে হয়েছে। ফলে তার বিলোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ বর্ণনায় কিছু অসঙ্গতি দেখা যায়। (আগ্রহী পাঠকদের জানাচ্ছি—বিলোনিয়া যুদ্ধের সমর নায়ক এবং গণযোদ্ধাদের লেখা সংগ্রহ করে এবং সবাইকে একত্র করে তথ্যের নির্ভুলতা যাচাই করে বিলোনিয়া যুদ্ধের অন্যতম যোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা *'ফেনী বিলোনিয়া : রণাঙ্গনের এক প্রান্তর'* নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। বইটি প্রকাশ করেছে সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ।)

এপ্রিলের শেষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার, উইং কমান্ডার এসকে বাশারসহ পাঁচজন বৈমানিক আগরতলা পৌঁছান। অব্যবহিত পরে পৌঁছান আরো তিন জন। অল্প কয়েকদিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকার, উইং কমান্ডার বাশার এবং পাইলট অফিসার বদরুল আলম দিল্লি চলে যান। আগরতলার শালবাগানে ছিল ভারতীয় ডেলটা ('ডি') সেক্টরের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং-এর সদর দপ্তর যার অধীনে ছিল আমাদের ১, ২ এবং ৩ নম্বর সেক্টর। মে মাসের প্রথম সপ্তাহের একদিন শোনা গেল ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং মেজর জিয়াউর রহমান এবং মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে মিটিং করছেন। দুপুরের খাবার সময় বিমান বাহিনীর অফিসারদেরও কনফারেন্স রুমে খাবারের জন্য ডাকা হল। ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং বসেছিলেন ঘরে ঢুকতেই টেবিলের এক প্রান্তে। সবার সামনে উপুড় করা খাবার প্লেট। সাবেগ সিং-এর বামে বসা খালেদ ডানে জিয়া। হঠাৎ এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং বাঁয়ে তাকিয়ে মেজর খালেদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খালেদ তোমার এত রেশন লাগে কেন'? খালেদ জবাব দিলেন, 'স্যার, আমি ঢাকার সবচেয়ে কাছে, কুমিল্লা, নোয়াখালির লাগোয়া। সকালে যদি থাকে ৫০০ ছেলে, দুপুরে থাকে ১,৫০০, রাতে থাকে ৩,০০০। কোনো কিছুই ঠিক নেই'। 'আমি দুঃখিত খালেদ। আমাকে তোমার রেশনের হিসাব নিতে হবে' সাবেগ সিং-এর মন্তব্য। খালেদ বুঝলেন সাবেগ সিং ইঙ্গিত করছেন তার সততার প্রতি। খালেদ ডান হাতে ধাক্কা দিয়ে খাবার প্লেটটি সামনে ঠেলে দিলেন। ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং-এর চোখে চোখ রেখে পরিষ্কার ভাষায় এবং প্রত্যয়ী কণ্ঠে বললেন, 'ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং, আপনি নিশ্চয়ই চান না যে আমি আমার রাইফেলের ব্যারেল দুই দিকে ঘুরাই'। বলেই সাবেগ সিং-এর পিছনের দরজা দিয়ে তিনি বের হয়ে গেলেন। প্রায় সাথে সাথেই মেজর জিয়াও বের হয়ে গেলেন। খালেদের হাত ধরে বাংলায় বলতে লাগলেন, 'খালেদ এটা রাগারাগি করার সময় না, জায়গাও না। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। ফেরত আসো।' এতক্ষণে সাবেগ সিংও তার ভুল বুঝেছেন। সেও বের হয়ে এসে খালেদের কাছে ক্ষমা চেয়ে হাত ধরে খালেদকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

এই ছিলেন আমাদের খালেদ।

আমরা অবশ্য দেখেছি খালেদের সাথে অন্তরঙ্গ সখ্য সাবেগ সিং-এর।

পেশাজ্ঞান, বুদ্ধি, দৃঢ়তা, দেশপ্রেম আর অমায়িকতা দিয়ে মেজর খালেদ ভারতীয় সিনিয়র অফিসারদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন 'আমি খালেদ'। ত্রিপুরার রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক আর জনগণের মাঝে খালেদের জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক। তিনি সবার সঙ্গে মিশতেন খোলা মন নিয়ে।

যুদ্ধের সময় KMT বলে একটি কথা প্রচলিত হয় খালেদকে নিয়ে Khaled Mosharraf Time। খালেদের সময় ঘড়ির সময়ের পিছনে চলতো। সবসময় সময়ের পরে উপস্থিত হতেন খালেদ। ২২ অক্টোবর কসবার কাছে কমলা সাগরে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আক্রমণ অবলোকন করার সময় শত্রুর আর্টিলারী গোলার স্প্লিন্টার যে তার কপালের মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেলো সে তো প্রধানত তার দেরিতে উপস্থিত হবার কারণেই। ভোর রাতের আক্রমণ দেখতে খালেদ উপস্থিত হন ভোরের আলোয় সকাল সাড়ে সাতটায়।

গল্পবাজ ছিলেন খালেদ। সেবার কোনাবন যাবেন ক্যাপ্টেন গফফারের সদর দপ্তরে। গাড়ি দাঁড়িয়ে। আমি বারবার তাগাদা দিচ্ছি। বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করবে এমন একটি মুক্তিযোদ্ধা দলকে ব্রিফিং করবেন তিনি। তারা অপেক্ষমান। আসছি, একটু ... বলে আমাকে নিবৃত করছেন। গল্প চলছেই। এবার মনে করিয়ে দেবার সুরে হয়তো

তাগাদার ভার একটু বেশি থেকে থাকবে। তিনি ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতে পরা ঘড়ির কাঁচটি ঘষতে ঘষতে বলতে লাগলেন, এই ছোট হাবিলদার মেজরটির জন্য কোথাও একটু শান্তিমতো বসতে পারলাম না।

পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর তিনি চলে গেলেন। এই প্রথম এবং শেষ বারের মতো খালেদ চলে গেলেন সময়মতো নয়, সময়ের বহু আগেই-মাত্র ৩৭ বছর বয়সে।

ঢাকা
জানুয়ারি ২০০৮

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব.)

[নোট : এ বইয়ে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অফিসারদের যে র‍্যাংক ব্যবহার করা হয়েছে তা ১৯৭১-এর।]

সশস্ত্র প্রতিরোধ : কুমিল্লা-নোয়াখালী-ঢাকা

প্রথম খণ্ড

১৯ মার্চ ১৯৭১ আমাকে ঢাকা সেনানিবাস থেকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের রেজিমেন্ট কুমিল্লা সেনানিবাসে বদলী করা হয়। আমি ২২শে মার্চ আমার পরিবারকে ঢাকার ধানমন্ডিতে রেখে কুমিল্লা চলে যাই এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে যোগদান করি। ইউনিটে পৌছার সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম আমার সৈনিকরা বেশ উদ্বিগ্ন। আরো জানতে পারলাম পাঞ্জাবীদের কমান্ডো এবং গোলন্দাজ (আর্টিলারী) বাহিনী ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে মেশিনগান লাগিয়ে অবস্থান নিয়েছে। নির্দেশ পেলেই সবাইকে হত্যা করবে। পাঞ্জাবীরা সেনানিবাস রক্ষার অজুহাতে এসব পরিকল্পনা নিয়েছে। পাঞ্জাবীদের কার্যাবলিতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের মনে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল। আমি পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জানতে চায় এখন তাদের কী কর্তব্য? আমি সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে এবং আত্মরক্ষার্থে প্রহরী দ্বিগুণ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের শান্ত করি। পরের দিন ২৩ মার্চ ছুটির দিন ছিল। ২৪ মার্চ সকাল ৭টায় আমি প্রথম অফিসে রিপোর্ট করি লে. কর্নেল খিজির হায়াত খানের কাছে। তিনি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন এবং পাঞ্জাবী ছিলেন। লে. কর্নেল খিজির হায়াত খান আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে আমার পোস্টিংয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন এবং ইউনিট সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। ঐদিনই আমি যখন আমার অফিসে সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের কাজ বুঝে নিচ্ছিলাম সকাল প্রায় সাড়ে ১০ টায় তখন খিজির হায়াত খান ডেকে পাঠান। আমি অফিসের ভেতর ঢুকে দেখি খিজির হায়াত খান উদ্বিগ্ন। তিনি আমাকে বসার জন্য বললেন এবং জানান যে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়ে আজই কুমিল্লা থেকে রওনা হতে হবে। আমি উত্তর দিলাম যে, যদি হুকুম হয় আমি নিশ্চয়ই যাব, তবে আমি একদিন হয় এসেছি এবং আমার দায়িত্ব কেবল বুঝে নিচ্ছি, এমতাবস্থায় আমাকে ইউনিট থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়ত আপনার পক্ষে ভুল হবে। তাকে আরো বুঝাতে চেষ্টা করলাম ব্যাটালিয়নে আরও অফিসার আছে, তাদেরকেও পাঠানো যেতে পারে। তাছাড়া কোনো ইউনিট উপ-অধিনায়ককে সাধারণত এভাবে পাঠানো হয় না। আমার বক্তব্য শুনে তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য তোমাকেই যেতে হবে'। আমি জানতে চাইলাম, 'আমাকে কী ধরনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান হচ্ছে'।

কর্নেল খিজির হায়াত খান বললেন যে, খবর এসেছে সিলেটের শমসেরনগর নামক জায়গাতে নকশালপন্থীরা বিশেষ তৎপর রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ব্যাপকভাবে সাহায্য করছে। আরো খবর আছে ভারত থেকে বেশ অনুপ্রবেশও হচ্ছে। এইসব কারণে আমাকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের একটা কোম্পানি নিয়ে সেখানে যেতে হবে এবং তাদের দমন করতে হবে। আমি জবাব দিলাম একটা কোম্পানি যখন যাবে, তখন কোনো জুনিয়র মেজরকে সেখানে পাঠানো যেতে পারে। সাধারণত উপ-অধিনায়ক একটা কোম্পানি নিয়ে কখনও যায় না। আমার বক্তব্যে খিজির হায়াত খান কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন ঠিক আছে আপনি যান এবং আমি আপনাকে একটু পরে ডেকে পাঠাবো। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, ব্রিগেড কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার ইকবাল শফি এখনই আপনাকে ডেকেছেন। আমাকে নিয়ে কর্নেল খিজির হায়াত ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে গেলেন। ব্রিগেড কমান্ডার আমাকে দেখেই বললেন, 'আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যা একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ সম্পন্ন করতে পারবে না এবং সেইজন্য আমি তোমাকেই নির্বাচিত করেছি। আশা করি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।' তিনি আরো বললেন, 'তোমার মতো একজন সিনিয়র অফিসারকে এইজন্য মনোনীত করা হয়েছে। আমি ট্রুপস ছাড়া শমসেরনগরে ইপিআর এর দুটি কোম্পানি আছে। এত বড় ফোর্স-এর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন সিনিয়র বাঙালি অফিসারের দরকার। তুমিই একমাত্র বাঙালি অফিসার কুমিল্লাতে যাকে আমি এ ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারি।'

আমি বুঝতে পারলাম যেতে আমাকে হবেই। উপায় যখন আর নেই তখন যতটুকু তাদের কাছে আদায় করে নেয়া যায় সেটুকুই আমার পক্ষে মঙ্গল। আমি ব্রিগেডিয়ার শফিকে বললাম, 'যে কাজের ভার আমাকে দিচ্ছেন, শুধু একটা কোম্পানি দিয়ে তা হবে না। কোম্পানির চেয়ে বেশি সৈন্য আমাকে দেওয়া হোক। আর হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটা শক্তিশালী অয়্যারলেস দেওয়া হোক। এ ছাড়া যেহেতু আমি অনেক দূরে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছি সেহেতু আমার ট্রুপস-এর জন্য স্বয়ংক্রিয় ভারি এবং হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র এবং মর্টার ইত্যাদি এবং যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ দেয়ার অনুমতি দেয়া হোক'। ব্রিগেডিয়ার শফি প্রথমে বললেন, 'তোমাকে যে কাজের জন্য পাঠানো হচ্ছে, তাতে এসব ভারি অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে না।' আমি উত্তরের বললাম যে, আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা চিত্রিত করেছেন তাতে আমার সামরিক জ্ঞান অনুসারে এ সব ভারি অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে বিশেষ করে যেখানে হেডকোয়ার্টার থেকে তাড়াতাড়ি সাহায্য পাবার আশা কম। আমার বক্তব্যে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি কনভিন্‌স্‌ড হলেন এবং কর্নেল খিজির হায়াতকে নির্দেশ দিলেন আমার যা প্রয়োজন তা যেন আমাকে দিয়ে দেয়া হয়। আমরা ব্রিগেডিয়ার শফির কাছ থেকে ইউনিটে ফিরে এলাম। এসেই ব্যাটালিয়নের এডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন গফফারকে ডেকে নির্দেশ দিয়ে দিলাম সমস্ত ব্যাটালিয়ন থেকে বেছে বেছে ২৫০ জনের মতো সৈনিককে কোম্পানিতে একত্রিত করার জন্য।

গফফারকে বলে দিলাম যে ব্যাটালিয়নের ভারি অস্ত্রশস্ত্র যত আছে সব নিয়ে নাও। গোলাবারুদ এমনভাবে নেবে যাতে একমাস যুদ্ধ করা যায়। আমাদের ২৬টা গাড়ি ব্রিগেড থেকে দেওয়া হয়েছিল। সব বোঝাই করতে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকদের তৈরি করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এই সময় আমি একটা অস্বাভাবিক ঘটনা দেখতে পাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এবং আমাদের লোকজন প্রস্তুত হচ্ছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত খিজির হায়াত এবং অন্যান্য ব্রিগেড স্টাফ অফিসাররা বসে লক্ষ্য করতে থাকলেন।

আমি ২৪ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় যাওয়ার জন্য তৈরি হই। ব্যাটালিয়নে যেসব বাঙালি অফিসার থেকে গেল, তারা সবাই আমার যাবার পূর্বে মেসে এসে দেখা করে গেল। এদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিন। তাকে আমি এই উপদেশ দিলাম যে, আমি চলে যাচ্ছি, এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এখন তুমিই সিনিয়র। যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে এই ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের বাকি ট্রুপস-এর নিরাপত্তার পুরো বন্দোবস্ত করবে এবং যদি প্রয়োজন হয় যুদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসবে এবং আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় আমি আমার কনভয় নিয়ে শমসেরনগরের পথে রওনা হলাম। রাত প্রায় ২ টার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলাম। সেখানে রাস্তায় অনেক ব্যারিকেড। এই প্রতিবন্ধকতার জন্য আমাদের এগোতে অসুবিধা হচ্ছিল। এই ব্যারিকেড ভাঙতে ভাঙতে শহরের দিকে এগোচ্ছিলাম। শহরের কিনারে যে পুল আছে (নিয়াজ পার্কের কাছে) সেখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্র-জনতা আমাদের বাধা দেয়। হাজার হাজার লোক এবং ছাত্ররা রাস্তায় শুয়ে পড়ে এবং বলে, যেতে দেওয়া হবে না। আমি সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। ওখানেই আওয়ামী লীগের তদানীন্তন এমসিএ সাচ্চু মিয়া এবং অন্য কয়েকজন আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রনেতারা আমাকে জানান যে, পূর্ব বাংলার অনেক জায়গায় পাকসেনারা আবার গুলি চালিয়েছে এবং মিলিটারী চলাচল কেন্দ্রীয় নির্দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা আরও বললেন, আপনাদের বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈনিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে কুমিল্লা থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং আমরা আপনাদের যেতে দেব না। এভাবে কয়েকঘণ্টা কথাবার্তা হয়। ইতোমধ্যে মেজর শাফায়াত জামিল যিনি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর একটা কোম্পানিসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অবস্থান করছিলেন, তিনিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনিও তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলেন যাতে ব্যারিকেড এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তাতেও তারা আমাদের অনুরোধ রাখতে রাজী হয় না। তারপর তাদের নিয়ে মেজর শাফায়াত জামিলের ক্যাম্পে যাই। সেখানে আবার কথাবার্তা চলে এবং তাদের আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিই যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশেরই রেজিমেন্ট, যখন দরকার পড়বে বাঙালি জাতির জন্য পিছিয়ে থাকবে না। এমতাবস্থায় আমাদের বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। অবশেষে সকাল সাড়ে ৫ টায় সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমাদেরকে আর বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমরা শমসেরনগরের পথে আবার ২৫ মার্চের সকালে রওনা দিলাম। যাওয়ার আগে মেজর শাফায়াত জামিলকে আলাদা ডেকে সতর্ক করে দিলাম এবং আমার সঙ্গে অয়্যারলেস মারফত যোগাযোগ রাখার

নির্দেশ দিয়ে গেলাম। আমি সকাল ১০ টা-১১ টার সময় শ্রীমঙ্গলে পৌঁছি। সেখান থেকে শমসেরনগর যাবার রাস্তা আমার জানা ছিল না। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে শমসেরনগর যেতে হলে মৌলভীবাজার হয়ে যেতে হবে। শ্রীমঙ্গলে কনভয় দাঁড় করিয়ে স্থানীয় কিছু ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করি শমসেরনগরে যাওয়ার রাস্তা সম্বন্ধে। এবং জানতে পারি মৌলভীবাজার হয়ে যাওয়া যায় অথবা আর একটা রাস্তা আছে সোজা শ্রীমঙ্গল হয়ে জঙ্গল এবং পাহাড়ের মধ্য হয়ে। এবং এই রাস্তা অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের। আমি এই সোজা জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে শমসেরনগরের পথে রওনা দিলাম। যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সে রাস্তা পরিত্যাগ করে পাহাড়ের পথ দিয়ে রওনা হলাম। এই রাস্তা খুব খারাপ ছিল তাই অতি কষ্টে দুপুর ২ টার সময় শমসেরনগরে গিয়ে পৌঁছি। সেখানে গিয়ে ডাকবাংলোতে আমি আমার ছাউনি স্থাপন করি।

দুপুরে খেয়ে আমি এবং লে. মাহবুব শমসেরনগরের চারদিক ঘুরে দেখে আসি। দেখি পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আরো কিছু পেট্রোল পার্টি চতুর্দিকে পাঠিয়ে দিই। স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারি কোনো অঘটন সেখানে ঘটেনি। ইপিআর-এর যে দু'টো কম্পানির কথা আমাকে বলা হয়েছিল তাদের কোনো হদিস নেই। একজন সুবেদার এবং আরো কয়েকজন সিপাই শমসেরনগর এয়ারপোর্টে অবস্থান করছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সঠিক কোনো উত্তর পাইনি। শমসেরনগরের টি-গার্ডেনগুলো ঘুরে জানতে পারলাম সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানি ম্যানেজার এবং অফিসাররা ঢাকায় চলে গেছে। নকশালপন্থী বা অনুপ্রবেশকারীদের কোনো চিহ্ন আমি খুঁজে পেলাম না। ২৫ মার্চের রাতটা এভাবে খবরাখবর নিতে এবং পেট্রোলিং করে কেটে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ঘোরালো মনে হলো। আমার মনে জাগলো আমাকে এখানে কৌশল করে পাঠানো হয়েছে। এবং যা কিছু তারা বলেছিল, তা সবই মিথ্যা। আমি সমস্ত সকাল অয়্যারলেস-এর মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি কিন্তু কোনো যোগাযোগ হলো না। এইভাবে দুপুর পর্যন্ত চলে যায়। আমি এবং লে. মাহবুব ডাকবাংলোর বারান্দায় বসেছিলাম, হঠাৎ আমাদের এসে খবর দেয় একজন পাঞ্জাবী অফিসার এবং বেশ কয়েকজন সৈন্য শমসেরনগর বাজারে এসেছে এবং সেখানে কারফিউ জারি করে স্থানীয় জনসাধারণের উপর অত্যাচার করছে। সেই দলটি আমাদের ক্যাম্পের সম্মুখ দিয়ে মৌলভীবাজার যাচ্ছিল। আমাদের সেন্ট্রিকে সেই দলটির অফিসারকে ডাকার জন্য পাঠাই। এরা যখন সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেন্ট্রি তাদের আমাদের ক্যাম্পে আসার অনুরোধ জানায়। অফিসারটি ক্যাম্পের ভিতরে আসে এবং আমার সেখানে উপস্থিতি দেখে আশ্চর্যবোধ করে। এমন ভাব দেখায় যে আমরা এখানে আছি এটা সে জানতো না। কথাবার্তায় আমি জানতে পারি যে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বেশ কিছু সৈন্য সিলেট থেকে মৌলভীবাজারে এসে দু'দিন আগে ক্যাম্প করেছে। অফিসারের হাবভাব এবং কথাবার্তা আমাকে সন্দিহান করে তোলে। যতক্ষণ সে ডাকবাংলোয় বসেছিল, ততক্ষণ সে স্টেনগানটি কোথাও না রেখে নিজের হাতে রাখে। এতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। এদের আগমন সম্বন্ধেও আমাকে অবহিত করা হয়নি।

এটাও ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কিছুক্ষণ পরে অফিসারটি তার দলবল নিয়ে চলে যায় এবং যাওয়ার আগে আমাদেরকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমি যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে অফিসারটিকে বিদায় করলাম।

সেইদিনই বিকেলে স্থানীয় জনসাধারণের মুখে আমি জানতে পাই ঢাকাতে কিছু একটা ভয়ঙ্কর অঘটন ঘটেছে, কিন্তু কেউ সঠিক কিছু বলতে পারে না। আস্তে আস্তে লোকমুখে আরও শুনতে পাই যে, ঢাকায় পাকসেনাবাহিনী হাজার হাজার লোক গুলি করে মেরে ফেলেছে এবং মারছে। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গাতেও পাকবাহিনী সেইরূপ নৃশংস অত্যাচার এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক ঢাকা ছেড়ে জান বাঁচানোর জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে। পাকসেনাবাহিনী ট্যাংক, কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নির্দোষ, নিরীহ, নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর বর্বরোচিতভাবে অত্যাচার করছে। ঢাকা শহর একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আমি অনেকক্ষণ বসে থেকে চিন্তা করতে থাকলাম আমার এখন কর্তব্য কী। অয়্যারলেস সেট খোলার হুকুম দিয়ে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। অনেক চেষ্টার পরেও কোনো যোগাযোগ হল না। তবুও আবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে বললাম। অনেক্ষণ পর আমাকে লে. মাহবুব এসে খবর দিল যে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে অতি কষ্টে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম অয়্যারলেসে কথা বলার জন্য। যখন আমি কথা বলতে চাই, তখনই অপরদিক থেকে কর্নেল খিজির হায়াত কিংবা ক্যাপ্টেন আমজাদ (পাঞ্জাবী) জবাব দেয়। তাদের কাছে কোনো কথাই খুলে বলা সম্ভব ছিল না। শুধু এটুকু বুঝতে পারলাম কর্নেল খিজির হায়াত এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের বাকি অংশ কুমিল্লা থেকে ২৫ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসেছে। কর্নেল খিজির হায়াত আমাকে জানালেন সবকিছু স্বাভাবিক এবং আরো জানালেন যে অতিসত্বর তিনি একবার শমসেরনগরে পরিদর্শনে আসবেন। আমি তাকে জানালাম এখানে সব শান্ত এবং আমার এখানে থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই এবং আমাকে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হোক। তিনি জবাবে আমাকে শমসেরনগরেই থাকতে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পর আমি আবার অয়্যারলেসে কথা বলার চেষ্টা করি। এবার ক্যাপ্টেন গাফ্‌ফারের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম যে ক্যাপ্টেন গাফ্‌ফারের নিকটে কোনো পাঞ্জাবী অফিসার আছে। সেজন্য সব কথা খুলে বলতে পারছিলো না। আমি শুধু তাকে বললাম যখন সুযোগ পাবে তখন মেজর শাফায়াত জামিলকে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে। আরো কিছুক্ষণ পরে মেজর শাফায়াত জামিল আমার সঙ্গে অয়্যারলেসে কথা বলেন এবং জানালেন ঢাকাতে পাক সেনাবাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে এবং এখনও ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই কথা চলছিল ২৬ মার্চের সন্ধ্যাবেলায়। শাফায়াত জামিল লোকমুখে শুনেছেন যে, সব লোক ঢাকা থেকে পালিয়ে কুমিল্লার দিকে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। মেজর শাফায়াত জামিল এবং ক্যাপ্টেন গাফ্‌ফার আরো জানান যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলকে এটা কার্যকরী করতে বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসাধারণ সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করেছে। এমতাবস্থায় তাদের করণীয় কী তা আমার কাছে জানতে চাইলেন।

আমার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন ছিল। আমি প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থান করছি। সমস্ত বাংলাদেশে আর কোথায় কী হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। ঢাকা শহরে পাকবাহিনী ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে এবং আরো অনেক জায়গাতেও করেছে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই যে তাদের কাছে কোনো উপদেশ নেব। একদিকে সামরিক শৃঙ্খলা এবং কর্তব্যবোধ, অন্যদিকে বিবেকের দংশন আমাকে পীড়িত করছিল। এই উভয়সঙ্কটে পড়ে আমি আমার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলি। মেজর শাফায়াত জামিলকে বললাম, আমাকে কিছুটা সময় দাও, আমি কিছুক্ষণ পরে বলব এবং সঙ্গে সঙ্গে বললাম, কোনোমতেই যেন গুলি চালানো না হয়। লোকজনকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা কর। চিন্তায় আমি আমার কামরার চতুর্দিক পায়চারি করতে শুরু করলাম এবং এমন অবস্থায় চিন্তায় মাথা ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি বসে পড়লাম এবং লে. মাহবুবও সেখানে বসেছিল। আমার সঙ্গে যেসব বাঙালি সৈনিকরা ছিল, তারাও উদ্বিগ্ন হয়ে আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে আমার বিবেক আমাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করলো। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। যদিও কোনো রাজনৈতিক নির্দেশ সেই মুহূর্তে ছিল না তবুও বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ই মার্চের ঘোষণার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, "এবার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" আমি লে. মাহবুবকে ডেকে বললাম যে এই মুহূর্তে আমি স্বাধীন বাংলার আনুগত্য স্বীকার করলাম। এখনই সব সৈনিকদের বলে দাও আজ থেকে আমরা আর কেউ পাকিস্তানের প্রতি অনুগত নই। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দাও। এখন থেকে আমরা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করবো। সব সৈনিকদের তৈরি হতে বল। এখান থেকে আমরা ঢাকার দিকে রওনা দেব এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একত্রিত করতে হবে। লে. মাহবুব যেন এই নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। সে দৌড়ে গিয়ে বাকি সবাইকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই আমি শুনতে পেলাম বঙ্গশার্দুলদের শ্লোগান "জয় বাংলা"। আমি তাদেরকে প্রথমে শান্ত করলাম এবং বুঝিয়ে দিলাম আমাদের এখন থেকে যে সংগ্রাম শুরু হল সেটা কঠিন এবং বিপদসঙ্কুল। সকলেই নিজেকে স্বার্থের উর্ধ্বে রেখে দেশ ও জাতির এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্যে আত্মীয়স্বজন, আর্থিক কষ্ট এবং সবকিছু সুবিধা ত্যাগ করে আত্মবিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি দেখতে পেলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা সবাই দৃঢ় সংকল্পে থেকে আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রথমে অয়্যারলেসে মেজর শাফায়াতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং তাকে নির্দেশ দিই যেন সেও তৈরি থাকে। তাকে আরো বললাম কুমিল্লার রাস্তার দিকে খেয়াল রাখতে। তাকে আরো বললাম যে আমি অতি শীঘ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছব। ইতোমধ্যে আমার সমস্ত লোক ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ে যায়। আমি লে. মাহবুবের সঙ্গে কিছুসংখ্যক সৈন্য দিয়ে শ্রীমঙ্গলে পাঠিয়ে দিই এবং সেখানে ডিফেন্স নিতে নির্দেশ দিই যাতে আমাদের যাওয়ার পথে মৌলভীবাজার থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এসে বাধা দিতে না পারে। শমসেরনগরে থেকে জঙ্গলের পথে রাত ১২ টায় আমি

আমার কনভয় নিয়ে রওনা হয়ে যাই। রাস্তায় আমাদের অগ্রসর অনেক ধীর ছিল, কারণ সমস্ত রাস্তায় ব্যারিকেড এবং কোনো কোনো জায়গায় রাস্তা কেটেও দেওয়া হয়েছিল। জঙ্গলের অনেক জায়গায় বিরাট গাছ কেটে রাস্তার উপর ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এইসব প্রতিবন্ধক আমাদেরকে কেটে কেটে বা মাটি ফেলে পরিষ্কার করে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। সব প্রতিবন্ধকের কাছেই অনেক লোক লুকিয়ে দেখছিল আমরা কী করি। যখনই তারা বুঝতে পারতো আমরা বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ঢাকার দিকে বা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখনই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলতো এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে সাহায্য করতো। তাদের সহায়তায় এবং সক্রিয়তায় আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল কম সময়ের মধ্যে এগিয়ে যাবার। এভাবে অতি মন্থর গতিতে এগুতে এগুতে আমি ভোর সাড়ে ৫ টায় সাতছড়িতে পৌঁছলাম। এখানে আমার সৈনিকরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। এখানে এসে আমি আবার অয়ারলেসের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যোগাযোগ করি। ঐ অবস্থাতে কর্নেল খিজির হায়াতের সঙ্গেও আলাপ হয়। তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে সেখানে সবকিছু ঠিকঠাক। মেজর শাফায়াত জামিলও আমার সঙ্গে কথা বলে। সে তার উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং জানতে চায় আমি কোথায় এবং আসতে কেন দেরি হচ্ছে। আমি বললাম, ভয়ের কোন কারণ নেই কেননা আমি অনেক কাছে এসে গেছি। তাকে আশ্বাস দিয়ে আমি আবার রওনা হই। সকাল ৬ টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দশ মাইল দূরে মাধবপুরে পৌঁছি এবং মেজর শাফায়াত জামিলের সঙ্গে অয়ারলেসে কথা বলি। তিনি আমাকে জানান, সকাল ১০ টার সময় কর্নেল খিজির হায়াত একটা কনফারেন্স ডেকেছেন (আমি পরে জানতে পারি যে কুমিল্লা থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটা কোম্পানি সেই সময়ে আসছিল)। কনফারেন্স-এর কথা যখন আমি শাফায়াতের কাছে শুনতে পেলাম, তখন আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে যাই এবং তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠি। আমি শাফায়াতকে তখনই নির্দেশ দিই আমার জন্য অপেক্ষা করো না। প্রয়োজন হলে সমস্ত পাঞ্জাবী অফিসারকে কর্নেল খিজির হায়াতসহ গ্রেফতার করে ফেলো এবং যত পাঞ্জাবী সৈনিক আছে নিরস্ত্র কর। আমি আবার রওনা হয়ে গেলাম। পরে শুনতে পেলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কী হয়েছে। ১০ টা বাজার দশ মিনিট আগে কর্নেল খিজির হায়াত, মেজর সাদেক নেওয়াজ, ক্যাপ্টেন আমজাদ সাঈদ কনফারেন্সে বসেছিল। এমতাবস্থায় মেজর শাফায়াত জামিল, লে. কবির, লে. হারুন হঠাৎ সেই কামরায় প্রবেশ করেন এবং পাঞ্জাবী অফিসাদের তাদের অস্ত্র সমর্পণ করার নির্দেশ দেন। মেজর নেওয়াজ যিনি নিজে একজন কমান্ডো ছিলেন তিনি কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু লে. হারুনের ত্বরিৎ প্রচেষ্টায় তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং সব পাঞ্জাবী অফিসারকে তারা বাংলাদেশের নামে গ্রেফতার করে। ইতোমধ্যে বাকি বঙ্গশার্দুলরা বাইরে যেসব পাঞ্জাবী সৈনিক ছিল, তাদের নিরস্ত্র করে এবং যারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তাদের চরম শাস্তি প্রদান করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শত্রুমুক্ত করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়। দিনটি ছিল ২৭শে মার্চ। ইতোমধ্যে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতি সন্নিকটে এসে গেছি। আমার বাহিনী এবং শাফায়াতের বাহিনী বেলা ১১ টার দিকে সম্মিলিত হয়। আমি বুঝলাম আমার প্রথম

কর্তব্য হল, যে সমস্ত এলাকা মুক্ত হয়েছে তা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। আমি প্রথমেই অফিসারদের নিয়ে একটা বৈঠক করি এবং এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কীভাবে কার্যকরী করতে হবে তার সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনা জানাই। আমার এই পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমরা মেঘনা নদীকে উত্তরে রেখে পশ্চিমে প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করবো এবং দক্ষিণে ময়নামতি সেনানিবাস পর্যন্ত মুক্ত করে প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করবো। উত্তর-পূর্বে মৌলভীবাজার থেকে সিলেট পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করে সিলেটে আর একটি ঘাঁটি স্থাপন করবো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভৈরববাজারে প্রথম দুটি কোম্পানি পাঠিয়ে দিই। আর একটা পার্টিকে কুমিল্লার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে অগ্রসর হতে বলি। মেঘনার পূর্ব পাড়ে একটা প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরির ব্যবস্থা করি। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চতুর্দিক, তিতাস নদীর চতুর্দিকে একটা আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করি। লে. মাহবুবের নেতৃত্বে একটা কোম্পানি দিয়ে সিলেটের দিকে অগ্রসর হবার জন্য পাঠিয়ে দিই। শ্রীমঙ্গলে তাদের সাথে স্থানীয় সংগ্রামী আনসার, মুজাহিদ এবং আরো কিছুসংখ্যক সৈন্য কর্নেল রবের নেতৃত্বে যোগ দেয়। এই দলটির সাথে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের যেসব সৈন্য মৌলভীবাজারে ছিল তাদের সাথে লড়াই হয় এবং পাঞ্জাবীরা অনেক হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরে মৌলভীবাজার থেকে পালিয়ে যায়। সিলেট শহর পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমি বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তখন মহকুমা প্রশাসক ছিলেন জনাব রকিব। তিনি অত্যন্ত উৎসাহী, সাহসী এবং সংগ্রামী ছিলেন। তিনি সবসময় আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বেসামরিক সাহায্যের যতটুকু প্রয়োজন ছিল—যেমন রসদ সরবরাহ, যানবাহন যোগাড়, সৈনিকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসা, আর্থিক সাহায্য তিনি অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে করেছেন। তিনি পুলিশ অয়ারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত জেলা এবং মহকুমা প্রশাসকদের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট স্বাধীনতা যুদ্ধ করছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করেছে। ঐ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমার সাথে জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, সাচ্চু মিয়া প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং তাদেরকে আমি বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমার আনুগত্যের কথা বলি। তারা আমাকে সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা করেন। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেন কীভাবে এই যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করা যায়। আমি তাদেরকে অনুরোধ করি, যেকোনো উপায়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে যদি কোনো অস্ত্রশস্ত্র আনার বন্দোবস্ত করতে পারেন তাহলে আমি আমার এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো সুন্দর ও শক্তিশালী করতে পারি। আমি তখন জানতাম যে, আমার কাছে যা গোলাবারুদ আছে তা নিয়ে বেশি দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তারা এই বার্তা নিয়ে আগরতলাতে চলে যান।

এই সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসরমান পাঞ্জাবী সৈন্যদের সাথে আমার অগ্রবর্তী সৈন্যদের কোম্পানিগঞ্জে লড়াই হয়। এতে পাকিস্তানিরা অনেক হতাহত হয়ে

আবার কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। ২৯শে মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে শত্রুসেনা প্রথম বিমান হামলা চালায়। এতে আমার একজন সৈনিক শহীদ হন। সেদিনই সন্ধ্যায় পাকিস্তানিদের একটা রেকি পার্টি একজন অফিসার এবং ৮ জন সিপাইসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসে। এই দলটি আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটির এ্যামবুশে পড়ে যায় এবং অফিসারসহ সব শত্রুসেনা এবং একটি গাড়ি ধ্বংস করে দিই। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপর বিমান হামলা আরো চলতে থাকে এবং আমাদের প্রতিরক্ষা আরো অধিকতর শক্তিশালী হতে থাকে। আমি এই অবস্থাতে ভৈরববাজার এবং নরসিংদীর ভেতরের রেলওয়ে লাইন অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে দিই এবং আর একটা দলকে নরসিংদী পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিই। আমার এই দলটির সঙ্গে ঢাকা থেকে আগত আর একটি প্রাক্তন ইপিআর এবং ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈন্যের যোগাযোগ স্থাপন হয়। এই সম্মিলিত দলটি ঢাকা থেকে পাকসেনাদের অগ্রসরমান একটি বিরাট বাহিনীকে এ্যামবুশ করে পর্যুদস্ত করে এবং ঢাকার দিকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে।

আমাদের তখনো বাইরের আর কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাঙালি সেনাবাহিনীর আর কোনো দলের সাথে যোগাযোগ হয়নি। অন্যান্য জায়গা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম।

আমি জানতে পাই যে, মেজর সফিউল্লাহ্ ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জে এসে তার ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে একত্রিত করেছে। আমি আরো জানতে পারলাম যে, সে তার মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ঢাকা অভিমুখে যাবার পরিকল্পনা করেছে। এই সংবাদে আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত হয়ে পড়ি। কারণ আমি জানতাম ঢাকাতে পাকিস্তানিদের অন্ততঃপক্ষে দু'টো ব্রিগেড সৈন্য আছে। তাছাড়া সাঁজোয়া বাহিনীর ট্যাংক, গোলন্দাজ বাহিনীর কামান এবং বিমানবাহিনী আছে। এসব অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত। বিরাট পাক সেনার বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করার মানেই ছিল আমাদের শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। আমার সঙ্গে মেজর সফিউল্লাহ্‌র যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত কোনো সরাসরি রাস্তা না থাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ তার সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে এ সর্বনাশকে কিছুতেই রোধ করা যাবে না। অনেক চেষ্টার পর আমি একটা খালি রেলওয়ে ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করলাম। লে. মাহবুবকে সেই ইঞ্জিনে বসিয়ে সোজা কিশোরগঞ্জ পাঠিয়ে দিলাম। তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলাম। কোনো কিছু করার আগে তিনি যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সম্ভব হলে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাই।

এরপর লে. মাহবুব ফিরে এসে জানায় মেজর সফিউল্লাহ্ এবং তার সমস্ত সেনাদল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। মেজর সফিউল্লাহ্ তার বাহিনীকে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছেন এবং তিনি আমার হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়াতে আসেন। আমাদের দু'টো দলের যোগাযোগ হওয়াতে আমাদের শক্তি ও মনোবল বেড়ে যায়। এরপর আমরা বসে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করি। আমরা জানতে পারি যে, পাকিস্তানিরা আমাদের আক্রমণ করার যথেষ্ট প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আমরা পাকিস্তানিদের

আক্রমণের কৌশল সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের উপর বিমান, হেলিকপ্টার এবং নদীপথে ঢাকার দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। নদীপথে আক্রমণ করার জন্য তারা মেঘনার পথে গানবোটে আসতে পারে এবং মেঘনার দক্ষিণ পাড়ে ল্যান্ডিং করতে পারে এবং তারা সাথে সাথে হেলিকপ্টারযোগেও কমান্ডো এবং শত্রুবাহিনী নামাতে পারে।

যে বিস্তীর্ণ মুক্ত এলাকা আমাদের আয়ত্তাধীন ছিল, সেসব এলাকাতে সৈন্য রাখার মতো আমার কাছে সৈন্য ছিল না। সেই জন্য আমি আমার ট্রুপসকে যেখানে পাকবাহিনীর অবতরণের এবং আক্রমণের বেশি সম্ভাবনা, সেই জায়গাগুলোতে ডিফেন্স নেওয়ার বন্দোবস্ত করি। এই সময়ে আমি জানতে পাই ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের জনা পঞ্চাশেক সৈন্য যারা কুমিল্লার দক্ষিণে জাংগালিয়া ইলেকট্রিক গ্রীড স্টেশনে প্রহরায় ছিল সেইসব সৈন্যরাও ২৫শে মার্চের পর নিকটবর্তী একটা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে এবং আমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। আমি এই অবস্থাতে তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে দিই এবং তাদেরকে আরও দক্ষিণে গিয়ে লাকসাম এবং কুমিল্লার মধ্যখানে লালমাই হিলের মধ্যপ্রান্তে টেম্পল পাহাড় নামক এক জায়গায় প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ার নির্দেশ দিই। তাদের উপর এই নির্দেশ দিলাম যে, কুমিল্লা থেকে পাকবাহিনী লাকসাম, নোয়াখালী কিংবা চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হলে তাদের যেন এ্যামবুশ করা এবং বাধা দেওয়া হয়। এরমধ্যে আমি খবর পাই আখাউড়া, কসবা, বুড়িচং-এ পাকিস্তানি সেনারা ইপিআর পোস্টগুলোতে বাঙালি ইপিআরদের বিরুদ্ধে এখনও লড়াই করে যাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে আমি ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে পাঠাই কিছু লোকজন দিয়ে যাতে বাঙালি ইপিআরদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে এইসব পোস্টগুলো পাঞ্জাবীদের কবল থেকে মুক্ত করা যায়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং স্থানীয় জনসাধারণের সম্মিলিত হামলায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের পর পাঞ্জাবীরা এইসব অবস্থান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই সব খণ্ডযুদ্ধের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কুমিল্লার গোমতী পর্যন্ত আমি সমস্ত এলাকা মুক্ত করতে সমর্থ হই এবং কুমিল্লা শহরের বিবিরবাজার নামক একটা জায়গায় একটা প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি।

ইতোমধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর এবং সাচ্চু মিয়ার প্রচেষ্টায় আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রের কিছু সাড়া পাওয়া যায়। সীমান্তে আমার সঙ্গে আগরতলার জেলা প্রশাসক মিঃ সাইগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্বন্ধে তখনও তাদের কোনো ধারণা ছিল না। আমার কাছে বিস্তারিত জানতে পেরে তিনি আমাকে জানালেন যে এ সম্বন্ধে তিনি তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। তাকে আমি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান। কয়েকদিন পর আবার সীমান্ত এলাকায় ভারতের সেনাবাহিনীর ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল গানজালভেজ-এর সঙ্গে দেখা হয়। তাকেও আমি ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ দিই। তখন পর্যন্ত আমরা কোনো সাহায্য পাইনি।

এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে কুমিল্লার সীমান্তে মতিনগরের নিকট কর্নেল এমএজি ওসমানী যখন ভারত সীমান্তে পৌঁছেন, তখন আমার সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি প্রথম

আমার কাছে সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হন এবং তার পরই তিনি আগরতলাতে চলে যান। পরের দিন সন্ধ্যায় আমার হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়াতে কর্নেল ওসমানী আমাকে, মেজর সফিউল্লাহ, লে. কর্নেল রব এবং আরো কয়েকজন মেজর পদবীর অফিসারদের নিয়ে একটা বৈঠক করেন। এই বৈঠকে আমরা যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে তাকে জ্ঞাত করি। আমি তাকে আরও জানাই, আমাদের যে শক্তি আছে তা দিয়ে বেশি দিন পাকবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, অতিসত্বর বন্ধুরাষ্ট্র থেকে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া তাকে আরো অনুরোধ করা হয় আরো নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অতিশীঘ্র আমাদের বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হোক যাতে আমরা বহির্জগতের স্বীকৃতি পাই এবং যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাই। তিনি আমাদের বক্তব্য বুঝতে পারলেন এবং আগরতলা থেকে কলকাতা চলে গেলেন। কিছুদিন পর ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে স্বীকার করে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

এই সময়ে বন্ধুরাষ্ট্র থেকে বিএসএফ-এর ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে আমাদের হেডকোয়ার্টারে আসেন এবং আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন আমাদের সহায়তা করার, কিন্তু সে সাহায্য ছিল নগণ্য। আমরা চাচ্ছিলাম হালকা এবং ভারি স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ার, মর্টার। কিন্তু সে সময় আমাদেরকে খুবই সামান্য ৩০৩ রাইফেল এবং সামান্য গুলি সাহায্য দেওয়া হয়। তা ছিল আমাদের দরকারের চেয়ে অনেক নগণ্য। এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে আমাদেরকে মেজর জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে বিস্তারিত জানান এবং একদিন মেজর জিয়াউর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, পাকবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং যুদ্ধ করার জন্য তার কাছে অতি নগণ্য সংখ্যক সৈন্য আছে এবং তিনি আমাকে ও মেজর সফিউল্লাহকে তাকে কিছু সৈন্য দেওয়ার অনুরোধ করেন। আমি এবং মেজর সফিউল্লাহ নিজ নিজ বাহিনী থেকে দু'টো শক্তিশালী কোম্পানি গঠন করে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট প্রেরণ করি।

এই সময় পাকবাহিনী আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর ওপর প্রবল বিমান আক্রমণ চালাতে থাকে। এই আক্রমণ এতই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে, মাঝে মাঝে ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা অনবরত স্ট্রাফিং, রকেটিং এবং বম্বিং করতে থাকে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পাকবাহিনী বিমানবাহিনীর সহায়তায় হেলিকপ্টার এবং গানবোটের সাহায্যে আমাদের আশুগঞ্জ পজিশনে সৈন্য অবতরণ করায়। আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের বিমান বাহিনী এবং ছত্রীদের সম্মিলিত সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে অসহায় হয়ে আশুগঞ্জ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পিছু হটে আসে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও শত্রুবাহিনীর সাথে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুদের সাঁজোয়া বাহিনী, বিমান বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে আর টিকতে না পেরে আমরা দুই রাস্তায় পিছু হটে গেলাম। আমার

সৈন্যরা ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে আখাউড়াতে এসে তিতাস নদীর উপর পুনরায় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। মেজর সফিউল্লাহ্ তার বাহিনী নিয়ে মাধবপুরের দিকে চলে যায়। পাকবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এক ব্যাটালিয়ন শক্তি নিয়ে আসে এবং আখাউড়া আক্রমণ করে কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহত স্বীকার করে তারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

আমি এই সময়ে কুমিল্লার দক্ষিণে যে দলটি ছিল, অর্থাৎ ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানি তাদেরকে লে. মাহবুব এবং লে. দিদারের নেতৃত্বে আরও কিছু সৈন্য পাঠিয়ে জোরদার করি।

কুমিল্লা থেকে এপ্রিল মাসে ১৫/১৬ তারিখে পাকবাহিনীর বিরাট এক কনভয় প্রায় ৩০টি গাড়িতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লাকসামের দিকে যাচ্ছিল। লে. মাহবুবের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'বি' কোম্পানির সৈন্যরা শত্রুসেনার এই দলটিকে দুপুর ১২ টায় জাঙ্গালিয়ার নিকটে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে শত্রুসেনাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। সংঘর্ষ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। পাকসেনারা গাড়ি থেকে নেমে এ্যামবুশ পার্টিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের সৈন্যদের সাহসিকতা এবং কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষে লে. মাহবুব এবং লে. দিদার যথেষ্ট কৌশলের এবং যুদ্ধনিপুণতার পরিচয় দিয়েছিল। লে. মাহবুব তার সৈন্যদের নিয়ে রাস্তার পূর্বপাশে এ্যামবুশ করে ওঁৎ পেতে বসেছিল। যখন শত্রুদের কনভয় তার এ্যামবুশ এর মাঝে পড়ে যায়, তখন সে তাদের উপর তার লোকজন দিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকে। এতে একটা গাড়ি রাস্তা থেকে এ্যাকসিডেন্ট করে পড়ে যায়। বাকি গাড়িগুলো থেকে পাকসেনারা লাফালাফি করে নিচে নামার চেষ্টা করে। এতেও তাদের যথেষ্ট হতাহত হয়। যেসব পাকসেনা গাড়ি থেকে ভালভাবে নামতে পারে তারা রাস্তার ওপারে (পশ্চিম দিক) গিয়ে একত্রিত হয় এবং লে. মাহবুবের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এদিকে লে. দিদারুল আলম রাস্তার পশ্চিম পাশে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য নিয়ে তৈরি ছিল। সে পাকিস্তানিদের উপর অকস্মাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এইভাবে দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে এবং নিজেদের এত হতাহত দেখে শত্রুসেনাদের মনোবল একেবারেই ভেঙে যায়। মৃতদেহ ফেলে রেখেই তারা কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধের ফলে লে. মাহবুব এবং লে. দিদারুল আলমের সম্মিলিত দলটি ২টি মেশিনগান, ৬টি হালকা মেশিনগান এবং প্রচুর রাইফেল আহত এবং নিহত শত্রুসেনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। যে বিধ্বস্ত গাড়িগুলো শত্রুরা ফেলে গিয়েছিল, তা থেকে কয়েক হাজার এ্যামুনিশন উদ্ধার করা হয়। এর তিনদিন পরে স্থানীয় জনসাধারণ আরও ২টা হালকা মেশিনগান, কয়েকটা রাইফেল এবং বেশ কিছু গোরাবারুদ, যা শত্রুসেনারা পালিয়ে যাবার সময় ধানক্ষেতে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে পৌঁছে দেয়। এই এ্যাকশনের ফলে আমার এ্যামুনেশনের প্রয়োজনীয়তা সাময়িকভাবে মিটেছিল এবং পাকবাহিনী বেশ কিছুদিন কুমিল্লার দক্ষিণে অগ্রসর হবার সাহস দেখায়নি।

এই সময় আখাউড়াতে পাকবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিক থেকে আবার আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে তাদের ২৫ জনের মতো হতাহত হয় এবং পাকবাহিনী আবার

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পশ্চাদপসরণ করে। এপ্রিল মাসের শেষে পাকবাহিনী কুমিল্লা থেকে উত্তর দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাস্তায় অগ্রসর হয়ে ১২ ফ্রান্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট নিয়ে সাইদাবাদ দখল করে নেয়। পরে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে তারা নিয়ামতাবাদ, গঙ্গাসাগর দখল করে নেয়। আমি তখন কুমিল্লার বিবিরবাজার এলাকাতে যেখানে পাকবাহিনী প্রতিদিন আক্রমণ চালাচ্ছিল, সেখানে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলাম। গঙ্গাসাগর, নিয়ামতাবাদ শত্রুকবলিত শুনতে পেয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে নির্দেশ দিই ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি নিয়ে কসবার উত্তরে চণ্ডিমুরা উঁচু পাহাড়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ শক্ত করতে এবং সেই রাতেই কুমিল্লার দক্ষিণ হতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানিকে উঠিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাসাগরের নিকটে দুটি কোম্পানিকেই একত্রিত করি। সন্ধ্যায় যখন আমি চণ্ডিমুরার নিকটে পৌঁছি তখনই শত্রুদের অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা বিবরণ ইপিআরদের কাছ থেকে অবগত হই এবং সেই রাত্রেই গঙ্গাসাগর এবং নিয়ামতাবাদে শত্রুদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিই। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন গাফফার এবং একজন সুবেদারের নেতৃত্বে 'এ', 'সি' এবং 'ডি' কোম্পানি নিয়ে ভোর ৫ টায় শত্রুদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিই। এই আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল যে ক্যাপ্টেন গাফফার এবং ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন পূর্বদিক থেকে শত্রুদের গঙ্গাসাগর পজিশনের পিছন দিক দিয়ে ইনফিলট্রেট করে ভিতরে ঢুকে গঙ্গাসাগরের উপর আক্রমণ চালাবে এবং সেই সময়ে সুবেদার তার 'এ' কোম্পানি নিয়ে নিয়ামতাবাদের উপর যে জায়গাতে আমরা শত্রুদের হেডকোয়ার্টার ভেবেছিলাম, সেখানে আক্রমণ চালাবে। এ দুই আক্রমণ এক সঙ্গে ৪ টায় শুরু হবে। আক্রমণের ঠিক দশ মিনিট আগে সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের মর্টার এই দুই পজিশনের উপর গোলা ছুঁড়বে। রাত ১২ টায় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি এই তিন কোম্পানি নিয়ে শত্রুদের ঘাঁটিতে ঢুকে যাই। সেদিন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। চতুর্দিকে বেশ পানি জমছিল। আমাদেরকে হাঁটু পানি ভেঙে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। এক সময়ে আমার মনে হচ্ছিল আমরা যেন আমাদের ঠিক পথে যাচ্ছি না এবং এই সময়ে নিকটবর্তী একটা বাড়ির একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। সেও একজন পুরানা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তি ছিল। এই ব্যক্তি আমাদেরকে শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে দিনে দূরে থেকে যা দেখেছে সে সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত খবর দেয়। এই ব্যক্তির সাহায্যে আমি এবং আমার প্রত্যেকটি দল ভোর ৫ টায় আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাই। আক্রমণ করার সময় নির্দিষ্ট ছিল রাত ৪ টা। যেহেতু আমরা দেরিতে পৌঁছি সেহেতু ৫ টায় পরিকল্পনামতো আক্রমণ শুরু করে দিই। শত্রুসেনারা অকস্মাৎ তাদের অবস্থানে এবং পিছনে ভয়ঙ্কর গোলাগুলির শব্দ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তারা গঙ্গাসাগর এবং নিয়ামতাবাদ ছেড়ে সাইদাবাদে পশ্চাদপসরণ করে। আমরা পরের দিন সকালে গঙ্গাসাগরে আবার প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি। শত্রুসেনারা গঙ্গাসাগরে পর্যুদস্ত হয়ে কসবার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। তাদের প্রথম আক্রমণ আমরা ব্যর্থ করে দিই কিন্তু পরে গোলন্দাজবাহিনীর সহায়তায় পাকসেনারা টি. আলীর বাড়ি পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ঘাঁটি গড়ে তোলে। আমরা আমাদের কসবা পুরানা বাজারে

পজিশন শক্তিশালী করে তুলি এবং শত্রুসেনাকে কসবার দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিই। টি. আলীর বাড়িতে শত্রুসেনাদের যে ঘাঁটি ছিল সে ঘাঁটিতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি মর্টারের সহায়তায় ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন অকস্মাৎ আক্রমণ করে। এই আক্রমণে শত্রুদের ৪/৫টা গাড়িতে আগুন লেগে যায় এবং তাদের ২০-৩০ জন হতাহত হয়। তারা টি. আলীর বাড়ি ছেড়ে আরো পিছনে হটে যায়।

ইতোমধ্যে কুমিল্লার বিবিরবাজার পজিশনের উপর পাকবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করতে শুরু করে এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কুমিল্লা শহরের সন্নিকটে দেড় মাইল পূর্বদিকে তারন্যপুর শত্রু দখল করতে সমর্থ হয়। আমি ইপিআর-এর একটি কোম্পানি এবং কিছুসংখ্যক বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য দিয়ে বিবিরবাজার প্রতিরক্ষাব্যূহ আরও শক্তিশালী করে তুলি। প্রতিরক্ষা অবস্থানে শত্রুসেনারা বারবার আক্রমণ চালাতে থাকে। এই অবস্থানটির উপর পাকসেনাদের লক্ষ্য এজন্য ছিল যে প্রতিরাতে এখান থেকে আমার ছোট ছোট কমান্ডো পার্টি গোমতী নদী অতিক্রম করে কুমিল্লা শহরে পাকিস্তানি অবস্থানের উপর অতর্কিত হামলা চালাতো এবং ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। এখান থেকে অনেক সময় তাদের অবস্থানের উপর মর্টার হামলাও চালাতাম। এতে প্রায়ই পাকসেনাদের অনেক লোক হতাহত হতো। অবশেষে পাকবাহিনী একদিন সন্ধ্যার সময় অতর্কিতে এই পজিশনের উপর ৩৯ বেলুচ রেজিমেন্টের সাহায্যে গোলন্দাজ বাহিনী এবং ট্যাঙ্কের সহায়তায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রথমে শত্রুসেনা পূর্বদিকে আক্রমণ চালনা করে। এই আক্রমণ আমার সৈনিকরা নস্যাৎ করে দেয় এবং শত্রুদের অনেক লোক নিহত এবং আহত হয়। এরপর শত্রুসেনারা দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের পজিশনের উপরে পিছনে বামপাশে ট্যাংক ও ৩৯ বেলুচ রেজিমেন্টের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ অন্ততপক্ষে ৪/৫ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে। আমাদের গুলিতে শত্রুদের অন্তত ১০০ থেকে ১৫০ জন নিহত বা আহত হয়। কিন্তু ট্যাংক এবং গোলান্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে এবং পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেলার আশঙ্কা থাকায় আমাকে বাধ্য হয়ে এই অবস্থান ছাড়তে হয়।

এই যুদ্ধে ইপিআর-এর জওয়ানরা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেয়। বিশেষ করে মনে পড়ে এক নায়েকের কথা, যে শত্রুদের গুলি করতে করতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের নিহতের বিপুল সংখ্যা দেখে এক পর্যায়ে 'জয় বাংলা' হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং সেই সময়ে হঠাৎ দুর্ভাগ্যবশত তার মাথায় গুলি লাগে এবং সে মারা যায়। এ যুদ্ধে আমার ৬ জন সৈন্য মারা যায় এবং ৮/১০ জন আহত হয়। এইসব আহতদের আমরা পিছনে নিয়ে আসি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে পারিনি। এ রকম একজন আহত তরুণ ছাত্রের কথা মনে পড়ে যার পেটে গুলি লেগেছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপারেশন করার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সে মারা যায়।

এদিকে গঙ্গাসাগরে এবং আখাউড়ায় শত্রুসেনারা আবার তৎপর হয়ে ওঠে এবং বার বার আখাউড়া এবং গঙ্গাসাগরের উপর আক্রমণ চালায়। জুন মাসের প্রথমে পাকবাহিনীর ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ট্যাংক, কামান এবং বিমানবাহিনীর সহায়তায় আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন এবং গঙ্গাসাগরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই

আক্রমণে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি কিছুটা পিছু হটে আজমপুর, আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে আধা মাইল পূর্বে আবার প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এই প্রতিরক্ষাব্যূহ সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা রেলওয়ে লাইনকেও শত্রুদের ব্যবহার থেকে বাধা দিতে সমর্থ। এই অবস্থানগুলোর উপর পাকবাহিনী বারবার আক্রমণ চালায় এবং প্রতিবারই ৩০-৪০ জন করে সৈন্য হতাহত হওয়ায় তারা আক্রমণ থেকে নিরস্ত থাকে।

মে মাসে কর্নেল ওসমানী আমাদের হেডকোয়ার্টারে আসেন। সে সময় ভবিষ্যৎ যুদ্ধ পরিচালনা কীভাবে হবে সে সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। কর্নেল ওসমানী আমাকে নির্দেশ দেন যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা বেসিক পেপার তৈরি করতে। আমি মেজর সফিউল্লাহ্‌র সঙ্গে পরামর্শ করে একটা বেসিক পেপার তৈরি করে ফেলি। এই পরিকল্পনায় আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে দুই বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত করার পন্থা নিই। আমরা পরিকল্পনা করি যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলে আমাদের শক্তিকে আরো বাড়াতে হবে। দুই রকমের বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত বাহিনী, যা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং অন্যান্য আর্মস ও সার্ভিসেস-এর নিয়মিত সৈনিকদের নিয়ে গঠিত হবে। এই সব নিয়মিত বাহিনী নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা ডিভিশন গড়ে উঠবে এবং কিছুসংখ্যক নিয়মিত সৈন্য নিয়ে প্রত্যেক সেক্টরেই কোম্পানি গঠন করা হবে এবং সেইসব কোম্পানি শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় কমান্ডো এ্যাকশন চালিয়ে যাবে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পুরনো এবং নতুন ব্যাটালিয়নগুলো নিয়ে ব্রিগেড গঠন করে সেইসব ব্রিগেড শত্রুদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাবে এবং প্রয়োজন হলে দখলীকৃত অবস্থানগুলোতে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলবে। যেসব যুবক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে তাদেরকেও ট্রেনিং দিয়ে একটা অনিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই অনিয়মিত বাহিনী ছোট ছোট গ্রুপ এবং কোম্পানিতে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করে নিজ নিজ এলাকা শত্রুমুক্ত করবে। এসব নিয়মিত বাহিনীর কোম্পানি এবং গ্রুপগুলো যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য তাদের পরিচালনার জন্য নিয়মিত বাহিনী থেকে জেসিও বা এনসিওদেরকে পরিচালনার জন্য পাঠানো হবে। এই পরিকল্পনাতে আমরা আরো উল্লেখ করি যে নিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানি নিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মতোই হবে। কিন্তু অনিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র হালকা ধরনের হবে এবং এলএমজি-র চেয়ে ভারি অস্ত্র দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

জেনারেল ওসমানী আমাদের সাথে একমত হন এবং তিনি আমাদেরকে আশ্বাস দেন যে এই পরিকল্পনা যাতে তাড়াতাড়ি কার্যকর হয় তিনি তার চেষ্টা করবেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অনেক যুবক আমাদের কাছে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমি আমার হেডকোয়ার্টারে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করে দিই। এই ট্রেনিং ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং-এর প্রবর্তন করি। বিশেষ করে পাকবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার জন্য ডেমোলিশন ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এই ট্রেনিং-এর ভার ক্যাপ্টেন হায়দার এবং হাবিলদার মুনিরের উপর ন্যস্ত করি। অতিসত্বরই আমার বেশ কিছু ডেমোলিশন টিম

ট্রেইন্ড হয়ে যায়। প্রথমেই আমি এসব টিমগুলোকে ঢাকা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রেললাইন এবং পাকা সড়কে পাঠিয়ে দিই। তাদের এ কাজ দিই যে যতটুকু সম্ভব পুল এবং রেলওয়ে লাইন ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। এসব কাজে আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধার সৃষ্টি হয় ডেমোলিশন-এর সরঞ্জামাদির অভাবে। আমরা হয়ত বিস্ফোরক পাই কিন্তু বিস্ফোরক ফোটানোর ডোটোনেটোর পাই না কিংবা অন্য কোনো সরঞ্জামাদি। এসব অসুবিধার মধ্যেও আমরা প্রত্যেকটি রেল এবং রাস্তাতে বেশ কিছুসংখ্যক পুল ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হই। যার ফলে পাকিস্তানিদের ঢাকার সঙ্গে এইসব প্রধান স্থানগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পাকিস্তানকে বিমান ও জলপথের সাহায্য নিতে হয়। ঐরূপ অবস্থা শেষ পর্যন্ত চলে।

আমি আমার হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়া থেকে সরিয়ে কুমিল্লার কাছে ভারতের মতিনগর নামক স্থানে স্থাপন করি। এখান থেকে কুমিল্লা এবং ঢাকা কাছে হওয়াতে আমার পক্ষে এসব জায়গাতে গেরিলা তৎপরতা চালানো অনেক সুবিধাজনক হয়। আমার ট্রেনিং ক্যাম্প এ সময়ে অনেক বড় হয়ে যায় এবং হাজার হাজার ছেলেদের আমি ট্রেনিং দিতে শুরু করি। এসব ছেলেদের মধ্যে অনেককেই আমি নিয়মিত বাহিনীতে ভর্তি করি এবং অনেককে অনিয়মিত বাহিনীর শিক্ষা প্রদান করি। প্রথম অবস্থায় সৈন্যদের এবং অনিয়মিত বাহিনীর লোকদের থাকা-খাওয়ার ও চিকিৎসার অত্যন্ত অসুবিধা হয়। আমাদের কাছে না ছিল রসদ, না ছিল টাকা পয়সা, না ছিল বাসস্থান। অনেক সময় এই সব হাজার হাজার লোককে খাওয়ানোর জন্য আমাকে বাংলাদেশের ভেতর বিভিন্ন রেশন ডিপো (এলএসডি) থেকে রসদ জোরপূর্বক আনতে হয়েছিল। কোনো কোনো সময়ে রসদের ব্যবস্থা হলেও হাজার হাজার লোকের খাবার তৈরির হাঁড়ি-পাতিল-বাসনপত্র ছিল না। তেলের ড্রাম কেটে আমরা পাত্র তৈরি করে নিই। অনেক সময় এমন দিন যায় যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার ক্যাম্পের লোক খেতে পেয়েছে—শুধু আধাসিদ্ধ ভাত, কোনো সময় ডাল ছাড়াই। থাকার জন্য কোন আশ্রয় না থাকায় অধিকাংশ লোকজনকে বৃষ্টিতে ভিজতে হত। কোনো বিশুদ্ধ পানি ছিল না, নালার পানি ব্যবহার করতে হত। তবুও এত কষ্টের ভেতরে আমি ক্যাম্পে লোকজনের মুখে সব সময় হাসি এবং উৎফুল্ল ভাব দেখতাম। এরা সবাই নিয়মিত এবং গণবাহিনী মিলেমিশে সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। ভারত সরকার ইউথ ক্যাম্প তৈরি করার জন্য সাহায্য দেয়। আমি আগরতলার রিলিফ ডিপার্টমেন্ট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা ইউথ ক্যাম্পের অনুমোদন করিয়ে নিই। তাদের কিছুটা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করি এবং আমার লোকদের প্রচেষ্টায় আমরা মেলাঘর নামক স্থানে একটা ক্যাম্প গঠন করি। এ জায়গাটা পাহাড়ের উপর এবং জঙ্গলের ভেতর বেশ একটা সুন্দর জায়গায় অবস্থিত ছিল। পাকিস্তানি হামলার আশঙ্কা থেকেও বিপদমুক্ত ছিল। এখানেই আমি আমার স্থায়ী হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি। এ ক্যাম্পটিতে বেশি জায়গা ছিল বলে আমি তিন চার হাজার লোককে একত্রে থাকা-খাওয়া এবং ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত করতে পারি। এ ক্যাম্পে আমি নিয়মিত ও গণবাহিনীর উভয় প্রকারের মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং শুরু করি। এ

সময় কুমিল্লার দক্ষিণে আমার যেসব সেনাদল ছিল তাদেরকে নিয়ে একটা সাব-সেক্টর গঠন করি। এ সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার আমি নির্ভয়পুরে স্থাপন করি। ক্যাপ্টেন আকবর, লে. মাহবুব এবং লে. কবির এই সাব-সেক্টর থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এখান থেকে একটি কোম্পানি সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর অধীনে লাকসামের পশ্চিম এলাকায় তাদের গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে এবং এখান হতে নোয়াখালী, লাকসাম, কুমিল্লা, চাঁদপুরের রাস্তায় শত্রুসেনাদের উপর অনেক আক্রমণ চালাতে থাকে।

জুলাই মাসে শত্রুদের একটি শক্তিশালী দল এ এলাকাকে মুক্তিসেনাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য লঞ্চযোগে চাঁদপুর থেকে ডাকাতিয়া নদীতে অগ্রসর হয়। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী আগে থেকে এ সম্বন্ধে খবর পেয়েছিল। সে ছতুরার নিকট একটি সুপারির বাগানে শত্রুসেনাকে এ্যামবুশ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। নদীর দু'পাশে হালকা মেশিনগান লাগিয়ে শত্রুদলের অপেক্ষায় ছিল। সকাল ১১ টায় শত্রুরা লঞ্চযোগে এ্যামবুশ অবস্থানের মধ্যে পৌছায় এবং নদীর দুই তীর থেকে আমাদের কোম্পানির লোকেরা শত্রুসেনার উপর অতর্কিত গোলাগুলি চালায়। এতে লঞ্চের মধ্যে অনেক শত্রুসেনা হতাহত হয়। এ সংঘর্ষে শত্রুসেনারা পর্যুদস্ত হয়। উপায়ান্তর না দেখে শত্রুসেনারা পিছু হটে যায় এবং আবার লঞ্চ থেকে নেমে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এবারও তারা পরাস্ত হয়ে চাঁদপুরে ফিরে যায়। এ কোম্পানি পরে চাঁদপুর থেকে কুমিল্লার বেশকয়েকটি সেতু ও রেলসেতু ধ্বংস করে দেয়। পাকবাহিনী পরবর্তী পর্যায়ে অনেকবার আমাদের এ মুক্ত এলাকাকে দখল করার চেষ্টা করে কিন্তু তারা অসমর্থ হয়। নির্ভয়পুর থেকে আমাদের সৈন্যরা এবং গেরিলা বাহিনী লাকসাম-চট্টগ্রাম রেলওয়ে লাইনের লাকসাম ও চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণে রেলসেতু এবং রাস্তার সেতু ধ্বংস করে দেয়। এতে চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়।

উত্তরাঞ্চলে কসবা, মন্দভাগ, আখাউড়া, শালদানদী প্রভৃতি অঞ্চলে যখন আমার সেনাদলের সাথে পাকবাহিনীর প্রত্যহ সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছিল, সে সময়ে কুমিল্লার দক্ষিণাঞ্চলে মিয়ারবাজার এবং চৌদ্দগ্রাম অঞ্চলেও আস্তে আস্তে পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। আমার ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানির একটি প্লাটুন এবং ইপিআর ও মুজাহিদদের নিয়ে গঠিত সম্মিলিত দলটি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মিয়ার বাজারে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর প্রতিরক্ষা অবস্থান গঠন করে ব্যূহকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। এর ফলে চট্টগ্রাম-ঢাকার মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পাকবাহিনীর মধ্যে এ অবস্থার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মিয়ারবাজারের নিকট যে রাস্তায় সেতুটি ছিল, সেটা ভেঙে দেয়া হয়। এছাড়া কুমিল্লার ৬ মাইল দক্ষিণে বাগমারাতে যে রেলওয়ে সেতুটি ছিল, সেটাও উড়িয়ে দেয়া হয়। পাকবাহিনী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পুনরায় খোলার জন্য ৩০ মে সকাল ৬ টায় দুই কোম্পানি সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। বেলা ১১ টায় সময় আমাদের একটি এ্যামবুশ দল মিয়ারবাজারের উত্তরে পাকসেনাদের উপরে অতর্কিত হামলা চালায়। শত্রুসেনাদল মিয়ারবাজারের এত আগে এ ধরনের হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না—ফলে তারা সম্পূর্ণ

হতচকিত হয়ে যায়। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে কুমিল্লার দিকে পলায়ন করে। এ যুদ্ধে শত্রুদের প্রায় ৫০ জন হতাহত হয় এবং আমাদের সেনাদল ২টি ৩ টন গাড়ি, গোলাবারুদসহ ধ্বংস করে দেয় এবং ১টি গাড়ি দখল করে নেয়। আমাদের পক্ষে ২ জন সৈন্য নিহত এবং একজন আহত হয়। এরপর শত্রুরা কুমিল্লা বিমান বন্দর অবস্থান থেকে আমাদের মিয়ারবাজারের প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর ভীষণভাবে ভারি কামানের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থানের উপর পুনরায় আক্রমণ করার চেষ্টা চালায়। শত্রুদের একটি শক্তিশালী পেট্রোল পার্টি চিওরা হয়ে মিয়ারবাজারের পূর্বদিক দিয়ে আমাদের অবস্থানের ভেতর প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু লে. কবিরের নেতৃত্বে আমাদের একটা ছোট দল পাকবাহিনীর পেট্রোল পার্টিকে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে পাকবাহিনীর ১০ জন নিহত হয়। লে. কবির পাকবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

মিয়ারবাজারের অবস্থানটির উপর পাকসেনাদের চাপ বাড়তে থাকে। কামানের গোলা দিনে দিনে আমাদের অবস্থানের উপর তীব্র হতে থাকে। অবস্থানটি বেশি দিন আর টিকানো যাবে না ভেবে আমি লে. ইমামুজ্জামানকে একটু পিছু হটে চৌদ্দগ্রাম থানার বাজারের নিকট নতুন করে অবস্থান তৈরির নির্দেশ দিই। লে. ইমামুজ্জামান তার দলকে নিয়ে চৌদ্দগ্রামে আবার এক নতুন প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এ প্রতিরক্ষাব্যূহ তিন দিকে মুখ করে গড়ে তোলা হয়। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের প্লাটুনটি মিয়ারবাজারে কুমিল্লার দিকে মুখ করে পজিশন নেয়। কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তায় মিয়ারবাজারে যে সেতুটি ছিল, সে সেতুটির দক্ষিণে অবস্থানটি গড়ে তোলে। এদের উপর দায়িত্ব ছিল কুমিল্লা থেকে পাকবাহিনীকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসরে বাধা দেওয়া। আরেকটি প্লাটুনকে পশ্চিম দিকে মুখ করে বাগমারা থেকে যে কাঁচা রাস্তা মিয়ারবাজারের দিকে আসে তার উপর প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করার নির্দেশ দিই। মুজাহিদ কোম্পানির দায়িত্ব ছিল দক্ষিণ দিকে মুখ করে মিয়ারবাজার হতে আধা মাইল দক্ষিণে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা মহাসড়কের উপর অবস্থান গড়ে তোলা এবং দক্ষিণ থেকে শত্রুসেনার অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া। কিছু কিছু মাইন এবং সরু বাঁশ কেটে আমরা এ অবস্থানটির চতুর্দিকে পুঁতে দিই। এতে আমাদের অবস্থানটি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ অবস্থানটির হেডকোয়ার্টার চৌদ্দগ্রাম থানায় স্থাপন করি। দু'সপ্তাহ পরে শত্রুসেনারা কুমিল্লার দিক থেকে এ অবস্থানটির উপর দুটি কোম্পানি নিয়ে আক্রমণ চালায়। কিন্তু শত্রুদের বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হওয়ার পরে তারা আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে। শত্রুরা আমাদের অবস্থানের উপর তাদের কামানের গোলা চালিয়ে যায়।

১৪ জুন সকাল ৬ টার সময় পাকসেনারা নয়াবাজার হয়ে চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু তারা নয়াবাজারের নিকট আমাদের একটা এ্যামবুশ পার্টির ফাঁদে পড়ে যায়। শত্রুদের প্রায় ৩০ জন হতাহত হয় এবং তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং পিছু হটে যায়। ২৯শে জুন সকাল ৬ টায় পাকসেনারা অন্ততপক্ষে দুটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে দুইদিক থেকে (লাকসাম এবং ফেনীর দিক থেকে) প্রবল আক্রমণ শুরু করে। কামানের তীব্র গোলার মুখে আমাদের সম্মুখবর্তী সৈনিকরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। পাকসেনাদের

আক্রমণ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টা পর্যন্ত পাকসেনাদের আক্রমণে আমাদের চৌদ্দগ্রামের অবস্থানটি সঙ্কটময় হয়ে পড়ে। আর বেশিক্ষণ এ অবস্থানটিতে থাকলে রাতের অন্ধকারে শত্রুসেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার আশঙ্কা ছিল। যদিও পাকসেনাদের সমস্ত দিনের যুদ্ধে অন্তত ২০০ জন হতাহত হয়েছিল এবং আমাদের পক্ষে ক্ষতির সংখ্যা ছিল ২ জন নিহত এবং ৪ জন আহত, তবুও চৌদ্দগ্রাম অবস্থানটি শত্রুদের প্রবল আক্রমণের মুখ থেকে আর রক্ষা করা যাবে না বলে সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় আমাদের সেনাদল অবস্থাটি পরিত্যাগ করে।

মে মাসে যখন আমাদের শত্রুদের সঙ্গে সম্মুখসমর চলছিল, সে সময় আমার মুক্তিযোদ্ধারা শত্রু বাহিনীর পিছনে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। ২১ মে ২ জন মুক্তিযোদ্ধা জামাল এবং খোকন একটি এ্যান্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে শত্রুবাহী ১টি ট্রাককে কুমিল্লার নিকট উড়িয়ে দেয়। গেরিলাদের আর একটি পার্টি দেবীদ্বার থানা আক্রমণ করে ৬ জন দালাল পুলিশকে নিহত করে। গেরিলাদের হাতে হাজিগঞ্জ থানার ১ জন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ও ২ জন দালাল পুলিশ নিহত হয়। এ পুলিশদের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে পাকবাহিনীর একটি ছোট দল (দশ জনের মত) হাজীগঞ্জ থানা পাহারায় নিযুক্ত হয়। গেরিলারা একদিন আক্রমণ চালিয়ে তাদের চারজনকে নিহত করে।

এ সময়ে ঢাকাতে আমাদের কমান্ডো ছেলেরা নয়টি সরকারি অফিসে আক্রমণ চালিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেগুলো ছিল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং; হাবিব ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সদরঘাট টার্মিনাল, পাকিস্তান অবজারভার অফিস প্রভৃতি। এসব আক্রমণে চারজন পাকসেনা অফিসার এবং দু'জন সৈনিক নিহত হয়।

কুমিল্লার দক্ষিণে গৌরীপুর নামক স্থানে আমাদের কমান্ডোরা পাকসেনাদের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণেও পাকসেনাদের ৯ জন সৈন্য নিহত হয়।

পাকসেনারা ইতোমধ্যে শালদানদী এলাকায় বিশেষভাবে তাদের সৈন্যসংখ্যা বাড়াতে থাকে। তাদের ১টা রেলওয়ে ট্রলি, যা শত্রুদের জন্য রেশন এবং এমুনিশন নিয়ে যাচ্ছিল—২১ মে আমাদের একটা ছোট এ্যামবুশ দলের হাতে ধরা পড়ে। এর ফলে আমাদের হস্তগত হয় MG1A3 মেশিনগান, ৭৫ মি.মি. এবং ১০৬ মি.মি. আরআর-এর শেল।

২২ মে তারিখে মুজাহিদ ক্যাপ্টেন আবদুল হকের নেতৃত্বে একটি গেরিলাদল শালদানদী এলাকায় অবস্থানরত শত্রুদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণটা শত্রুদের পিছন থেকে পরিচালিত করা হয়। শত্রুরা এরকম আক্রমণের জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না। মুজাহিদ ক্যাপ্টেন আবদুল হকের প্লাটুন শত্রুদের অবস্থানটি ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করে। শত্রুরা তাদের অবস্থানের ভেতর এ অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণ হতচকিত হয়ে যায়। এ আক্রমণ ফলে পরে আমরা জানতে পারি যে, শত্রুদের প্রায় ১৫ জন হতাহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৪ জন মারা যায়।

২৫ মে রাত আড়াইটার সময় আমাদের এ্যামবুশ পার্টি বাটপাড়া জোড়কাননে নিকটে শত্রুদের ১টা ট্রাক এবং ১টা আরআর জীপ এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে শত্রুদের প্রায় ২০ জন সৈনিক ট্রাক এবং জীপসহ ধ্বংস হয়ে যায়। ২৯ মে সকাল সাড়ে

৬ টায় একটা এ্যাবুশ পার্টি সুবেদার আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ১৫ জন লোক নিয়ে কুমিল্লার উত্তরে রঘুরামপুর নামক স্থানে এ্যামবুশ করে বসে থাকে। শত্রুদের একটা পেট্রোল পার্টি ১ জন অফিসার ও ২৫ জন সৈন্য নিয়ে আমাদের এ্যামবুশের ফাঁদে পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ২৭ মে মন্দভাগ থেকে ১টি প্লাটুন বিকাল সাড়ে ৫ টার কুটি-সালদানদী সিএন্ডবি রাস্তার উপর শত্রুদের এ্যামবুশ করে। এ এ্যামবুশের ফলে শত্রুদের ৯ জন লোক নিহত হয় এবং ১টা জীপ ও ১টা ডজ গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। শত্রুরা তাদের মৃতদেহগুলো রেখেই পলায়ন করে। পেট্রোল পার্টি ২ জন পাকসেনাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে সক্ষম হয়। মে মাসের মাঝামাঝি ফেনী এবং লাকসামের মাঝে রেলওয়ে ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া হয়। রেলওয়ে ব্রীজের উপর পাক সেনাদের ১০ জন পাহারারত ছিল। তাদেরকেও সেই সঙ্গে মেরে ফেলা হয়।

২৬ মে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে ১টি শক্তিশালী দল কসবার উত্তরে ইমামবাড়ির নিকট ১৫০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে রেলওয়ে ব্রীজ ধ্বংস করে দেয়। এরপর এ দলটি শত্রুদের জন্য এ্যামবুশ করে বসে থাকে। শত্রুরা ব্রীজের দিকে অগ্রসর হয়। শব্দ শুনে আমাদের দল তৈরি হয়। ব্রীজ পর্যন্ত পৌছার আগেই পাক সেনারা এ্যামবুশ-এর ভয়ে সেখান থেকে ফেরত চলে যায়। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন পরে তার দলটিকে নিয়ে কর্নেল বাজারে শত্রু অবস্থানের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের সময় ৭৫ মি.মি. আরআর-এর সাহায্যে শত্রুদের কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যেও গোলাবর্ষণ করে। এতে শত্রুদের ৮ জন সেনা নিহত হয় এবং কয়েকটি বাংকার ধ্বংস হয়।

আখাউড়া থেকে আমাদের অবস্থান পরিত্যাগ করার পর আমি আমার দলকে আখাউড়ার উত্তরে আজমপুর গ্রামে সিঙ্গরবিলে পজিশন নেওয়ার নির্দেশ দিই। লে. হারুনের নেতৃত্বে ১টি ইপিআর কোম্পানি এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের ১টি প্লাটুন আজমপুর রেলওয়ে কলোনীর পিছনে মাধবপুর সড়ক এবং রেল লাইনের উপর প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করে। এ জায়গাটা ছিল একটু উঁচু এবং এর ডান দিকে তিতাস নদী থাকাতে এ অবস্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাকসেনারা প্রথমে বুঝতে পারেনি যে আমরা এ জায়গাতে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়েছি। শত্রুদল আখাউড়া দখল করার পর ভেবেছিল যে এবার তারা সিলেট-আখাউড়া লাইনে ট্রেন যোগাযোগ পুনরায় চালু করবে। এ জন্য সিলেটের দিক থেকে একটি লাইট ইঞ্জিন এবং কয়েকটি বগিসহ মাধবপুর থেকে দক্ষিণে পাঠায়। সিঙ্গারবিল স্টেশনের কিছু উত্তরে পুলের নিকট লে. হারুন কয়েকটি এ্যান্টি-ট্যাংক মাইন রেল লাইনের নিচে আগেই পুঁতে রেখেছিল। এ ট্রেনটি লাইনের উপর দিয়ে আসার সময় মাইনের আঘাতে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এর কিছুদিন পরে পাকিস্তান বাহিনীর কিছু সৈনিক এবং রেলওয়ে কর্মচারীরা ক্রেন নিয়ে আসে এ ট্রেনটি তোলার জন্য। কিন্তু পাক সেনাদের এ দলটি লে. হারুনের পূর্ব পরিকল্পিত এ্যামবুশে পড়ে যায়। এর ফলে প্রায় ২০ জন পাক সেনা নিহত হয় এবং তারা রেলওয়ে কর্মচারীসহ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এর কিছুদিন পর লে. হারুন সিঙ্গারবিল রেলওয়ে ব্রীজ ১৪০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। পাকবাহিনী এ সেতুটি

মেরামত করার জন্য রেলওয়ে কর্মচারী ও আরো সরঞ্জাম সিঙ্গারবিল রেলওয়ে স্টেশনে জমা করে। এরপর সেসব সরঞ্জাম তারা রেলওয়ে সেতুটির নিকট নিজেদের তত্ত্বাবধানে এবং পাহারাধীনে আনে। লে. হারুনের মর্টান প্লাটুন সুবেদার শামসুল হক এ সময়েরই অপেক্ষায় ছিল। পাক বাহিনী কয়েক দিন পর সকালে যখন তাদের সেতু মেরামতের কাজ আরম্ভ করেছে, ঠিক সে সময় সুবেদার শামসুল হকের মর্টার তাদের লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে লে. হারুনও তার সৈন্যদের দিয়ে আক্রমণ চালায়। পাকবাহিনী এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তাদের সমস্ত সরঞ্জাম ফেলে সেখান থেকে পলায়ন করে এবং সে সঙ্গে সিলেট-চট্টগ্রাম রেলওয়ে লাইন তাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এ সংঘর্ষে পাক বাহিনীর ১০ জন লোক নিহত হয়।

কিছুদিন পর পাকবাহিনী আমাদের আজমপুর পজিশনের উপর কামান দিয়ে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে আজমপুর থেকে আমাদের অবস্থানটিকে দখল করতে না পারলে সিলেট-ঢাকা রেলওয়ে লাইন তারা কখনও চালু পারবে না।

২৯ মে পাকিস্তানিরা কয়েকটি ফাইটিং পেট্রোল আজমপুর পজিশনের পশ্চিমে তিতাস নদী বরাবর পাঠায় আমাদের পজিশন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার জন্য। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এসব দল আমাদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করে। আমরাও পাক সেনাবাহিনীর আখাউড়া অবস্থানে ছোট ছোট দল পাঠিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলি। আমরা জানতে পারি যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ট্রলি বা লাইট ইঞ্জিনের মাধ্যমে পাকবাহিনী তাদের রসদ এবং সরঞ্জাম আখাউড়াতে পাঠায়। এ খবর জানতে পেরে আমাদের একটি দল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২ মাইল দক্ষিণে রেল লাইনের নিচে মাইন পুঁতে দেয়, কিন্তু পাক বাহিনী স্থানীয় দালালদের সহায়তায় এসব মাইন সম্বন্ধে জানতে পারে এবং সেগুলো উঠিয়ে নেয়। পাকবাহিনী এ সময়ে রেল লাইনের নিকটবর্তী গ্রামের লোকদেরকে কঠোর সতর্ক করে দেয় যে, কোনো গ্রামের নিকটে মুক্তিবাহিনী যদি তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করে তবে সে গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হবে। এ সতর্কতার ঘোষণার প্রতিদিন রাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো হতে লোকজন রেলওয়ে লাইন এবং সড়ক পাহারা দিতো। এর ফলে আমাকে পাকবাহিনীর গতিবিধির উপর বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

এ রকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন আরো অনেক জায়গাতে আমি হই। আমাদের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য যেসব জায়গায় আমার লক্ষ্যস্থল ছিল সেখানে আমার সেনাদলগুলোকে সান্ধ্য আইন (কারফিউ) জারি করার নির্দেশ দিই এবং এ নির্দেশ বহুলাংশে সফল হয়। যদিও গ্রামবাসীদের পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করার কোনো ইচ্ছা ছিল না, তারা ওদের ভয়ে এসব বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করত। আমাদের সান্ধ্য আইনের ঘোষণায় অনেক ফল হয় এবং গ্রামবাসীরা আর বাধা সৃষ্টি করেনি। এরপর আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আখাউড়ার মাঝে দুইটি রেলসেতু উড়িয়ে দিই। এর ফলে আখাউড়ায় পাক সেনাদের অবস্থানটির জন্য রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। এরপরে তারা আখাউড়াতে হেলিকপ্টারের সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতে বাধ্য হয়।

পাকবাহিনী আমাদের আজমপুর পজিশনের উপর তাদের চাপ বাড়াতে থাকে। তাদের দুইটি কোম্পানি একদিন সকালে আজমপুরের আধা মাইল দক্ষিণে দরগার নিকট আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণ সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলে। আমাদের সৈন্যরাও আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রায় ৩০ জন শত্রুসেনা হতাহতের পর তারা আক্রমণ বন্ধ করে নিয়ে আবার পশ্চাদপসরণ করে।

বেশ কিছুদিন পর জুন মাসে পাকিস্তানি সৈন্য আবার মাধবপুরের রাস্তা এবং রেললাইনের উপর আমার পজিশনের দিকে অগ্রসর হয়। এবার পাকসেনাদের ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের অগ্রবর্তী দরগা পজিশন থেকে এ আক্রমণকে বেশ কয়েকদিন বিফল করে দেয়া হয় কিন্তু জুন মাসের শেষের দিকে আক্রমণ আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। পাকবাহিনী আখাউড়াতে ১২০ মি.মি. ভারি মর্টার এবং ১০৫ মি.মি. কামান নিয়ে আসে। এসব কামানের গোলার আঘাতে এবং ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-এর প্রবল চাপে আমাদের অগ্রবর্তী পজিশন সঙ্কটময় হয়ে ওঠে এবং শত্রুদের অন্তত ৫০ জন হতাহতের পর আমাদের পজিশন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়।

এর কিছুদিন পর জুলাই মাসে পাকবাহিনী আবার আজমপুরের দিকে মূল অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। এবারও তারা মাধবপুরের সড়ক ও রেল লাইনের উপর ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং মিলিশিয়াসহ আক্রমণ চালায়। আক্রমণের পূর্বে প্রচণ্ড গোলাগুলি করতে থাকে। আমরা এ আক্রমণের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যখন পাকসেনারা সারিবদ্ধ লাইনে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আমাদের মর্টার এবং মেশিনগান তাদের অন্ততপক্ষে ১০০/১২০ জনের মত লোককে হতাহত করে। তারা আমাদের অবস্থানের কোনো কোনো জায়গায় ঢুকে পড়ে কিন্তু আমাদের পাল্টা আক্রমণে আমরা পাকসেনাদের হটিয়ে দিই। এ সংঘর্ষ প্রায় দু'দিন চলে। আমরাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম, যেকোনো অবস্থাতেই আমরা আমাদের ঘাঁটি ছাড়বো না। শত্রুসেনাদের যথেষ্ট হতাহত হচ্ছিল প্রতিদিনই, কিন্তু তারাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমাদের এ অবস্থানটি দখল করা জন্য। তাদের কামানের গোলায় আমাদের পজিশনটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল কিন্তু তবুও আমাদের সৈনিকরা আত্মবিশ্বাস হারায়নি। আমাদের অবস্থানটি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের আগরতলা বিমান বন্দরের বেশ নিকটেই ছিল। এর ফলে পাক বাহিনীর কামানের গোলার স্প্লিন্টার মাঝে মাঝে বিমান বন্দরে গিয়ে পড়ছিল। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আমাদের এ অবস্থানটি থেকে যুদ্ধ আরো চালিয়ে যাওয়ার আপত্তি করে। তাদের বিমান বন্দরের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় এ আপত্তি করে। আমরা নিরুপায় হয়ে দেড় মাস যুদ্ধ চালানোর পর আজমপুর অবস্থান পরিত্যাগ করে সিঙ্গারবিলে নতুন অবস্থান গড়ে তুলি।

পাকবাহিনী এরপর মাধবপুর থেকে অগ্রসর হয়ে কলাছাড়া চা বাগান দখল করে নেয়। এই চা বাগানে তারা মিলিশিয়ার এক কোম্পানি এবং নিয়মিত বাহিনীর প্লাটুনসহ একটা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। লে. হারুন বুঝতে পারে যে, পাক সেনারা আখাউড়া থেকে (দক্ষিণ থেকে) এবং মাধবপুর থেকে (উত্তর থেকে) কলাছড়া হয়ে তার

সিঙ্গারবিল পজিশনকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে। লে. হারুন পাকবাহিনীকে পৃথকভাবে উত্তর এবং দক্ষিণে আঘাত হানার পরিকল্পনা নেয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কলাছড়া চা বাগান প্রথম আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। জুলাই মাসে কলাছড়া চা বাগান এবং চা বাগানে পাকবাহিনীর ঘাঁটি সম্বন্ধে সে বিস্তারিত খবরাখবর যোগাড় করে। একদিন রাত ৩ টার সময় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের একটা প্লাটুন এবং ইপিআর-এর একটা কোম্পানি নিয়ে গোপন পথে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কলাছড়া পাকবাহিনীর অবস্থানের ভিতরে সাহসের সাথে ঢুকে পড়ে। এ অকস্মাৎ গোপন আক্রমণ পাকসেনাদলকে হতভম্ব করে দেয়। তাদের কিছু বুঝাবার বা বাধা দেবার আগেই লে. হারুনের দল পাকবাহিনীর অন্তত ছয়টা বাংকার গ্রেনেডের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়। এরপর সমস্ত রাত ধরে পাকবাহিনীর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই চলতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা অকস্মাৎ আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে জন্য পরবর্তী পর্যায়ে যখন লে. হারুনের ছোট ছোট দলগুলো চা বাগানের সরু এবং গোপন রাস্তায় অগ্রসর হয়ে একটার পর একটা বাংকার ধ্বংস করে যাচ্ছিল তখন উপায়ান্তর না দেখে পাকবাহিনীর সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে এবং এতে তাদের বেশ লোক গুলিতে নিহত হয়। সকাল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত কলাছড়া চা বাগানটি সম্পূর্ণ লে. হারুনের দখলে এসে যায়। এ যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানিদের ৫০ জন নিহত হয় এবং আমাদের হাতে চারটি মেশিনগান ও ছয়টি হালকা মেশিনগান, বেশ কিছু রাইফেল এবং অজস্র গোলাগুলি ও প্রচুর রসদ এবং কাপড়-চোপড় হস্তগত হয়।

ক্যাপ্টেন গফ্ফার এবং ক্যাপ্টেন সালেকের নেতৃত্বে মুক্তিসেনারা মন্দভাগ এবং শালদানদীতে শত্রুসেনাদের উপর অনবরত আঘাত চালিয়ে যাচ্ছিল। ২৬ মে রাত ৯ টায় সুবেদার ভূঁইয়ার নেতৃত্বে দুটি সেকশন রকেট লঞ্চার নিয়ে শত্রুর শালদানদীর পজিশনের ভেতর ঢুকে যায়। এরপর শত্রুদের দুইটা বাংকার তারা রকেট লঞ্চারের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়। শত্রুরা তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালালে পেট্রোল পার্টি হালকা মেশিনগানের সাহায্যে শত্রুসেনাদের বেশ কিছু লোক নিহত করে এবং তারা পিছু হটে আসে। পরে জানতে পারা যায় যে, এ আকস্মিক হামলায় শত্রুদের ১ জন জেসিও এবং ৯ জন সৈন্য মারা যায়। ২৮ মে রাতে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডোরা কুমিল্লার নিকট কালিকাপুর রেলওয়ে ব্রীজ উড়িয়ে দেয়। ঐদিনই সকালে পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের কাছে রঘুরামপুরে একটি কোম্পানি নিয়ে আসে। এ কোম্পানিকে আমাদের সেনাদল সকাল সাড়ে ৬ টার সময় অতর্কিতে এ্যামবুশ করে এবং এ্যামবুশে পাকসেনাদের অন্তত একজন অফিসারসহ ৩৫ জন লোক হতাহত হয়। পাকসেনারা আঘাতে মরিয়া হয়ে ভুবনগর, শালুকমুড়া, খাড়েরা, ফকিরবাজার প্রভৃতি গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয়। এছাড়াও শত্রুসেনারা তিন ইঞ্চি মর্টার এবং ১২০ মি.মি. ভারি মর্টারের সাহায্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর উপর প্রচুর গোলা ছুঁড়তে থাকে।

২৮ মে আর একটি পেট্রোল পার্টি নায়েক গিয়াসুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে মনোহরপুর নামক গ্রামে শত্রুদের জন্য একটি এ্যামবুশ পেতে থাকে। পাকসেনাদের একটি কোম্পানি কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তা দিয়ে জঙ্গলবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সকাল

সাড়ে ৮ টায় পাসেনাদের কোম্পানিটি নায়েক গিয়াসুদ্দিনের এ্যামবুশ-এ পড়ে যায় এবং তাদের ২৫ জনের মত লোক হতাহত হয়। শত্রুসেনারা পিছু হটে এসে পুনরায় কামানের গোলার সাহায্যে আক্রমণের চেষ্টা করে। তখন আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে। শত্রুরা পার্শ্ববর্তী মাগুরা, মনোহরপুর ইত্যাদি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং সাথে সাথে কামানের সাহায্যে গোলা ছুঁড়তে থাকে।

শালদা নদীর শত্রু-অবস্থানটির উপর আমাদের চাপ আরো বাড়াতে থাকি। ২৫ মে আমাদের আর একটি ছোট দল অতর্কিত হামলা করে পাকসেনাদের ১ জন জেসিও এবং ৫ জন সৈন্যকে নিহত করে। তাদের দুইটি মর্টারও ধ্বংস করে দেয়া হয়। ২৭ মে শত্রুসেনারা কুটি থেকে সিএন্ডবি রাস্তায় শালদানদীতে আরো সৈন্য আনার চেষ্টা করে। সকাল ৭ টায় মুক্তিবাহিনী পাকসেনাদের এ দলটিকে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশ-এর ফলে একটা জীপ, একটা ডজ ধ্বংস ও শত্রুদের ৯ জন লোক নিহত হয়। শত্রুরা সামনে অগ্রসর হতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়।

২৮ মে সকাল ৬ টায় কুমিল্লার দক্ষিণে রাজারমার দিঘীর শত্রুদের একটা বাঙ্কারে আমাদের ২ জন সৈনিক গোপনে গিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে ৪ জন লোককে নিহত করে এবং তাদের রাইফেলগুলো দখল করে নিয়ে আসে। ঐদিনই সকাল ৯ টায় লাকসাম-কুমিল্লা রেল লাইনের উপর আলীশ্বরের নিকট মাইন পুঁতে একটা রেলওয়ে ইঞ্জিন ও দুটি বগি লাইনচ্যুত করে। ২৬ মে জগন্নাথদিঘী শত্রু অবস্থানের উপর লে. ইমামুজ্জামানের প্লাটুন রাত ১১ টার সময় অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে একটি প্লাটুন দুইটি তিন ইঞ্চি মর্টর ও দুইটি মিডিয়াম মেশিনগান ব্যবহার করে। আক্রমণের ফলে শত্রুদের ১৯ জন লোক হতাহত হয়। আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি ২৬শে মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা রোডের উপর উজানিরশা সেতুর নিকট পাকবাহিনীর পাহারারত সৈনিকদের ক্যাম্প আক্রমণের জন্য পাঠানো হয়। আমাদের দলটির সঙ্গে কমান্ডো শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু লোকও ছিল। কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এ দুই জায়গাতেই পাকবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তা তাদের গতিবিধির জন্য বিশেষ জরুরী ছিল। উজানিরশা ব্রীজকে ধ্বংস করে পাকসেনাদের গতিবিধিকে ব্যাহত করা ছিল আমাদের লক্ষ্য। আমার দলটি রাত ১১ টায় উজানিরশা ব্রীজটি অকস্মাৎ হামলা করে এবং সফলতার সাথে বিস্ফোরক লাগিয়ে একটা স্প্যান ধ্বংস করে দেয়। এ অকস্মাৎ হামলায় শত্রুদের ১৩ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হয়।

ক্যাপ্টেন গাফ্ফারের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি ২৯ মে শালদানদীর পিছনে পশ্চিমে শিবপুর, বাজরা ও সাগরতলাতে শত্রুদের অবস্থানের পিছনে সকাল ৪ টায় মেশিনগান এবং ৭৫ মি.মি. আরআরসহ ঢুকে পড়ে। শত্রুরা তাদের পিছনে হঠাৎ মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশে বেশ হকচকিয়ে যায়। সকাল ৫ টা পর্যন্ত আমাদের দলটি শত্রু অবস্থানের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে শত্রুদের বেশ কয়েকটা বাংকার ধ্বংস হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাদের প্রায় ২৭ জন লোক হতাহত হয়। পরে আমরা জানতে পারি যে, এ আক্রমণে ৩১ বালুচ রেজিমেন্ট-এর মেজর দুররানিও নিহত হয়।

৩১ মে আমাদের একটা পেট্রোল পার্টি কুটির নিকট শত্রুসেনাদের অবস্থান সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে যায়। কুটির নিকটে তারা দেখতে পায় যে পাকসেনাদের একটি জীপ ৬ জন সৈনিকসহ কুটি গ্রামে প্রবেশ করছে। জীপটি গ্রামের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্য থেকে ৬ জন পাকসেনা জীপ থেকে বের হয়ে গ্রামের ভিতরে যায়। আমাদের ছোট দলটি গ্রেনেড ছুঁড়ে ড্রাইভারসহ জীপটি ধ্বংস করে।

৩১ মে'তেই আমাদের ৬ জন সৈন্যের একটি দল সুবেদার আবদুল হক ভূঁইয়ার নেতৃত্বে শালদানদী রেলওয়ে স্টেশনের নিকট অনুপ্রবেশ করে। তারা যখন তথ্যানুসন্ধান করছিল, সে সময় পাকসেনাদের দু'জন ওপি, যারা গাছের উপর বসে দূরবীন লাগিয়ে আমাদের অবস্থান খুঁজছিল, তাদের দেখে ফেলে এবং গুলি করে মেরে ফেলে।

৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি মেজর সালেকের নেতৃত্বে এবং 'সি' কোম্পানি ক্যাপ্টেন গাফ্ফারের নেতৃত্বে শালদানদী এবং মন্দভাগে পাকসেনাদের উপর বারবার আঘাত হেনে যাচ্ছিল। শত্রুরা প্রতিদিন কিছু না কিছু হতাহত হচ্ছিল। আমাদের এই দুই কোম্পানির সেনাদল ৩ ইঞ্চি মর্টারের সহায়তায় শিবপুর, বাগরা, গৌরঙ্গলা প্রভৃতি জায়গা হয়ে শত্রু অবস্থানটি প্রায় তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল এবং প্রতিদিন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হয়ে গিয়েছিল যে পাকসেনাদের পক্ষে তাদের বাংকার থেকে মাথা তোলারও সুযোগ ছিল না। গুলি এবং মর্টারের গোলার সাহায্যে আমাদের সৈনিকরা তাদের সে অবস্থানে থাকাকে সম্পূর্ণ বিপজ্জনক করে তুলেছিল। এছাড়া কুটি এবং শালাদানদীর রাস্তায় আমাদের এ্যামবুশ পার্টি ২৪ ঘণ্টা এ্যামবুশ পেতে থাকতো। এর ফলে রসদ এবং অস্ত্র সরবরাহ করা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা রেলওয়ে লাইন ব্যবহারের বারবার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। এরপর শালদানদী দিয়ে রসদ সরবরাহ করার চেষ্টা করে। সেখানেও তারা আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় তাদের মনোবল সত্যিই ভেঙ্গে গিয়েছিল।

জুন মাসের ১ তারিখে আমাদের চাপের মুখে টিকতে না পেরে তারা মন্দভাগ এবং শালদানদী অবস্থানগুলো পরিত্যাগ করে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট তাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপন করে। সম্মুখসমরে শালদানদী থেকে শত্রুসেনাদের জুন মাসের প্রথম দিকে পর্যুদস্ত করে পিছু হটিয়ে দেওয়া আমাদের সৈনিকদের জন্য ছিল একটা বিরাট সাফল্য ও কৃতিত্ব। এতে আমার সেক্টরের সব সৈনিকের মনোবল পুনরুদ্ধার হয়। মার্চ মাস এবং মে মাসের প্রথম দিকে যখন পাকবাহিনী অতর্কিতে বিপুল সৈন্য, কামান, বিমান বাহিনীর সহায়তায় আমাদের উপর আক্রমণ চালায় তখন আমাদের সৈনিকরা অতি সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে পাকসেনাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে কিন্তু অবশেষে বেশির ভাগ সময়ে পাকবাহিনীর বিপুল শক্তি ও সরঞ্জামের সামনে বাধ্য হয়ে পিছু-হটতে হয় এবং সর্বক্ষেত্রেই আমরা প্রতিরক্ষা অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করেছি এবং পাকবাহিনী বারবার আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। শালদানদী এবং মন্দভাগে প্রথম এক মাস পর আমরা পাকবাহিনীর উপর প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে তাদের শক্তিশালী অবস্থান থেকে বিতাড়িত করি। শত্রুসেনা চলে যাবার পর ক্যাপ্টেন গাফ্ফারকে

মন্দভাগে প্রধান অবস্থান গড়ে তোলার এবং শালদানদীতে তার অগ্রবর্তী ঘাঁটি করার নির্দেশ দিই।

যখন আমি যুদ্ধ চালাচ্ছিলাম এবং যুদ্ধ আস্তে আস্তে যখন তীব্রতর হচ্ছিল, তখন আমার সেনাদলে আহত এবং নিহতের সংখ্যাও বেড়ে চলছিল। সে সময়ে আমার সৈনিক এবং গণবাহিনীর জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল না, শুধু আমার সঙ্গে সেনাবাহিনীর একজন ডাক্তার ক্যাপ্টেন আখতার ছিলেন। অফিসারের স্বল্পতায় তাকেও আমি একটা কোম্পানি কমান্ডার বানিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করেছিলাম এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন আখতার ডাক্তার হয়েও এ[illegible]ঙ্গন যোদ্ধা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার আহতের সংখ্যা যখন বেশ বেড়ে যায় এবং অনেক সময় দ্রুত চিকিৎসার অভাবে অনেক সৈনিক বা গণবাহিনীর ছেলেরা রক্তক্ষয় হয়ে মারা যেতে থাকে, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার সেক্টরেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডেকে পাঠাই এবং অতি সত্বর আমার হেডকোয়ার্টারের নিকট একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করার নির্দেশ দিই। ঢাকা থেকে কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে আমার সেক্টরে এসে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে দু-একজন চিকিৎসা শিক্ষানবিসও ছিল। তারাও আমাকে একটি হাসপাতাল গড়ার জন্য অনুরোধ জানায়। এসব ছেলেমেয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন আখতার কয়েকটি তাঁবুতে মতিনগরে আমার হেডকোয়ার্টারের নিকট মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রথম বাংলাদেশ হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। একটা সুন্দর বাগানের ভেতর উঁচু এবং শান্ত পরিবেশে এ হাসপাতালটি অবস্থিত ছিল। প্রথমে হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য আমাদের কাছে ঔষধপত্র বা অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও আমাদের এই নবীন দলটি ক্যাপ্টেন আখতারের নেতৃত্বে সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে হাসপাতালটি গড়ে তুলতে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেগম সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে টুলু এবং লুলু, মেডিকেল ছাত্রী ডালিয়া, আসমা, রেশমা, ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, সবিতা, শামসুদ্দিন প্রমুখ। এসব ছেলেমেয়ের দল নিজেদের সুখ ও আরাম ত্যাগ করে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের এবং গণবাহিনীর ছেলেদের সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসা করে যাচ্ছিল। এরা রেডক্রস ও বন্ধুরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক কষ্টে ঔষধপত্র যোগাড় করতো। মাঝে মাঝে আমি যতটুকু টাকা-পয়সা সেক্টর ফান্ড থেকে দিতে পারতাম, তা দিয়ে ঔষধপত্র যোগাড় করতো। জুন মাসের দিকে লন্ডন থেকে ডাঃ মবিন (প্রবাসী বাঙালি) আমাদের এই হাসপাতালের কথা শুনে এখানে এসে যোগ দেন। এর কিছুদিন পর ডাঃ মবিনের আর এক বন্ধু ডাঃ জাফরুল্লাহ সংবাদ পেয়ে লন্ডন থেকে এসে যোগ দেন। এরা দু'জনেই লন্ডনে এফআরসিএস পড়ছিলেন। দেশে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ শুনে তারাও এতে অংশ নেয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তারা তাদের লন্ডনের সব সুখ ও আরাম ত্যাগ করে আমাদের এ হাসপাতালের নাম শুনে ছুটে এসেছিলেন মাতৃভূমিকে শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করা জন্য। তাদের সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলাপ হয় এবং আমরা এ হাসপাতালটি গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা নিই। ডাঃ মবিন ও ডাঃ জাফরুল্লাহ আমাকে আশ্বাস দেন লন্ডনে

অবস্থিত প্রবাসী বাঙালিরা তাদের মাতৃভূমির জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে এবং আমরা যদি বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কাছে আহ্বান জানাই তবে এ হাসপাতালে সরঞ্জামের ব্যবস্থা তারা করতে পারবে। এ পরিপ্রেক্ষিত আমি ডাঃ মবিন ও ডাঃ জাফরুল্লাহকে বিস্তারিত সরঞ্জামের তালিকা বানানোর নির্দেশ দিই। আর সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্রের আর একটু পিছনে বিশ্রামগঞ্জে সুন্দর জায়গায় পাহাড়ের উপর অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা নিতে নির্দেশ দিই। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাকে আমি আমার সেনাদল ও ছেলেদের চিকিৎসার শোচনীয় অবস্থার কথা জানাই। তিনি আমাকে আমার হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনায় উৎসাহ দেন এবং সঙ্গে ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুরী দেন। এক মাসের মধ্যে বাঁশ, কাঠ ও ছন দিয়ে আমরা বিশ্রামগঞ্জে ২০০ বেডের হাসপাতাল তৈরি করে ফেলি। ডাঃ জাফরুল্লায় লন্ডনে চলে যান হাসপাতালের জন্য ঔষধপত্র ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে। আমাদের হাসপাতাল যখন তৈরি হচ্ছিল তখন আহতের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। ডাক্তারের যথেষ্ট অভাব ছিল। এছাড়াও ঔষধের অভাব ছিল আমাদের প্রকট। কিন্তু তবুও এসব অসুবিধার মধ্যেও আমাদের ছোট হাসপাতালটি আস্তে আস্তে বেশ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছিল। যদিও এগুলো বাঁশ এবং ছনের ঘর ছিল তবুও উৎসর্গিত ছেলেমেয়েদের প্রচেষ্টায় সমস্ত এলাকাটা শান্তিদায়ক হয়ে উঠেছিল। সকালে উঠেই সমস্ত হাসপাতালের বিভিন্ন কাঁচা ওয়ার্ডগুলো তারা নিজ হাতে লেপতো এবং পরিষ্কার করতো। হাসপাতালের রোগীদের কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে তাদের রান্নাবান্না, সেবা-শুশ্রূষা সবকিছু এরাই করতো। এদের সঙ্গে আরো ২০ জনের মতো ছেলেমেয়ে এসে যোগ দেয়। কিছুদিন পর ডাঃ জাফরুল্লাহ ও ডাঃ মবিনের প্রচেষ্টায় এবং লন্ডন প্রবাসী বাঙালি ডাক্তারদের সহায়তায় আমরা এ হাসপাতালটির জন্য অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদিসহ ঔষধপত্র প্রভৃতি পেয়ে যাই। ৯ মাসের যুদ্ধে এ হাসপাতালটি কয়েক হাজার আহতকে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হয়। এ হাসপাতালটির আর একটি অবদান ছিল যে এটি স্থাপনের পর আমার সেনাবাহিনীর ছেলেদের ও গণবাহিনীর মনোবল আরো বেড়ে যায়। তারা বুঝতে পারে যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয় তবে চিকিৎসার অভাবে মারা যাবে না। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং এটাকে আরো উন্নত করার জন্য উৎসাহ দেন। সেপ্টেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২৯ মে রাতে আমাদের একটা পেট্রোল পার্টি কুমিল্লার বাটপাড়ায় এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। শত্রুদের দুইটা গাড়ি রাত ২ টার সময় এ্যামবুশ-এর ফাঁদে পড়ে। এ্যামবুশ পার্টি সাফল্যের সাথে দুইটা গাড়ি ধ্বংস করে দেয় এবং সেই সঙ্গে ৪ জনকে নিহত করে। শত্রুদের পিছনের গাড়িটি ফাঁদে পড়ার আগেই পালিয়ে যায়। ২৯ মে রাত ৯ টায় ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে দুইটি সেকশন কসবার পশ্চিমে টি. আলীর বাড়িতে

শত্রুদের অবস্থানের উপর অকস্মাৎ অনুপ্রবেশ করে এবং আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মর্টারের সাহায্যে আড়াইবাড়ি শত্রু অবস্থানের উপর গোলা চালায়। এ আক্রমণে শত্রুদের একটা বাংকার ধ্বংস হয়ে যায় এবং ৩ জন লোক নিহত ও ২ জন শত্রুসেনা আহত হয়। এরপর আমাদের সৈন্যরা আক্রমণ শেষ করে নিজ অবস্থানে চলে আসে।

৩১ মে রাত ৩ টায় একটা প্লাটুন লে. মাহবুবের নেতৃত্বে কুমিল্লার দক্ষিণে জগমোহনপুর নামক স্থানে শত্রুঘাঁটির উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায় এবং শত্রুসেনাদের ১২ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা যখন কসবার দিকে তাদের চাপ বাড়াতে থাকে, আমি ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরকে একটা কোম্পানিসহ কসবার উত্তরে লাটুমুরায় অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিই।

৩০ মে সন্ধ্যা ৭ টায় আমাদের একটি ছোট গেরিলা দল ইকবালের (বাচ্চু) নেতৃত্বে বিবিরবাজারে শত্রুসেনাদের অবস্থানে আঘাত হানার জন্য পাঠানো হয়। পাকসেনারা তখন তাদের অবস্থানের উপর বসে তাদের সান্ধ্যভোজনে ব্যস্ত ছিল এবং এ সময়টি সম্বন্ধে আমাদের স্থানীয় লোকের মাধ্যমে খবর আগে থেকে সংগ্রহ করা ছিল। পাকসেনারা যখন খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল, সে সময় আমাদের গেরিলা দলটি তাদের উপর হঠাৎ গোমতী বাঁধের উপর থেকে গোলাবর্ষণ করে। এতে শত্রুদের ১০ জন হতাহত হয়। ঐদিনে সাড়ে ৬ টার সময় আমাদের মর্টার প্লাটুন সিঙ্গারবিল শত্রু-অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে। এর ফলে শত্রুদের ৬ জন নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। ২৯ মে চৌদ্দগ্রাম বাবুর্চি রোডে হরিসর্দার বাজারের নিকট রাস্তার ব্রীজ সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়।

২৯ মে বিকাল ৪ টায় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের পাইওনিয়ার পার্টিকে লাকসাম-চাঁদপুর রেলওয়ে লাইনে মাইন পুঁতে রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করার জন্য পাঠান হয়। এ দলটি মাইন পুঁতে লাকসাম এবং নোয়াখালীর মাঝে তিনটি রেলওয়ে বগী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। ফেরার পথে পাইওনিয়ার পার্টির ছোট দলটি চৌদ্দগ্রাম-চট্টগ্রাম সড়কের উপর একটি সদ্য মেরামত করা ব্রীজের উপর মাইন পুঁতে দেয়। রাত ৮ টায় একটি জীপ ৫ জন পাকসেনাসহ ফেনীর দিক থেকে আসে। জীপটি যখন ব্রীজের উপর পৌঁছে, তখন মাইন বিস্ফোরিত হওয়াতে ব্রীজটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর ফলে ১ জন অফিসারসহ ৩ জন পাকসেনা নিহত এবং অন্য ২ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ঐদিনই সন্ধ্যায় ৩ জন গেরিলাকে হ্যান্ড গ্রেনেডসহ চৌদ্দগ্রাম থানায় পাঠানো হয়। থানার সন্নিকটে দিঘীর নিকট শত্রুদের একটি বাংকার ছিল। গেরিলা দলটি গ্রেনেড ছুঁড়ে বাংকারটি ধ্বংস করে দেয়। ফলে ৩ জন শত্রুসেনা নিহত হয় এবং কিছু স্থানীয় লোকও আহত হয়। ৩০ মে চৌদ্দগ্রামের আধা মাইল উত্তরে চৌদ্দগ্রাম মিয়াবাজার রোডের উপর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানির একটি প্লাটুন হঠাৎ শত্রুদের ২৭ জনের একটি দলকে দূরে থেকে আসতে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এ্যামবুশ পাতে। শত্রুরা যদিও এ অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত হয়ে যায় কিন্তু তারা ত্বরিৎ গতিতে রাস্তার পশ্চিম পাশে সরে পড়ে। এ্যামবুশের ফলে শুধু তিনজন শত্রুসেনা নিহত হয়। আমাদের গেরিলারা লাকসাম-বাংগোড়া কাঁচা রাস্তার উপর ফেলনা গ্রামের নিকট সাইন পুঁতে রাখে। শত্রুদের একটি ৩ টন গাড়ি এ মাইনের সাথে সংঘর্ষে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

২৯ মে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানির একটা প্লাটুন দুইটি ৩ ইঞ্চি মর্টারসহ সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম থানার উপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। অতর্কিত মর্টারের গোলার আঘাতে এবং হালকা মেশিনগানের আঘাতে তাদের যথেষ্ট হতাহত হয়।

জুন মাসের ৪ তারিখে রাত ২ টার সময় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানির দুইটি ৬০ মি.মি. মর্টার নিয়ে শত্রুদের অবস্থানে গোপন পথে প্রবেশ করে শালদানদীর দক্ষিণে বাগড়াবাজার নামক স্থানে অবস্থান নেয়। ভোরবেলায় পাকসেনারা যখন তাদের বাংকারের উপর অসতর্কভাবে ঘোরাফেলা করছিল ঠিক সেসময় আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর অতর্কিত মর্টার এবং মেশিনগানের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এ অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণ হতচকিত হয়ে যায়। আধ ঘণ্টা পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোন পাল্টা জবাব আসে না। এ আক্রমণের ফলে শত্রুদের প্রায় ১৭ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়। আমাদের একজন সৈন্য বুকে গুলি লেগে গুরুতরভাবে আহত হয়। এ আক্রমণের তিন ঘণ্টা পরে শত্রুরা যখন ভেবেছিল আমাদের সৈন্যরা অবস্থান পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের আহতদের পিছনে নিয়ে যাবার যখন ব্যবস্থা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের সৈন্যরা আবার তাদের উপর দ্বিতীয় দফা আক্রমণ চালায়। এতে শত্রুদের আবারও ৫ জন নিহত হয়। এরপর আমাদের পার্টি অবস্থান ত্যাগ করে চলে আসে। ঐ দিনই সকাল ৭ টার সময় আমার আর একটা পার্টি শত্রুদের রাজাপুর অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ৬ জন শত্রুকে নিহত করে এবং তিনজনকে আহত করে। আমাদের আরেকটি দল রাত ১ টার সময় কুমিল্লার দক্ষিণে সুয়াগাজীতে চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের একটি সেতু উড়িয়ে দেয় এবং বাগমারার রেলওয়ে সেতু উড়িয়ে দেয়।

৬ জুন একটি ডেমোলিশন পার্টিকে লাকসামের দক্ষিণে পাঠানো হয়। এই দলটি 'খিলা' এলাকায় লাকসাম-নোয়াখালী মহাসড়কের উপর ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন পুঁতে রাখে। সকাল ৫ টায় কুমিল্লা থেকে শত্রু দুইটি জীপ ও একটি ট্রাক নোয়াখালী যাবার পথে মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং সে সঙ্গে ৪ জন পাক অফিসার এবং ৭ জন সৈন্য নিহত হয়। পাকসেনাদের দুটি কোম্পানি কুমিল্লা থেকে শালদানদীর উত্তরে আসে এবং রেলওয়ে লাইনের সাথে সাথে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি সকাল ৬ টার সময় শালদানদীর পূর্বদিক থেকে শত্রুদের এ অগ্রগতিকে বাধা দেয়। শত্রুরা বাধা পাবার ফলে পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমাদের গুলির মুখে পাকসেনাদের ২৫ জন লোক হতাহত হয়। সকাল ৬ টায় পাকসেনাদের আর একটি দল কুমিল্লা থেকে একটি ট্রেনে করে নয়নপুর এবং শালদা নদীর দিকে আসছিল। এ ট্রেনটি নয়নপুর ও শিবপুরের দক্ষিণে আমাদের অবস্থানরত সৈন্যদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের গোলাগুলির সামনে শত্রুরা টিকতে না পেরে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পর রাজাপুরে পশ্চাদপসরণ করে। এর ৪/৫ ঘণ্টা পরে শত্রুরা কামানের গোলার সহায়তার আবার নয়নপুর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। কিন্তু নয়নপুর স্টেশনে যখন তারা বাংকার তৈরিতে ব্যস্ত, সে সময় আমাদের মর্টার তাদের উপর ভীষণ গোলাবর্ষণ করে এবং শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষতি করে। শত্রুরা কিছু পিছু হটে

নয়নপুর গ্রামের ভেতর অবস্থান নিয়ে তাদের বাংকার তৈরি করতে শুরু করে। ঐদিনই শত্রুদের একটি পেট্রোল পার্টি কসবার দিকে অগ্রসর হয়, আমাদের ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের ‘ডি’ কোম্পানির একটা প্লাটুন তাদেরকে অতর্কিত এ্যামবুশ করে। পাকসেনারা এ এ্যামবুশ-এর ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের অন্ততপক্ষে ২০ জন লোক হতাহত হয়। শত্রুদের দলটি আমাদের এ্যামবুশ পার্টির তাড়া খেয়ে তাদের অবস্থান আড়াইবাড়ির দিকে পালিয়ে যায়। আমাদের একটি দল কুমিল্লার দক্ষিণে ধনপুর বিওপির নিকট পাকসেনাদের জন্য এ্যামবুশ পেতে থাকে। সকাল ৯ টায় পাকসেনারা দালালদের মারফতে এ খবর পায়। কুমিল্লা থেকে পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ একটি প্লাটুন গ্রামের ভেতর দিয়ে এসে আমাদের এ্যামবুশ পার্টিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। এ্যামবুশ পার্টি তৎক্ষণাৎ কিছু পিছু হটে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধ ঘণ্টাখানেক স্থায়ী হয়। ইতোমধ্যে আমাদের ধনপুরের কোম্পানি খবর পেয়ে লে. মাহবুব ও লে. কবিরের নেতৃত্বে তৎক্ষণাৎ এ্যামবুশ পার্টিটিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে এবং তারা পাকসেনাদের দলটিকে ঘিরে ফেলে। পাকসেনারা দু’দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের ভেতর লুকিয়ে পড়ে এবং দালালদের সাহায্যে এ ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ৫ জন সৈন্য নিহত হয়।

ঐদিনই বিকেল ৩ টার কচুয়াতে আমাদের আর একটা এ্যামবুশ পার্টির ফাঁদে শত্রুদের একটি দলের ১০ জন হতাহত হয়। ৪ ও ৫ জুন রাতে লাকসাম-চাঁদপুর রেল লাইনের মাঝে মধু রোডস স্টেশনের নিকটে জমজমা রেলওয়ে সেতুটি সুবেদার পাটোয়ারীর একটি দল উড়িয়ে দেয়। ঐদিনই রাতে আর একটি দল চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কের মহামায়া বাজারের নিকটে একটি পুল ধ্বংস করে দেয়। এর দুইদিন পরে চাঁদপুরের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। এর ফলে সমস্ত চাঁদপুরের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। কলকারখানাগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পরে শত্রুরা এসে পাশের গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটতরাজ ও মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে।

আমাদের ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের ‘ডি’ কোম্পানির একটা প্লাটুন ১১ জুন সকালে ৬ টায় কসবার উত্তরে চার্নল নামক জায়গায় এ্যামবুশ পেতে রাখে। শত্রুদের একটি কোম্পানি দুপুর ১২ টার সময় আমাদের এ্যামবুশ-এর মধ্যে পড়ে যায়। আমাদের গুলিতে তাদের ১২ জন সৈন্য নিহত হয়। এতে আমাদের একজন আহত হয় এবং পরে মারা যায়। পাকসেনারা পর্যুদস্ত হয়ে ঐ জায়গা থেকে ইয়াকুবপুরের দিকে পলায়ন করে। পলায়নের পর শত্রুদেরকে আমাদের আর একটি এ্যামবুশ পার্টি দেখে ফেলে এবং তারাও ইয়াকুবপুরের নিকট তাড়াতাড়ি শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য এ্যামবুশ পাতে। শত্রুরা এ এ্যামবুশ-এর ফাঁদেও পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এ এ্যামবুশে শত্রুদের ৮ জন লোক নিহত এবং ১৩ জন আহত হয়। এ দুটি এ্যামবুশের ফলে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয় এবং শত্রুরা এ এলাকা থেকে চলে যায়।

এ সময়ে শালদানদীর দক্ষিণে রেলওয়ে ব্রীজ, কুটির রাস্তায় বাসারা গ্রামের সেতু, মন্দভাগ গ্রামের সেতু সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়।

আমাদের হেডকোয়ার্টারে খবর আসে যে, পাকসেনারা তলুয়াপাড়া ফেরীঘাট তাদের যাতায়াতের জন্য সাধারণত ব্যবহার করে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে আমাদের একটি প্লাটুনকে ৯ জুন রাত্রে তলুয়াপাড়াতে পাঠানো হয়। এ প্লাটুনটি তলুয়াপাড়া ফেরীঘাটের নিকট শত্রুদের জন্য এ্যামবুশ পাতে। ১০ জুন রাত ১১ টার সময় শত্রুদের একটি দল সেই ফেরীঘাটে আসে এবং নৌকাযোগে পার হতে থাকে। শত্রুরা যখন নদীর মাঝপথে, এ্যামবুশ দলটি সে সময় তাদের উপর গুলি চালাতে শুরু করে। এর ফলে নৌকাটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। পাকসেনাদের ২০ জন লোক হতাহত হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন লে. মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ জুন রাত্রে মিয়ার বাজারের দক্ষিণে রাজারমার দিঘী ও জগমোহনপুর কাচারীর শত্রু অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এই সাহসী আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে হকচকিয়ে যায়। আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের বাংকারে গ্রেনেড ছুঁড়ে ৮ জন পাকসেনাকে নিহত ও ৫ জনকে আহত করে। পাকসেনারা বাধ্য হয়ে তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে। এরপর আমাদের সৈন্যরা অবস্থানটি দখল করে বাংকারগুলো ধ্বংস করে দেয় এবং শত্রুদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে।

আমাদের তিনটি গেরিলা দল কুমিল্লা ও লাকসামে পাঠানো হয়। ১১ জুন কুমিল্লাতে গেরিলা দলটি শত্রুদের বিভিন্ন অবস্থানের উপর দশটি গ্রেনেড ছোঁড়ে। এতে পাকসেনাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং সমস্ত কুমিল্লা শহর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ঐদিনই ৪ জন গেরিলার ডেমোলিশন পার্টি জাঙ্গালিয়ার নিকট মাইন পুঁতে একটি ডিজেল ইঞ্জিন লাইনচ্যুত করে।

লাকসামে যে গেরিলা দলটি পাঠানো হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল আবদুল মান্নান। পাকসেনাদের একটি গাড়ির উপর গ্রেনেড ছোঁড়ে এবং এতে ৫ জন নিহত হয়। এ দলটি লালমাই-এর নিকট পাকসেনারা যে ঘরে থাকতো, তার ভেতর দুটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতেও পাকসেনাদের যথেষ্ট হতাহত হয়। এর ফলে পাকসেনারা লাকসামে ৭২ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারী করে এবং অনেক নির্দোষ লোকের উপর অত্যাচার চালায়। আর একটি দল লাকসামে পাকসেনাদের উপর গ্রেনেড ছোঁড়ে। এর ফলে কিছু লোক আহত হয়। আমাদের দুটি এ্যামবুশ পার্টি ফুলতলি এবং মিয়ারবাজারের নিকট ঐদিনই এ্যামবুশ পেতে রাখে। পাকসেনাদের দুটি গাড়ি রাত সাড়ে ৪ টার সময় ফুলতলিতে এ্যামবুশ-এর মধ্যে পড়ে যায়। এ্যামবুশ পার্টি একটা গাড়িকে ধ্বংস করে দেয় এবং একটা গাড়ির ক্ষতিসাধন করে। শেষের গাড়িটির ভেতর এ্যামবুশ পার্টি ২টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতো শত্রুদের ৬ জন লোক নিহত হয়। মিয়ারবাজারের এ্যামবুশেও পাকসেনাদের ৫ জন লোক নিহত হয় এবং আমাদের এ্যামবুশ পার্টি একটি মর্টার দখল করে নেয়।

আমাদের কাছে সংবাদ আসে যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম জুন মাসে ঢাকাতে আসছে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরেজমিনে ঘটনাবলী অবগত হওয়ার জন্য। ইতোমধ্যে পাকিস্তানের প্রচারযন্ত্র সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এ খবর পাওয়া মাত্র আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

টিমটির যথাযথ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যদি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেয়, তাহলে সেই আর্থিক সাহায্যে পাকিস্তানের সমরাস্ত্র কেনার ও যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধে হবে। যে করেই হোক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিমকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। বরঞ্চ বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই পাকবাহিনীর আয়ত্তাধীনে নেই।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটি গেরিলা দলকে ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো এবং পাকিস্তানিদের নিহত করার জন্য পাঠিয়ে দিই। এই দলটি ৪ জুন ঢাকার গোপন পথে রওয়ানা হয়ে যায় এবং পরদিন সকালে পৌঁছে যায়। এই দলেরই ২ জন ছেলে ৮ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার সময় জিন্নাহ্ এভিনিউ'র কলেজ সু স্টোরের সামনে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। আর একটি গ্রেনেড ছোঁড়ে পুরানা পল্টনে সন্ধ্যা ৮টায়। ঐদিনই আর একটি ছোট দল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর একজন পাকিস্তানি অফিসারের বাড়ির ভিতরে দুপুর ২টার সময় গ্রেনেড ছোঁড়ে। এতে অফিসারের গাড়িটির ক্ষতিসাধিত হয় এবং একজন লোক আহত হয়। পরের দিন সন্ধ্যায় মর্নিং নিউজ অফিসের ভেতর গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। এতে কয়েকজন পাকিস্তানি দালাল নিহত হয়। ইতোমধ্যে দলটি খবরাখবর নেয় যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করছে। এ খবর পাবার পর ২ জন গেরিলা ৯ জুন সন্ধ্যা ৮-১৫ মিনিটে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রবেশ করে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম-এর হোটেলে ফেরার প্রতিক্ষায় থাকে। তারা যখন তাদের গাড়িতে করে আসেন এবং গাড়ি নিচে রেখে হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করেন, সে সময় গেরিলা দলটি গাড়ি লক্ষ্য করে ৩টি গ্রেনেড ছোঁড়ে। এর ফলে গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং নিকটবর্তী একজন পাঞ্জাবী সেনাও নিহত হয়।

এ সমস্ত ঘটনাবলীতে বিশ্ব ব্যাংক কর্মকর্তাগণ অতি সহজেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। ইন্টারকন্টিনেন্টালের বিস্ফোরণের তারা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) বর্তমান অবস্থা স্বাভাবিক নয়। এই ঘটনার পর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম দেশে ফিরে গিয়ে তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ঘটনাবলি তুলে ধরেন। তারা তাদের রিপোর্টে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য না দেওয়ার সুপারিশ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে এক বিরাট পরাজয়।

রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট পাঁচড়া গ্রামে শত্রুদের একটি অবস্থান ছিল। এই অবস্থানটি শত্রুদের নয়নপুর এবং রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিছন থেকে সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হত। মতিনগর থেকে একটি রেইডিং পার্টিকে পাঁচড়া গ্রামে শত্রু অবস্থানের উপর অনুপ্রবেশ করে আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। ১৩ জুন রাত ৯ টার সময় এ দলটি গ্রামের গোপন পথে শত্রু অবস্থানের ভেতর অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ অতর্কিত আক্রমণে শত্রুদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমাদের দলটি বেশ কিছু পাকসেনাকে হতাহত করে শত্রু অবস্থান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু এর পরেও শত্রুদের মধ্যে রাতের অন্ধকারে প্রায় ২ ঘণ্টা গোলাগুলি চলতে

থাকে। পাকসেনাদের অয়ারলেস ম্যাসেজ আমাদের অয়ারলেসে ধরা পড়ে। এতে শোনা যায় পাকসেনারা তাদের উর্ধ্বতন হেডকোয়ার্টারকে জানাচ্ছে "মুক্তিবাহিনী আমাদের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাচ্ছে। আমাদের নির্দেশ দিন আমরা এখন কী করব।" এ ছাড়াও শত্রু অবস্থান থেকে বারবার শ্লোগান শোনা যায় 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আজীজ ভাট্টি জিন্দাবাদ, ১৭ পাঞ্জাব জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ তখনও চলতে থাকে। আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের দলটি সরে আসার পরও পাকবাহিনী নিজেদের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা গোলাগুলি করে বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ১১ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়। বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য তাদের নিজেদের গুলিতেই হতাহত হয়।

পাকিস্তানিরা সীমান্তের নিকটবর্তী থানাগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং মিলিশিয়া নিয়োগ করতে শুরু করে। এসব থানাগুলোতে তারা বাংকার তৈরি করে অবস্থানকে শক্তিশালী করতে থাকে। কুমিল্লার উত্তরে সবগুলো থানাকেই তারা এভাবে শক্তিশালী করে। আমি এসব থানাগুলোকে আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের শাসনযন্ত্রকে অচল করে দেয়ার একটা পরিকল্পনা করি।

আমাদের অবস্থানের নিকটবর্তী বুড়িচং থানা আমার জন্যে একটা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা বুড়িচং-এর ভেতর দিয়েই আমার গেরিলারা গোপন পথে ঢাকা, কুমিল্লা এবং ফরিদপুরে যাতায়াত করত। এই থানাটির অবস্থানের গোপন পথগুলো মোটেই নিরাপদ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশরা পাকসেনাদের খবরাখবর পাঠাত। আমি বুড়িচং থানা আক্রমণ করার জন্য ১৬ জনের একটি দলকে পাঠাই। ১৪ জুন রাত ১ টায় এ দলটি অতর্কিত বুড়িচং থানার উপর আক্রমণ চালায়। থানায় প্রহরারত ইপকাফ (EPCAF—ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মর্ড ফোর্সেস) এবং পুলিশ যথেষ্ট বাধা দেয়, কিন্তু অবশেষে আমদের রেইডিং পার্টির হাতে তারা পরাস্ত হয়। এই সংঘর্ষে শত্রুদের ৮ জন নিহত হয়। আমাদের ১ জন লোক গুরুতরভাবে আহত এবং একজন নিখোঁজ হয়। এর ফলে বুড়িচং থানা শত্রুমুক্ত হয় এবং ঢাকা, কুমিল্লা যাবার গোপন পথ নিরাপদ হয়।

ঢাকাতে ৪ঠা জুন যে দলটিকে পাঠানো হয়েছিল, সেই দলটি তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে যাতে স্বাভাবিক পরিবেশ পাকিস্তানিরা ফিরিয়ে আনতে না পারে। ঢাকার প্রশাসন ব্যবস্থা যাতে পাকিস্তানিদের সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্তণে না আসে তার জন্য এই গেরিলা দল তৎপর ছিল। দলটি ১০ জুন দুপুর ২ টার সময় নিউ মার্কেটের প্রধান চত্বরে তিনটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে সমস্ত লোকজন নিউ মার্কেট থেকে পালিয়ে যায় এবং দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এর পরদিন বিকেল ৪ টায় যখন অফিস শেষ হচ্ছিল, ঠিক সে সময় ওয়াপদা বিল্ডিং-এর সামনে ২টি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে ওয়াপদা ভবনের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে নয়নপুর রেল স্টেশনের নিকট একটি গোডাউনের ভেতর শত্রুদের কিছুসংখ্যক সৈন্য তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। এই সংবাদ ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি জানতে পারে। মেজর সালেক একটি প্লাটুনের সঙ্গে আরআর ও মর্টার দিয়ে এ

ঘাঁটিটি আক্রমণের জন্য পাঠায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় এ দলটি শত্রুদের অবস্থানে দক্ষিণ দিক দিয়ে পিছনে অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিতে ঐ গোডাউনটির উপর আক্রমণ চালায়। আরআর এবং মর্টারের গোলা গোডাউনটির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে এবং কয়েকটি আরআর-এর গোলা গোডাউনের ভিতরে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। ঐদিন রাতেই হাবিলদার সালামের নেতৃত্বে নয়নপুরের রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণে আশাবাড়ি থেকে রাত দেড়টার সময় শত্রু অবস্থানের উপর আরআর ও মর্টারের সাহায্যে আবার আক্রমণ চালানো হয়। শত্রুরা এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা দ্বিতীয়বার আক্রমণ আশা করেনি। এ আক্রমণের ফলেও শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এ সময় শত্রুদের অবস্থান যেখানে যেখানে ছিলা, সেসব অবস্থানের কাছাকাছি এবং পাকসেনাদের চলাচলের রাস্তার উপর মাইন পুঁতে রাখা হয়েছিল। ১৪ জুন রাতে ফকিরহাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৭০০/৮০০ গজ উত্তরে শত্রুর একটি দল দুপুরে বখশিমাইল গ্রামে পেট্রোলিং-এর জন্য গিয়েছিল। আর একটি দল গাজীপুরের নিকট আমরা যে কাঠের পুল জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, সেটি মেরামত করছিল। বখশিমাইল গ্রাম থেকে সন্ধ্যার সময় পাকসেনাদের দলটি ফকিরাহাটে নিজেদের অবস্থানে ফেরার পথে আমাদের পুঁতে রাখা মাইনের মধ্যে পড়ে যায় এবং মাইনগুলো তাদের পায়ের চাপে ফাটতে থাকে। এতে তাদের অনেক লোক হতাহত হয় এবং তাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। এ মাইনগুলোর ফাটার শব্দ নিকটবর্তী অবস্থান থেকে পাকসেনারা শুনতে পায়। রাতের অন্ধকারে তারা ঠিক বুঝতে পারছিল না এ বিস্ফোরণের সঠিক কারণ কী। মুক্তিবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ভেবে পাকসেনারা প্রচণ্ডভাবে গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকে। এই গোলাগুলি রাত ৮ টা থেকে রাত ৩ টা পর্যন্ত চলতে থাকে। শত্রুরা নিজেদের লোকের উপর শত শত মর্টার এবং কামানের গোলা ছুঁড়তে থাকে। আমাদের দূরে অবস্থিত পেট্রোল পার্টি 'ইয়া আলী, ইয়া আলী, বাঁচাও বাঁচাও', প্রভৃতি ধ্বনি শুনতে পায়। পরে আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকমুখে শুনতে পাই যে আমাদের মাইনে এবং পাকসেনাদের নিজেদের গোলাগুলিতে অন্ততঃপক্ষে ৪০/৫০ জন পাকসেনা হতাহত হয়েছে। পরদিন সকালে পাকসেনাদের একজন বিগ্রেডিয়ার ঐ অবস্থানটি পরিদর্শন করতে কুমিল্লা থেকে আসেন।

পাকসেনারা এই দুর্ঘটনার পর রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকে এবং ফকিরাহাট পর্যন্ত তাদের পেট্রোলিং আরো জোরদার করে। মতিনগরে অবস্থিত আমাদের কোম্পানি শত্রুদের এই কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। ১৬ জুন সকালে আমাদের একটি প্লাটুন পাকসেনাদের পেট্রোলিং পথের উপর এ্যামবুশ পাতে। সকালে ৯ টায় পাকসেনাদের একটি দল রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে রওয়ানা হয়। এই দলটি আমাদের এ্যামবুশ-এর মধ্যে পড়ে যায়। অতর্কিতে আমাদের লোকেরা পাকসেনাদের উপর হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে গোলাগুলি চালায়। এই গোলাগুলিতে শত্রুদের ৮ জন নিহত ও ১ জন আহত হয়। এছাড়া আমাদের লোকেরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, টেলিফোন সেট, ড্রাইসেল ব্যাটারি ও আরও অন্যান্য জিনিস হস্তগত করে।

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার কাছে খবর আসে যে, শত্রুদের গোলন্দাজ বাহিনীর একটি ব্যাটারি (৬টি কামানের একটি দল) কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিএন্ডবি রোড তাদের কামানের অবস্থান হিসেবে ব্যবহার করছে। পাকবাহিনীর নয়নপুর, শালদানদী, টি. আলীর বাড়ি (কসবায়) প্রভৃতি শত্রু অবস্থানের জন্য এই কামানগুলো থেকে সাহায্যকারী গোলা নিক্ষেপ হতো। এই কামানগুলোর জন্য পাকবাহিনীর উপরোক্ত অবস্থানগুলোর উপর আমাদের আক্রমণ অনেক সময় কার্যকরী করা যেতো না। আমার কাছে আরও খবর আসে যে, প্রায় ১৫০ জন পাকসেনা এই কামানগুলোকে ব্যবহারও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র আমি লে. হুমায়ুন কবিরকে এই কামানের অবস্থানটি আক্রমণ করে ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ দিই। ৪০ জনের একটি দল (৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি) লে. হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে ১৬ জুন রাত সাড়ে ১০ টায় শত্রু অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। সমস্ত রাত চলার পর দলটি কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাস্তার পশ্চিমে সাইদাবাদের চার মাইল উত্তরে ভোরে পৌঁছে এবং তাদের একটি গোপন অবস্থান তৈরি করে। ১৭ জুন সমস্ত দিন এবং রাত লে. হুমায়ুন কবির তার সঙ্গে শুধু কয়েকজনকে নিয়ে পাকসেনাদের সাইদাবাদ অবস্থানটি সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করে। এই অবস্থানটি পাহারার কী কী ব্যবস্থা আছে, কারা পাহারাদার এবং কী কী অস্ত্রের সাহায্যে পাহারা দেয়, অবস্থানটিতে পৌঁছার জন্য গোপন পথ কী, কামানগুলো রাতে কোনস্থানে রাখে, কোনসময়ে পাকসেনারা বেশি সজাগ এবং তাদের বাংকারগুলো অবস্থান কোথায় প্রভৃতি খবরাখবর সে সংগ্রহ করে। এরপর লে. হুমায়ুন কবির সকাল হবার আগেই তার গোপন ঘাঁটিতে ফেরত আসে। ১৮ জুন সমস্ত দিন সে তার দলটিকে পাকসেনাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর বলে এবং পাক ঘাঁটিতে আক্রমণের পরিকল্পনা এবং কার্যাবলি সম্বন্ধে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেয়। সমস্ত দিন দলটি আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়।

১৮ জুন ভোর ৪ টায় লে. হুমায়ুনের নেতৃত্বে আমাদের দলটি পাকসেনাদের কামান ঘাঁটির উপর পিছন দিক থেকে অনুপ্রবেশ কর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে ছিল। তারা এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সেদিনই কুমিল্লা থেকে পাকসেনাদের দুটি কোম্পানি যেগুলো সামনে শত্রুদের ঘাঁটিকে শক্তিশালী করার জন্য যাচ্ছিল, তারাও রাতের বিশ্রামের জন্য অসতর্কভাবে এ অবস্থানটিতে শুয়েছি। আমাদের দলের অতর্কিত আক্রমণে পাকসেনাদের ঘাঁটিতে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং অনেক শত্রুসেনা আমাদের গুলিতে প্রাণ হারাতে থাকে। আমাদের লোকেরা কয়েকটি জীপ ও ৩ টন ট্রাকে গ্রেনেড ছুঁড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাকসেনারা এত বেশি ভীত হয়ে পড়ে যে তারা তাদের হেডকোয়ার্টারের জঙ্গী বিমানের সাহায্যের প্রার্থনা জানায়। যুদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ ভয়ঙ্করভাবে চলে এবং আমাদের সৈন্যরা কামান, গাড়ি ইত্যাদি ধ্বংস করে। কিন্তু ইতোমধ্যে সকাল হয়ে যায় এবং শত্রুদের প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে থাকে ও তাদের আবেদনে তিনটি জঙ্গী বিমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমাদের রেইডিং পার্টির উপর আক্রমণ চালায়। লে. হুমায়ুনের দলটি তখন আটকা পড়ে যাবার ভয়ে আক্রমণ শেষ করে গ্রামের গোপন পথে মেঘনার দিকে পশ্চাদপসরণ

করে। এই পশ্চাদপসরণের সময় তারা বারবার পাকিস্তানি জঙ্গী বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবুও সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে তারা সাফল্যের সাথে শত্রুদের আওতার বাইরে চলে আসে। একদিন পর তারা অন্য পথে আবার কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রধান সড়কের উপর আসে এবং সতোরা সড়কের সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে নিজ ঘাঁটিতে নিরাপদে ঘাঁটিতে নিরাপদে ফিরে আসে।

এ আক্রমণের ফলে যদিও লে. হুমায়ুনের দলটি পাকসেনাদের কামান দখল করে আনতে পারেনি কিন্তু তবুও এ আক্রমণের হতাহত হয় এবং তারা জন্য ছিল ভয়াবহ। অন্ততঃপক্ষে ৫০/৬০ জন পাকসেনা এ আক্রমণে ফলাফল পাকসেনাদের ২টি বেসামরিক বাসে লাল ঝাণ্ডা তুলে হতাহতদের কুমিল্লার দিকে নিয়ে যায়। এ খবর স্থানীয় লোকেরা জানায়। তাছাড়া, গাড়ি, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও এই অবস্থানে রাখা কামানের গোলা যেগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল, তা ছিল তাদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষতিকর। আসার পথে দলটি যে সেতু উড়িয়ে দিয়ে আসে, এতেও তাদের গতিবিধির উপর যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করে। এ হামলার পর শত্রুসেনারা প্রায় ২/৩ সপ্তাহ সমস্ত সেক্টরে তাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। পাকসেনারা এরপর নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালায় এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১৬ জুন আমাদের কসবা অবস্থান থেকে ছোট দল বাগাবাড়ি নামক জায়গায় এ্যামবুশ পাতে। সকাল ৬টায় পাকসেনাদের একটি পেট্রোল পার্টি কসবার দিকে টহলে আসে। পাকসেনাদের এই দলটি অসতর্কভাবে হঠাৎ আমাদের এ্যামবুশ পার্টির বাংকারের নিকটে চলে আসে। আমাদের এ্যামবুশ দলটি এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অতি নিকট থেকে তাদের সমস্ত অস্ত্র গুলি চালাতে থাকে। অতর্কিত গুলির আঘাতে প্রায় ১০ জন পাকসেনা নিহত ও ৫ জন আহত হয়। শুধু ২ জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পাকসেনারা ১৮ জুন আমাদের অবস্থান কৈখোলার উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে অবস্থানকারী প্লাটুনটি কৈখোলা ত্যাগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের একটি দল কৈখোলা দখল করে নেয়। ঐদিন রাতে মেজর সালেক চৌধুরীর নেতৃত্বে আমাদের 'এ' কোম্পানি ভোর রাতে কৈখোলায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালায়। হাবিলদার সালামের প্লাটুন শিবপুরের দিক থেকে এবং সুবেদার আবদুল হক ভূঁইয়ার প্লাটুন দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুসেনাদের অবস্থানের ভেতর অনুপ্রবেশ করে যায়। হাবিলদার সালামের প্লাটুনের আক্রমণে পাকসেনাদের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং পাকসেনারা হাবিলদার সালামের সামনের অবস্থানটি পরিত্যাগ করে পিছনে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের ভেতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং শত্রুরা সমগ্র কৈখোলা এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করে। ২ ঘণ্টার মধ্যে প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে পাকসেনারা অবস্থানটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে। এ যুদ্ধের ফলে পাকসেনাদের একজন জেসিওসহ ৩১ জন সিপাই হতাহত হয় এবং অবস্থানটি থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম দখল করা হয়।

২৯ জুন ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরের হেডকোয়ার্টারের খবর আসে যে, পাকসেনাদের একটি প্লাটুনর সাগরতলার ভেতর পেট্রোলিং করার জন্য যেতে দেখা গেছে। ক্যাডেট

হুমায়ুন তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন নিয়ে মন্দভাগের নিকট দ্রুত এ্যামবুশ পাতে। সন্ধ্যা ৭ টায় পাকসেনারা ফেরার পথে তাদের দলটির শেষ অংশটিকে ক্যাডেট হুমায়ুন এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে পাকসেনাদের ৯ জন সৈন্য নিহত হয় এবং বাকি পাকসেনারা মন্দভাগ গ্রামের দিকে পালিয়ে তাদের জীবন বাঁচায়।

জুন মাসের মাঝামাঝি লে. মাহবুব ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানি থেকে একটি প্লাটুনকে পাকসেনাদের যাতায়াতের রাস্তা ধ্বংস করার জন্য কুমিল্লার দক্ষিণে প্রেরণ করে। এ দলটি ১৮ জুন সন্ধ্যা ৬ টায় কুমিল্লা-লাকসামের বিজয়পুর রেলওয়ে ব্রীজ, কুমিল্লা-বাগমারা রোডের সেতু উড়িয়ে দেয়। এই সেতুগুলোর ধ্বংসের ফলে কুমিল্লার দক্ষিণে সড়ক এবং রেলওয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। ঐদিনই দলটি বিজয়পুর এবং মিয়াবজারের নিকট কয়েকটি ইলেকট্রিক পাইলন উড়িয়ে কাপ্তাই থেকে ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। পাকসেনাদের একটি প্লাটুন সন্ধ্যার সময় চৌরাস্তার নিকট পেট্রোলিং-এ আসে। এই পাকসেনারা দলটিকে এ্যামবুশ করলে ২ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং অত্যাচার চালায়। আমাদের পেট্রোল পার্টি খবর আনে যে, পাকিস্তানিদের প্রায় এক কোম্পানি সৈন্য মিয়াবাজারের উত্তরে একটি গোডাউনের মধ্যে অবস্থান করছে। পেট্রোলটি এই গোডাউনটিতে পৌঁছাবার গোপন রাস্তা, পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিস্তারিত খবর নিয়ে আসে। এ সংবাদ পেয়ে লে. মাহবুব ৩৩ জনের একটি কমান্ডো প্লাটুন ব্লেন্ডেসাইড ও মর্টারসহ রাত ৯ টায় গুদামটি আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই কমান্ডো দলটি রাত ১২ টার সময় শত্রু অবস্থানের নিকট পৌঁছে যায়। তারা একটি ছোট দল পাঠিয়ে অবস্থানটির সর্বশেষ খবর নেয় এবং জানতে পারে পাকসেনারা অবস্থানটিতে বেশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। রাত ১ টায় আমাদের কমান্ডো প্লাটুনটি অতর্কিতে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভেতর অনুপ্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের উপর হালকা অস্ত্রের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনারা অনেকেই গুলিতে হতাহত হয়। তারা আমাদের কমান্ডো প্লাটুনের উপর পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৮ জুন রাত ৯ টায় মিয়াবজারের দক্ষিণে আমাদের আরেকটি প্লাটুন পাকসেনাদের ২টি বাংকারের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা এরপর সমস্ত রাত অবিরাম মর্টারের গোলা ছুঁড়তে থাকে। আমাদের এই দলটি খিলা রেলওয়ে স্টেশনের নিকট কয়েকটি ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন রাস্তায় পুঁতে রাখে। পাকসেনাদের একটি জীপ রাতে ঐ রাস্তায় যাওয়ার পথে মাইনের উপর পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় এবং ৫ জন পাকসেনাও নিহত হয়।

জুন মাসেই পাকসেনারা কুমিল্লা শহরে শাসনকার্য পুনরায় স্বাভাবিক করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেয়। সরকারি অফিস ভালভাবে চলার জন্য তারা সরকারি কর্মচারীদের বাধ্য করে। শহরের দোকান ও যানবাহন চালু করার বন্দোবস্ত করে। পাকিস্তানিদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য ৪ জন গেরিলার একটি দলকে ৬ই জুন কুমিল্লার উত্তরে দিয়ে গোমতী পার করে কুমিল্লা শহরে পাঠান হয়। এ দলটি গ্রেনেড ও

স্টেনগান সঙ্গে নিয়ে যায়। তিনদিন পর্যন্ত শহরের ভেতর একটি গুপ্ত অবস্থানে দলটি নিজেদের ঘাঁটি গড়ে। কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাকসেনাদের টহলদার দলগুলো সম্বন্ধে তারা বিস্তারিত খবরাখবর যোগাড় করে। ১০ জুন সন্ধ্যায় কমার্স ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, জজকোর্ট প্রভৃতি স্থানে পর পর পাকসেনাদের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এর ফলে একজন পাকসেনা নিহত ও ৫ জন আহত হয়। ঐ দিনই ৭ জন রেঞ্জারের একটি দলকে তারা আক্রমণ করে। এতে ২ জন মিলিশিয়া নিহত হয় এবং তাদের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কয়েকদিন পর ২১ জুন সকালে একটি আরআর আমাদের সৈন্যরা কুমিল্লা শহরের নিকটে বয়ে নিয়ে যায়। এবং কুমিল্লা বিমান বন্দরের ও শহরের উপকণ্ঠের উপর গোলাগুলি করে এবং পাকিস্তানিরা এতে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকে। এসব কার্যকলাপের ফলে কুমিল্লা শহর ও তার নিকটবর্তী এলাকার লোকেরা আবার তাদের সাহস ফিরে পায়। অনেকেই শহর থেকে বাইরে চলে যায়। এসব আক্রমণের ফলে পাকিস্তানিদের শাসন ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়।

শালদানদীতে পাকসেনারা জুন মাসে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করছিল। পাকসেনাদের কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্য মেজর সালেক ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানির ১টি প্লাটুন মর্টারসহ শালদানদীর পশ্চিম দিকে পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি রাত ৩ টায় পাকসেনাদের অবস্থানটি ঘুরে পিছনে যেতে সক্ষম হয়। সকাল সাড়ে ৫টার সময় পূর্ব নির্ধারিত স্থানে তারা নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এরপর প্রত্যুষের সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে মেশিনগান ও অন্যান্য হালকা অস্ত্রশস্ত্র এবং মর্টারের সাহায্যে শত্রু অবস্থানের ওপর অতি নিকট থেকে হামলা চালায়। পাকসেনারা দিনের বেলায় তাদের অবস্থানের পিছনে এত নিকট থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং এর ফলে তাদের অন্ততঃপক্ষে ১ জন জেসিওসহ ৩২ জন হতাহত হয়। পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল রাতে শালদা নদী অবস্থান হতে কসবাতে টহলের জন্য গিয়েছিল। এই সংবাদটি আমাদের লোকের জানা ছিল না। পাকসেনাদের সঙ্গে আমাদের প্লাটুনটি যখন ভয়ংকর সংঘর্ষ করছিল, সে সময় পাকসেনাদের টহলদার দলটি কসবা থেকে ফেরার পথে আমাদের প্লাটুনটির পিছনে অবস্থান নিয়ে আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। আমাদের প্লাটুনটি সঙ্গে সঙ্গে অতিকষ্টে পাকসেনাদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। আসার সময় আমাদের একজন লোক আহত হয়। পাকসেনারা এরপর শালদানদী অবস্থান আরো শক্তিশালী করে তোলে।

আমরা খবর পাই যে, পাকবাহিনী প্রায়ই হোমনা থানার নিকট কাঁঠালিয়া নদী এবং গোমতী নদীতে লঞ্চের দ্বারা পেট্রোলিং করে। এ খবর শুনে আমি হেডকোয়ার্টার থেকে ১টি প্লাটুন হাবিলদার গিয়াসুদ্দিনের নেতৃত্বে হোমনা থানাতে প্রেরণ করি। এই দলটি অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দাউদকান্দির ৮ মাইল উত্তরে ও গৌরীপুর হতে সাত মাইল উত্তরে-পশ্চিমে চড়কমারী গ্রামের নিকট তাদের গুপ্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। হাবিলদার গিয়াসুদ্দিন চড়কমারী গ্রামের নিকট পাকসেনাদের লঞ্চকে এ্যামবুশ করার

জন্য তার দলটিকে নিয়ে নদীর পাড়ে একটি অবস্থান গড়ে তোলে। পাকসেনারা নিত্যনৈমিত্তিক টহলে সকালে পশ্চিম হতে কাঁঠালিয়া নদী দিয়ে লঞ্চে অগ্রসর হয়। লঞ্চটি যখন ৫০ গজের ভেতর চলে আসে, তখন হাবিলদার গিয়াসুদ্দিনের পার্টি মেশিনগান, হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র হতে অতর্কিতে গোলাগুলি চালাতে থাকে। পাকসেনারা অনেকেই হতাহত হয়। লঞ্চটির সারেং লঞ্চটিকে একটা চরের দিকে নিয়ে ভিড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। এরপর অনেক পাকসেনা লঞ্চ থেকে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কিন্তু তাতেও তারা পানিতে গুলির আঘাতে মারা যায়। লঞ্চটিও আমাদের মেশিনগানের গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ডুবে যায় এবং বেশিরভাগ পাকসেনা পানিতে পড়ে যায়। শুধু কয়েকজন সাঁতরিয়ে অন্য পাড়ে উঠে পালাতে সক্ষম হয়। এই লঞ্চে পাকসেনাদের অন্তত ৭০/৮০ জন লোক ছিল এবং সঙ্গে ৩ জন বেসামরিক লোকও ছিল। হাবিলদার গিয়াসুদ্দীনের লোকেরা লঞ্চ থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবরুদ উদ্ধার করে। সেদিনই বিকেল ৫ টার সময় পাকবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার তাদের এই লঞ্চটি এবং লোকজনের খবরাখবর নেয়ার জন্য ঐ এলাকায় অনেক ঘোরাফিরা করে কিন্তু কোনো খোঁজ খবর না পেয়ে হেলিকপ্টারটি ফেরত চলে যায়। এ এ্যাকশন সকালে প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা চলে এবং পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকায় স্থানীয় লোকেরা দূর থেকে তা প্রত্যক্ষ করে। পাকবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখে স্থানীয় লোকের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। তারা মুক্তিবাহিনীর উপর আরো আস্থাশীল হয়। হাবিলদার গিয়াসুদ্দিন এখনও এই এলাকার লোকের কাছে কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে বিরাজ করছেন।

সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর অধীনে যে কোম্পানিটি লাকসামের দক্ষিণে নোয়াখালীর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল, সে কোম্পানিটিও এ অঞ্চলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের কার্যকলাপ চালায়। চাঁদপুর থেকে পাকবাহিনী যে রাস্তা নোয়াখালী যাবার জন্য ব্যবহার করত, সে রাস্তায় লক্ষ্মীপুরের নিকট ৯০ ফুটের একটি সড়কসেতু বিধ্বস্ত করে দেয়। এর কিছুদিন পর পাকবাহিনী পশ্চাদপসরণ করলে সুবেদার আলী আকবরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী রায়পুর থানা আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ফলে দালাল পুলিশরা থানা থেকে পালিয়ে যায়। পাকবাহিনীর মাঝে মাঝে এ থানাতে এসে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করত এবং দালাল পুলিশের সাহায্যে স্থানীয় লোকদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করত। এ থানা দখল করে নেয়ার ফলে সমস্ত এলাকা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

১৬ জুন আমাদের ২টি গেরিলা পার্টি হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠানো হয়। ৬ জনের একটি পার্টিকে কুমিল্লার দক্ষিণে ইলেকট্রিক পাইলন উড়ানোর জন্য এবং আরও ৬ জনের একটি পার্টিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরে তিতাস গ্যাস লাইন কাটার জন্য পাঠানো হয়। ২১ জুন প্রথম পার্টিটি দুইটি ইলেকট্রিক পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে তিতাস গ্যাস ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ এবং সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনগুলোতে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে এসব পাওয়ার স্টেশনগুলো হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এতে শিল্প এলাকাগুলোর যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

মতিনগর থেকে একটি প্লাটুন রাজাপুরের পাক অবস্থানের উপর হামলা করার জন্য পাঠানো হয়। এই প্লাটুনটি ২২ জুন আমাদের ঘাঁটি থেকে রাজাপুরের দিকে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যায় রাজাপুর শত্রু অবস্থানটি তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রেকি করে। তারা জানতে পারে যে, পাকসেনারা বেশ অসতর্কভাবেই তাদের অবস্থানে আছে। ২২ জুন ভোর ৪ টায় আমাদের দলটি অতর্কিতে গোপনপথে শত্রু অস্থানের ভেতর প্রবেশ করে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকসেনারা সম্পূর্ণ হতচকিত হয়ে যায়। এই আঘাতে আমাদের লোকদের হাতে তাদের প্রায় ১৫ জন লোক হাতহত হয়। আমদের একজন আহত হয়। আক্রমণ প্রায় একঘন্টা চলার পর আমাদের লোকেরা পিছু হটে আসে।

আমাদের রেকি পার্টি খবর আনে যে পাকসেনারা কসবার উত্তরে চন্দ্রপুর এবং লাটুমুড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পাবার পর লে. হুমায়ুন কবির পাকসেনাদের চতুর্দিক থেকে এ্যামবুশ করার জন্য ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানির তিনটি প্লাটুন ইয়াকুবপুর, কুয়াপাইনা এবং খৈনলে পাঠিয়ে দেয়। এই তিনটি প্লাটুন নিজ নিজ জায়গায় ২৩শে জুন সকাল ৬টার মধ্যে অবস্থান নেয়। পাকসেনারা সমস্ত রাত অগ্রসর হওয়ার পর সকালে আমাদের অবস্থানের সামনে উপস্থিত হয়।

পাকসেনারা আমাদের উপরোল্লিখিত অবস্থানের ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে এসে পড়লে তিনদিক থেকে আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকসেনাদের ৮ জন নিহত এবং তিনজন আহত হয়। পাকসেনারা একটু পিছু হটে গিয়ে আবার আক্রমণের চেষ্টা চালায় কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর সমস্ত দিন উভয়পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে এবং সন্ধ্যার সময় পাকসেনারা পিছু হটে যায়। পাকসেনাদের পশ্চাদপসরণের সময়ও আমাদের ইয়াকুবপুরের প্লাটুন তাদেরকে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে বেশ ক্ষতিসাধন করে। পিছু হটে গিয়ে লাটুমুড়ার উত্তরে অবস্থান নেয় এবং প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করতে থাকে। ২৪শে জুন পাকসেনারা যখন লাটুমুড়াতে তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরিতে ব্যস্ত ছিল, সকাল ৫ টায় আমাদের কুয়াপাইনা ও খৈনল এলাকা থেকে শত্রুদের বামে এবং দক্ষিণে আমাদের ৩টি প্লাটুন আবার অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ৯ জন লোক নিহত হয়। আমাদের ১ জন আহত হয়।

নোয়াখালীর উত্তরে পাকবাহিনী ফেনী থেকে নোয়াখালী পর্যন্ত ট্রাকে টহল দিত। এ খবর আমাদের নোয়াখালীর গেরিলা হেডকোয়ার্টার-এ পৌঁছে। সেখান থেকে আমাদের ২টি এ্যামবুশ পার্টি বোগাদিয়া এবং বজরাতে পাঠানো হয়। ২১ জুন এই দুই পার্টি সন্ধ্যায় উপরিউক্ত দুটি স্থানে এ্যামবুশ পাতে। তারা রাস্তাতে একটি এ্যান্টি-ট্যাংক ও এ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন পুঁতে রাখে। সন্ধ্যায় পাকসেনাদের দুটি ট্রাক ফেনীমুখে যাচ্ছিল। এই ট্রাক দুটি এ্যামবুশ স্থানে পৌঁছালে প্রথম ট্রাকটি এন্টি-ট্যাংক মাইনে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যায়। পরের ট্রাকটি পিছু হটে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনারা উপায়ন্তর না দেখে ট্রাক থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। পলায়নপর শত্রুদের কিছুসংখ্যক গুলিতে মারা যায়, আর কিছু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ এ্যামবুশ-এ পাকসেনাদের দুটি

ট্রাক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১২ জন নিহত হয়। আমাদের পার্টি অনেক অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে এবং বজরার এ্যামবুশ পার্টিও শত্রুদের একটি টহলদার দলকে আক্রমণ করে ২ জনকে নিহত এবং ২ জনকে আহত করে। আর একটি পার্টি ২৩শে জুন পাকসেনাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়ার জন্য নোয়াখালীর শাহেবজাদা ব্রীজ, চন্দ্রগঞ্জ এবং রামগঞ্জ জেলা কাউন্সিল ব্রীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

পাকসেনারা লাটুমুড়াতে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে কিন্তু ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি লে. হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে তাদেরকে সবসময় ব্যতিব্যস্ত রাখে।

পাকসেনারা তাদের শালদানদী অবস্থান থেকে সবসময় মন্দভাগ দখল করে নেয়ার চেষ্টা চালাতো। আমাদের ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন এবং জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা পর্যন্ত নিজেদের দখলে রেখে শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়েছিল। এ অবস্থানটির জন্য পাকবাহিনীর চট্টগ্রাম-ঢাকা রেলওয়ে লাইন চালু করতে পারছিল না। সেজন্য সবসময় তাদের চেষ্টা ছিল মন্দভাগ থেকে আমাদের বিতাড়িত করা। এছাড়া এ অবস্থানটির জন্য তার শালদানদী ছিটমহল যেখানে আমাদের মূল ঘাঁটি ছিল, তা তাদের দখলে আনতে পারছিল না। অনেকবার চেষ্টা করেও তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২৪শে জুন বিকেল ৩ টায় তাদের শালদানদী অবস্থান থেকে পাকসেনাদের একটা কোম্পানি, কসবায় টি. আলীর বাড়ি থেকে আর একটা কোম্পানি—এই দুই কোম্পানি দু'দিক থেকে এসে কাসেমপুরের নিকট মিলিত হয়। তারপর মর্টার, মেশিনগান এবং কামানের সাহায্যে আমাদের মন্দভাগ অবস্থানে আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড গোলার সহায়তায় পাকসেনাদের এই শক্তিশালী দলটি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে ৩০০ গজ পশ্চিমে জেলা বোর্ডে সড়কের নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। আমাদের সৈনিকরাও তাদের বাংকার থেকে মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের গুলিতে পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। দু'ঘণ্টা চেষ্টার পর পাকসেনারা যখন অগ্রসর হতে পারছিল না তখন তাদের আক্রমণ বন্ধ করে দেয় এবং পিছু হটে চলে যায়। এ আক্রমণের সময় পাকসেনাদের ২৪ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা তাদের কায়েমপুরের অবস্থানও তুলে নিয়ে শালদানদীর মূল ঘাঁটিতে চলে যায়।

ঢাকায় আমাদের গেরিলারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে স্বাভাবিকভাবে না চলে সেজন্য তারা ২৯শে জুন বিকেল পাঁচটায় সিদ্ধিরগঞ্জ এবং খিলগাঁও পাওয়ার লাইনের একটি পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এই বিধ্বস্ত পাইলনটি অন্য দুটি পাইলনের তার নিয়ে ছিঁড়ে পড়ে যায়। এরফলে কমলাপুর ও তেজগাঁওয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনেকাংশে কমে যায়। বিস্ফোরণের ঠিক পর পরই পাকসেনাদের একটি হেলিকপ্টার তৎক্ষণাৎ উক্ত এলাকায় গেরিলাদের অনেক খোঁজাখুজি করে। আমাদের গেরিলারা নিরাপদে ফিরে আসে। আর একটি গেরিলা দল সিদ্ধিরগঞ্জের মাটির তলার পাওয়ার লাইন মাতুয়াইলে উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা নিকটবর্তী ঘাঁটি হতে জীপে করে এসে দলটিকে ধরার চেষ্টা করে এবং এদের উপর গোলাগুলি করে, কিন্তু গেরিলা দলটি নিরাপদে ফিরে আসে।

স্থানীয় লোকমুখে আমরা সংবাদ পাই যে, পাকসেনাদের একটি জীপ ও টহলদার দল প্রায়ই সাইদাবাদ থেকে কর্নেলবাজার পর্যন্ত আসে। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন খোলাপাড়ায় এবং তুলাইশমলে একটি করে প্লাটুনের সাহায্যে এ্যামবুশ লাগায়। ২৭শে জুন সন্ধ্যার সময় পাকসেনাদের টহলদার দল খোলাপাড়ায় আমাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। এতে পাকসেনাদের ৮ জন লোক নিহত হয় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এর পরদিন ২৮ জুন সন্ধ্যা ৭ টায় পাকসেনাদের একটি জীপ তুলাইশমলে আমাদের এ্যামবুশে পড়ে। এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে জীপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে হয়ে রাস্তা থেকে পড়ে যায়। জীপে ৫জন পাকসেনা ছিল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। আমাদের পার্টি অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নে।

পাকসেনারা কুমিল্লা শহরের পূর্বে বিবিরবাজার এলাকায় যে ঘাঁটি গড়েছিল, আমরা প্রায়ই আক্রমণ করে তাদের ব্যতিব্যস্ত রাখতাম। লে. মাহবুব খবর পায় যে, পাকসেনারা সন্ধ্যার পর আর তাদের বাংকার থেকে বাইরে আসে না। রাতে যেসব পাহারাদার থাকে তারাও বাংকারের মধ্যে বসে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে লে. মাহবুব দুটি প্লাটুনকে ২৪ জুন রাতে শত্রুদের বিবিরবাজার ঘাঁটির কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়ে কুমিল্লার দক্ষিণ থেকে পাঠিয়ে দেয়। এ দলটি অরণ্যপুর হয়ে শত্রুদের বিবিরবাজার অবস্থানের পিছনে পৌঁছে এবং রাত ৩টায় অবস্থানের ভেতর অনুপ্রবেশ করে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রথমেই তারা তাদের সামনের একটি বাংকারে গ্রেনেড ছোঁড়ে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এরপর আরও কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করে তারা সকাল হবার আগেই শত্রু-অবস্থান ত্যাগ করে। এই অতর্কিত আক্রমণে পাকসেনাদের ২১ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়।

পাকসেনারা বিজয়পুরের যে রাস্তার সেতুটি আমাদের কমান্ডো পার্টি উড়িয়ে দিয়েছিল, সেটি সাময়িকভাবে মেরামত করে ফেলে এসং সে রাস্তায় আবার তাদের চলাফেরা শুরু করে। লে. মাহবুব আবার একটি কমান্ডো প্লাটুন পাঠায় এবং এই প্লাটুনটি ২১ জুন বিজয়পুর ব্রীজের নিকট এ্যামবুশ পেতে পাকসেনাদের অপেক্ষায় থাকে। রাত ২ টার সময় পাকসেনাদের দুটি গাড়ি কুমিল্লা থেকে ঐ রাস্তায় আসে। গাড়িগুলো যখন ব্রীজের উপর দিয়ে চলা শুরু করে ঠিক তখনই আমাদের পার্টি তাদের উপর গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িগুলো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজ থেকে নদীতে পড়ে যায়। এতে দুটি গাড়িই বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ৮ জন পাকসেনা নিহত হয়।

জুন মাসে প্রথম সপ্তাহে আমার হেডকোয়ার্টার থেকে গেরিলাদের ৬০ জনের একটি দলকে আমি ফরিদপুরে পাঠাই। মাদারীপুর, পালং, রাজৈর, নড়িয়া প্রভৃতি থানায় গেরিলাদের বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছিল। এই দলগুলো তাদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে ঘাঁটি গড়ে তোলে। এরপর তারা কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি দালালকে হত্যা করে। এরপর তারা নিজ নিজ এলাকার থানাগুলো যেখান থেকে দালাল পুলিশরা পাকিস্তানিদের খবরাখবর যোগাতো, সেই থানাগুলো ভালভাবে রেকি করে। প্রথমে তারা শিবচর অয়ারলেস স্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। এরপর গেরিলা কমান্ডার খলিলের নেতৃত্বে পালং থানার উপর ২৭ জুন রাত ১১ টার সময় আক্রমণ চালান হয়। এ আক্রমণে একজন দালাল সাবইন্সপেক্টর ও দু'জন পুলিশ নিহত হয়। গেরিলারা ৯টা

রাইফেল দখল করে নেয়। তারা থানার অয়ারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। নড়িয়ার গেরিলাদল খবর পায় যে, মাদারীপুরের ডিআইবি ইন্সপেক্টর ও দালাল সি,আই, পুলিশ একটি স্থানীয় দালালের বাড়িতে গুপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত। এ সংবাদ পেয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারপরে নড়িয়ার অয়ারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়।

শত্রুদের একটা ছোট দল রাজৌর থানার টাহেরহাটে এসে অবস্থান নেয়। রাজৈরের গেরিলা দলটি তাদের অবস্থানটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খবর নেয়। ২৮শে জুন রাত ১১ টার সময় ২০ জনের একটি গেরিলাদল টাহেরহাটে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ১০ জন নিহত হয় এবং পাকসেনারা টাহেরহাট অবস্থান থেকে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ২০ জুন সন্ধ্যায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। এ সংবাদ জানতে পেরে আমি ইয়াহিয়া খানের ভাষণকে উপস্থিত সম্বর্ধনা জানানোর জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এ সম্বন্ধে আমি আমার সাব-সেক্টর কমান্ডারদের আমার হেডকোয়ার্টার-এ ডেকে পাঠাই এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে ভাষণের সময় পাকিস্তানিরা সর্বক্ষেত্রেই রেডিও শোনার জন্য তাদের নিজ নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থানে একত্রিত হবে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হবে। এ সময় তাদের এ সতর্কতা আমাদের জন্য আনবে এক সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়া আমাদের এ্যাকশনও হবে ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সমুচিত জবাব। এ জন্য আমি সব সাব-সেক্টর কমান্ডারকে নির্দেশ দিলাম, তারা সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার পর থেকে, যখন ইয়াহিয়ার ভাষণ আরম্ভ হবে, ঠিক সে সময়ে আমার সেক্টরের সব এলাকায় একযোগে পাকসেনাদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালাবে। এ নির্দেশ অনুযায়ী ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি নয়নপুরের পাকসেনাদের অবস্থানের দিকে তিন দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং ভাষণ আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এ অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত হয়ে যায়। এর সাথে সাথে আমাদের মর্টারের গোলা তাদের উপর পড়তে থাকে। পাকসেনারা তাদের অবস্থানের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি এবং চিৎকার করে বাংকারের দিকে যাবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেশিনগানের গুলিতে তাদের অনেকেই মারা যায়। আধ ঘণ্টা এভাবে গুলি চালানোর পর আমাদের সৈন্যরা শত্রু অবস্থান পরিত্যাগ করে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এ যুদ্ধে ১৮ জন নিহত এবং বহু আহত হয়।

ঐ দিনই আমাদের একটি কোম্পানি মর্টারসহ ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে ঠিক ঐ সময় লাটুমুড়াতে শত্রু অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে শত্রুদের মধ্যে বেশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তখন তারা ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনছিল। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ৫ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। আমাদের কোম্পানি শত্রুদের উপর আড়াই ঘণ্টা আক্রমণ চালিয়ে নিরাপদে পিছু হটে যায়।

ঢাকাতে ঐ সময়টিকে উদযাপন করার জন্য আমি ৫০ জন গেরিলার একটি দলকে পাঠিয়ে দিই। এই দলটি ২৭শে জুন ঢাকায় পৌঁছে। তারপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঢাকা শহরের প্রধান স্থানগুলোতে যেমন জিন্নাহ এভিনিউ, মতিঝিল, শাহবাগ, পুরানা পল্টন, সদরঘাট, চকবাজার প্রভৃতি স্থানে একযোগে সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সময় গ্রেনেড বিস্ফোরণ এবং মোটরগাড়িতে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে পাকসেনারা চতুর্দিকে ছোটাছুটি করে এবং সমস্ত ঢাকায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এ বিস্ফোরণগুলোর ফলে ঢাকায় আমাদের বাঙালিরা তাদের মনোবল আরো ফিরে পায় এবং তারা ইয়াহিয়া ভাষণের সমুচিত জবাবে আনন্দিত হয়।

মতিনগর থেকে ২টি মর্টার দিয়ে একটি ছোট দলকে গোমতীর উত্তর পাড় দিয়ে কুমিল্লা শহরের দিকে পাঠানো হয়। এ দলটি কুমিল্লা শহরের নিকট গিয়ে ভাষণের ঠিক সময়ে কুমিল্লা সার্কিট হাউসের উপর মর্টার দ্বারা গোলাবর্ষণ করে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে পাকসেনাদের 'মার্শাল ল'র প্রধান অফিস ছিল। মর্টারের গোলা এসে অফিসে পড়ার পর, সেখানেও পাকসেনারা ছোটাছুটি করতে থাকে। কুমিল্লা শহরেও কয়েক মিনিটের মধ্যে নীরবতা নেমে আসে।

কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানিদের একটি জীপ ও একটি ৩ টন গাড়ি দক্ষিণে যাচ্ছিল। লে. মাহবুবের একটি এ্যামবুশ পার্টি এই দলটিকে সন্ধ্যার সময় ফুলতলীর নিকটে আক্রমণ করে। এতে জীপটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এ এ্যামবুশে পাকিস্তানিদের ২৪ জন সৈন্য ৩ জন অফিসার নিহত হয় এবং ১ জন অফিসারসহ ৪ জন আহত হয়। অফিসারটি লে. কর্নেল ছিল।

লে. মাহবুবের আর একটি প্লাটুন ঠিক ঐ সময়ে বিবিরবাজার শত্রু অবস্থানের ভেতর অতর্কিতে অনুপ্রবেশ করে ১টি মেশিনগানসহ কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করে দেয়। পাকসেনাদের ১১ জন এতে নিহত হয়।

এছাড়া মিয়াবাজার, ফেনী, বিলোনিয়া, লাকসাম, শালদানদী, চাঁদপুর ইত্যাদি স্থানেও মর্টারও গ্রেনেডের সাহায্যে পাক অবস্থানের উপর একযোগে একইরূপ আক্রমণ চালান হয়।

ইয়াহিয়া খান মনে করেছিল যে, তার ভাষণ দিয়ে তিনি বাঙালিদের শান্ত করবেন এবং আবার তার মিথ্যা আশ্বাসে বাঙালিরা তাদের অত্যাচারকে ভুলে যাবে, কিন্তু আমাদের সমস্ত এলাকা জুড়ে সবগুলো এ্যাকশনে তিনি নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছিরেন যে, বাঙালিরা তার জবাব কী দিয়েছে।

সশস্ত্র প্রতিরোধ : কুমিল্লা-নোয়াখালী-ঢাকা

দ্বিতীয় খণ্ড

সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আমি আমার যুদ্ধের এলাকাকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করে নেই। আমার সাব-সেক্টরগুলো নিম্নলিখিত জায়গায় তাদের অবস্থান গড়ে তোলে।

ক. গঙ্গাসাগর, আখাউড়া এবং কসবা সাব-সেক্টর : উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন। তার সঙ্গে ছিল লে. ফারুক, ক্যাপ্টেন মাহবুব এবং ক্যাডেট হুমায়ুন কবির। এখানে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি এবং ইপিআর-এর দুটি কোম্পানি ছিল। এদের সঙ্গে মর্টারের একটা দল ছিল। এই সাব-সেক্টর কসবা, আখাউড়া, সাইদাবাদ, মুরাদনগর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাতো।

খ. দ্বিতীয় সাব-সেক্টর ছিল মন্দভাগে : উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন গাফফার। তার অধীনে 'সি' কোম্পানি এবং একটা মর্টারের দল। এ দলটি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন হতে কুটি পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাতো।

গ. তৃতীয় সাব-সেক্টর ছিল শালদী নদী : উপ-অধিনায়ক ছিলেন মেজর আব্দুস সালেক চৌধুরী। এর অধীনে 'এ' কোম্পানি এবং ইপিআর-এর একটা কোম্পানি ছিল। এ দলটি শালদানদী, নয়নপুর এবং বুড়িচং এলাকা পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাতো।

ঘ. চতুর্থ সাব-সেক্টর ছিল মতিনগরে : উপ-অধিনায়ক ছিল লে. দিদারুল আলম। হেডকোয়ার্টার কোম্পানির কিছুসংখ্যক সৈন্য এবং ইপিআর-এর একটা কোম্পানি গোমতীর উত্তর বাঁধ থেকে কোম্পানিগঞ্জ পর্যন্ত এই সাব-সেক্টর অপারেশন চালাতো।

ঙ. গোমতীর দক্ষিণে ছিল নির্ভয়পুর সাব-সেক্টর : উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আকবর এবং লে. মাহবুব। এ দলটির অপারেশন কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর এবং লাকসাম পর্যন্ত ছিল।

চ. রাজনগর সাব-সেক্টর ছিল সর্বদক্ষিণে : উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন শহীদ এবং লে. ইমামুজ্জামান। এ সাব-সেক্টর বিলোনিয়া, লাকসামের দক্ষিণ এলাকা এবং নোয়াখালীতে অপারেশন

চালাতো। এই সাব-সেক্টরে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানি, ইপিআর-এর একটি কোম্পানি ও গণবাহিনীর লোক নিয়ে তৈরি এক সদ্যগঠিত কোম্পানি।

জুলাই মাসে পাকিস্তানি সেনারা কসবা এবং মন্দভাগের পুনঃদখলের প্রস্তুতি নেয় এবং কুটিতে ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্টের বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনী সমাবেশ করে। ক্যাপ্টেন গাফফারের অধীনে মন্দভাগ সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের মোকাবেলার জন্য তৈরি ছিল। জুলাই মাসের ১৯ তারিখে শত্রুসেনারা একটা কোম্পানি নিয়ে শালদানদীতে নৌকাযোগে অগ্রসর হয়। সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে মন্দভাগ সাব-সেক্টরের একটা প্লাটুন মন্দভাগ বাজারের নিকট শত্রুদের এই অগ্রবর্তী দলটির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এ সংঘর্ষে শত্রুসেনারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। শালদানদীর তীর থেকে সুবেদার ওহাবের প্লাটুনটি শত্রুসেনার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে অন্ততঃপক্ষে ৬০/৭০ জন লোক হতাহত হয় এবং অনেকেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারায়। এই আক্রমণে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল মাজহারুল কাইয়ুম, ৫৩ গোলন্দাজ বাহিনীর কুখ্যাত অফিসার ক্যাপ্টেন বোখারী, আরো ৩/৪ জন অফিসার এবং ৮/১০ জন জুনিয়র অফিসার প্রাণ হারায়। ক্যাপ্টেন বোখারী ২৫ মার্চের পর থেকে কুমিল্লা শহরে অনেক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিল। তার মৃত্যুতে কুমিল্লাবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। শত্রুসেনারা শালদানদীতে এই বিরাট পর্যুদস্তের পর তাদের বাহিনীকে পিছু হটিয়ে কুটিতে নিয়ে যায়। এবং আমি আমার ঘাঁটি মন্দভাগ ও শালদানদীতে আরো শক্ত করে তুলি।

পাকিস্তানের ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে লাইন সম্পর্কে জেনারেল টিক্কা খান দম্ভ করে ঘোষণা করেছিল যে ওটা জুলাই মাসের মধ্যে খুলবে। তার সেই আশা চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলে এই রেললাইনে ট্রেন চলেনি। ইতোমধ্যে জুলাই মাসে আমি খবর পাই যে, পাকবাহিনী বিলোনিয়াতে ঢোকার চেষ্টা করছে। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে নির্দেশ দেই যেন তাদেরকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এ সময় ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ছাগলনাইয়াতে পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পাকবাহিনী ছাগলনাইয়ার উপরে ফেনীর দিক থেকে চট্টগ্রাম সড়কের উপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে তাদের ২০/২৫ জন লোক হতাহত হয়। শত্রুসেনারা পিছু হটে যায়। কিন্তু তার কয়েকদিন পরে পাকসেনারা ছাগলনাইয়ার দক্ষিণ থেকে ফেনী-চট্টগ্রাম পুরনো রাস্তায় অগ্রসর হয়। এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সৈনিকদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আমাদের কিছুসংখ্যক হতাহত হওয়ায় এবং শত্রুদের গোলার মুখে টিকতে না পেরে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমার কাছে পরবর্তী কর্মপন্থার নির্দেশ চেয়ে পাঠান। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বলি ছাগলনাইয়া থেকে তার সৈন্যদের সরিয়ে বিলোনিয়ার সাব-সেক্টর রাজনগরে আনার জন্য। আমাদের এই যাতায়াতে বিলোনিয়াতে অবস্থিত শত্রুসেনারা ঘিরে যাওয়ার আতঙ্কে বিলোনিয়া থেকে ফেনীতে পশ্চাদপসরণ করে এবং ফেনীতে তাদের প্রধান ঘাঁটি গড়ে তোলে। বিলোনিয়া শত্রুমুক্ত হওয়ায় আমি বিলোনিয়াকে শত্রুকবল থেকে মুক্ত রাখার দৃঢ় সংকল্প করি। ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বান্দুয়াতে (ফেনী থেকে ২ মাইল উত্তরে) এবং লে. ইমামুজ্জামানকে

তাদের নিজ নিজ কোম্পানি নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করার নির্দেশ দেই। বান্দুয়াতে সম্মুখবর্তী অবস্থান গড়ার পথ মুন্সিরহাটে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের অধীনে আমার সেনাদল বেশ মজবুত প্রতিরক্ষা বূহ্য গড়ে তোলে। বিলোনিয়া একটি ১৭ মাইল লম্বা এবং ১৬ মাইল চওড়া বাক্স। এই বিলোনিয়াতে আমরা যে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তুলি সে প্রতিরক্ষা ব্যূহকে ধ্বংস করার জন্য পাকসেনারা এর পর থেকে যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে অনেক যুদ্ধে তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং সৈন্য হতাহত হয়। বিলোনিয়া সাব-সেক্টর পাকসেনাদের জন্য ভয়ংকর বিভীষিকা রূপ ধারণ করে। এর সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের জনসাধারণও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি এবং কষ্ট স্বীকার করে। এখানকার জনসাধারণের কষ্টকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পাকবাহিনীর গোলার আঘাতে প্রতিটি বাড়ি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও অনেক নিরীহ লোক মারা যায়। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ কোনোদিনও তাদের মনোবল হারায়নি। যুদ্ধ যতদিন চলে ততদিনই তারা মুক্তিবাহিনীর অসামরিক ব্যবস্থাপনায় হাসিমুখে সাহায্য করে। অনেকক্ষেত্রে তারা সেনাবাহিনীর সাথে সাথে রক্ষাব্যূহকে শক্তিশালী করার জন্য পরিখা খননে ও অন্যান্য কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করে। মে মাসে আমাদের মুন্সিরহাট ডিফেন্স এবং বান্দুয়ার অবস্থানটি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ জায়গাটি আমরা এজন্যে প্রতিরক্ষা ঘাঁটির জন্য মনোনীত করেছিলাম। জায়গাটার সামনে কতগুলো প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন ছিল যেগুলো শত্রুসেনার অগ্রসরের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। এতে শত্রুসেনাদের নাজেহাল করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আমাদের অবস্থানটি মুহুরী নদীর পাশ ঘেঁষে পশ্চিমদিক থেকে ছিলোনিয়া নদীকে ছাড়িয়ে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যূহটি কমপক্ষে ৪ মাইল চওড়া ছিল। আমরা এই অবস্থানটি এইভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম যে, শত্রুসেনাদের বাধ্য হয়ে আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করার সময় প্রতিরক্ষার শুধু সামনে ছাড়া আর কোনো উপায়ে আসার রাস্তা ছিল না। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুসেনাদের আসার মনোনীত জায়গাগুলোতে এলে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করা যায়। পরবর্তীকালে আমাদের এই পরিকল্পনা ঠিকই কাজে লেগেছিল। যেসব জায়গা দিয়েই শত্রুরা আসার চেষ্টা করেছে যথেষ্ট হতাহত হয়েছে। এই সাব-সেক্টরে প্রথমে আমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল দু'কোম্পানি (৩০০ জনের মত) এবং কিছু সংখ্যক গণবাহিনী। শত্রুসংখ্যা আমাদের চেয়ে সব সময় বেশি ছিল এবং এছাড়া শত্রুদের ছিল শক্তিশালী অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিমান বাহিনী ও ট্যাংক। আমাদের মুন্সিরহাটে প্রধান ঘাঁটি সম্বন্ধে শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য বন্দুয়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ছিলোনিয়া নদীর উপর একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপনের নির্দেশ দেই। এটা ছিল একটি ডিলেয়িং পজিশন। এ পজিশনের সামনে রাস্তা ও রেলের সেতুগুলো ধ্বংস করে দেয়া হয় যাতে শত্রুদের অগ্রসরে আরো বাধার সৃষ্টি হয়। শত্রুসেনারা সম্ভবত অগ্রসরের রাস্তার পশ্চিম এবং পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার দিকে মুখ করে আমরা বেশ কতগুলো উঁচু জায়গায় এবং পুকুরের উঁচু বাঁধে শক্ত এবং মজবুত বাংকার তৈরি করি এবং তাতে হালকা মেশিনগান এবং ভারি মেশিগান লাগিয়ে দেই। এ ছিল একরকমের ফাঁদ যাতে একবার অবস্থানের ভিতরে অগ্রসর হলে দু'পাশের গুলিতে শত্রুসেনারা ফিরে যেতে না পারে। এসব বাংকার এমনভাবে লুকানো ছিল যে সম্মুখ থেকে বোঝার কোনো উপায় ছিল না।

৭ জুনের সকাল। আমরা জানতে পারলাম শত্রুসেনারা ফেনী থেকে বিলোনিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ১০ টার দিকে বান্দুয়ার আশেপাশে শত্রুসেনারা এসে জমা হতে লাগলো এবং প্রথমবারের মতো আমাদের পজিশনের উপর গোলাগুলি চালাতে লাগলো। আমার নির্দেশ ছিল যে শত্রুদের এই গোলাগুলির কোন জবাব যেন না দেয়া হয়। শত্রুসেনারা বন্দুয়া সেতুর উপর একটা বাঁশের পুল নির্মাণ করে যেমনি পার হওয়ার চেষ্টা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের অগ্রবর্তী ডিলেয়িং পজিশনের বীর সৈনিকরা তাদের উপর গুলি চালায়। এতে প্রথম সারিতে যেসব শত্রুসেনা সেতু অতিক্রম করার চেষ্টা করে তারা সবাই গুলি খেয়ে পানিতে পড়ে যায়। এ পর্যায়ে শত্রুসেনাদের অন্তত ৪০/৫০ জন লোক হতাহত হয়। এরপর শত্রুসেনারা পিছু হটে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার প্রবল গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় তীব্র আক্রমণ চালায়। আমাদের ডিলেয়িং পজিশনের সৈনিকরা শত্রুদের আরো বহুসংখ্যক লোক হতাহত করে বীরত্বের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে কিন্তু আক্রমণ যখন আরও তীব্ররূপ ধারণ করে ডিলেয়িং পজিশনকে তারা পরিত্যাগ করে প্রধান ঘাঁটি মুন্সিরহাটে পিছু হটে আসে। শত্রুরা কিছুটা সফলতা লাভ করায় আরো প্রবল বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং ছিলোনিয়া নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানে এসে তারা নদী পার হওয়ার সকল প্রস্তুতি নেয়। আমাদের প্রধান ঘাঁটি থেকে ৮০০ গজ সামনে আনন্দপুর নামক গ্রামে শত্রুসেনারা তাদের সমাবেশ ঘটাতে থাকে। নদী পার হয়ে আমাদের আক্রমণ করার জন্য শত্রুরা সকল প্রস্তুতি নিতে থাকে। নদী পার হবার পূর্ব মুহূর্তে কামানের সাহায্যে আমাদের ঘাঁটির উপর তারা প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে। তারা বৃষ্টির মতো গোলা আমাদের অবস্থানের উপর ছুড়ছিল। এ আকস্মিক আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্য আমরা ভালভাবেই বুঝতে পারছিলাম। এই সুযোগে পাকসেনারা নদী পার হবার জন্য নৌকা এবং বাঁশের পুলের সাহায্যে এগিয়ে আসতে থাকে। যদিও আমরা শত্রুদের কামানের গোলায় যথেষ্ট বিপর্যস্ত ছিলাম তবুও মানসিক দিক দিয়ে আমাদের সেন্যদের মনোবল ছিল বিপুল। ওদের বেশ সংখ্যক সৈন্য নদী পার হয়ে আমাদের অবস্থানের ২০০/৩০০ গজ ভিতরে চলে আসে এবং কিছু সংখ্যক তখনও নদী পার হচ্ছিলো। ঠিক সেই সময়ে আমাদের মর্টার এবং মেশিনগান গর্জে ওঠে। আমাদের এ আকস্মাৎ পাল্টা উত্তরে শত্রুসেনারা অনেক হতাহত হতে থাকে। তবুও তারা বাধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে প্রবল বেগে অগ্রসর হতে থাকে। আর আমাদের সৈনিকরাও তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। তবুও তারা নিঃসহায় অবস্থাতে ও দক্ষতার সাথে অগ্রসর হতে থাকে কিন্তু আল্লাহ হয়ত ওদের সহায় ছিলেন না। এ সময়ে তারা আমাদের সামনের মাইন ফিল্ডের মুখে এসে পড়ল। তাদের পায়ের চাপে একটার পর একটা মাইন ফাটতে আরম্ভ করল। আমাদের চোখের সামনে অনেক শত্রুসেনা তুলোর মতো উড়ে যেতে থাকে। আমাদের গোপনে অবস্থিত পাশে মেশিনগানগুলোর বৃষ্টির মতো গুলি ও মাইনের আঘাত তাদের মধ্যে একটা ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। শুধু কয়েকজন শত্রু এসব বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমাদের কয়েকটি অগ্রবর্তী বাংকারের সামনে পর্যন্ত পৌঁছায়, কিন্তু আমাদের সৈনিকরা গ্রেনেড হাতে তাদের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তারা সেখানেই

আমাদের গ্রেনেডের মুখে ধ্বংস হয়। এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে শত্রুসেনারা আর সামনে এগোতে সাহস পায়নি। যারা পিছনে ছিল তারাও এই সংকটজনক অবস্থা এবং ভয়াবহতা বুঝতে পেরে পিছন দিকে পলায়ন করতে শুরু করে। শত্রুসেনাদের পালাতে দেখে আমাদের সৈনিকরাও উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে এবং আরো প্রবল গতিতে তাদের গুলি করে মারতে থাকে। আমাদের মর্টারও পশ্চাদপসরণরত শত্রুদের ওপর অনবরত আক্রমণ চালিয়ে তাদের হতাহত করতে থাকে। আমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে ওদের খুব কম সৈন্য ছিলোনিয়া নদীর অপর পারে পিছু হটে যেতে সক্ষম হয়। এ সময়ে আমাদের উপর শত্রুসেনারা অনবরত কামানের গোলা চালিয়ে যাচ্ছিল যাতে তাদের বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত যে সমস্ত অবশিষ্ট সৈনিক ছিল তারা নিরাপদে আরো পশ্চাৎঘাটি আনন্দপুর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এর কিছু পরে দু'টোর সময় তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে একটা নীরবতা নেমে আসে। আমরা কিছুক্ষণ আবার তাদের পুনঃআক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, কিন্তু পরে জানতে পাই যে তাদের অবস্থা সত্যি বিপর্যস্ত এবং তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গেছে। পুনঃআক্রমণের শক্তি আর তাদের নেই। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অন্ততঃপক্ষে ৩০০ জনের মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং ছিলোনিয়া নদীতে কত ভেসে গেছে সেটারও হিসাব আমরা পাই না। পরে জানতে পারি যে পাকিস্তানিরা একটি ব্যাটালিয়নের চেয়েও বেশি সৈন্যদল নিয়ে এ আক্রমণ চালিয়েছিল এবং এ ব্যাটালিয়নের ৬০ ভাগের মতো লোক নিহত বা আহত হয়েছে। এদের অনেকের কবর এখনও ফেনীতে আছে।

এরপর থেকে শত্রুসেনারা আনন্দপুরে স্থায়ী ঘাঁটি করার জন্য বাংকার খোঁড়ার কাজ শুরু করে দেয়। আস্তে আস্তে ওদের সৈন্য সংখ্যাও অনেক বেড়ে যেতে লাগলো। আমরা খবর পেলাম ওরা প্রচুর অস্ত্র এবং নতুন সৈন্য চট্টগ্রাম এবং ঢাকা থেকে এনে সমাবেশ করছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর কামান ও ট্যাংক তারা নিয়ে এসেছে। ৭ জুনের বিলোনিয়া যুদ্ধের পর তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং হতাহতের সংখ্যা দেখে পাকিস্তানিরা বুঝতে পেরেছিল যে আমি এই জায়গাতে তাদের সঙ্গে আবার সম্মুখ সমরে যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সেজন্য আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে আমি ফাঁদে ফেলার জন্য তৈরি ছিলাম। পাকসেনারা আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয়ে সে ফাঁদে পা দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সে কারণে ভবিষ্যতে তারা যাই করুক খুব সতর্কতার সাথে কাজ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। বিলোনিয়ার বিপর্যয় পাকিস্তানি সেনাদের সবাইকে বিচলিত করে তোলে। তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়, যেকোনো উপায়ে বিলোনিয়া পুনর্দখল করতেই হবে। তাই তাদের সৈন্য সমাবেশ চলতে থাকে। জেনারেল আবদুল হামিদ খান, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ স্বয়ং জুলাই মাসে ফেনীতে আসেন বিলোনিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং পরিচালনার জন্য। আমি আমার প্রতিরক্ষার অবস্থান আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করি। মন্দভাগ থেকে ক্যাপ্টেন গাফফারকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'সি' কোম্পানি নিয়ে এবং আর কিছু মর্টার নিয়ে বিলোনিয়া সেক্টরে গিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ আরো শক্তিশালী করে তোলার নির্দেশ দেই। যেহেতু আমার কাছে আর কোনো সৈন্য ছিল না, তাই আমি এ তিনটি কোম্পানি দিয়ে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে

শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ দেই। শত্রুরা আমাদের প্রতিরক্ষা থেকে মাত্র ৮০০ গজ দূরে গতিয়া নালার অপর পাড়ে তাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। উভয়পক্ষে অনবরত গোলাগুলি বিনিময় হতো, আর তাছাড়া শত্রুদের গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের ঘাঁটির উপর অবিরাম শেলিং চালিয়ে যেত। আমাদের সৈনিকদের বাংকার ছেড়ে বাইরে চলাফেরার উপায় ছিল না। কিন্তু শত্রুর এই গোলাগুলির এবং আর্টিলারী ফায়ারিং-এর মধ্যেও আমাদের বীর বঙ্গশার্দুলরা তাদের মনোবল হারায়নি এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা এ গোলাগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রেও বাজনার মতো মনে করত। মাঝে মাঝে আমাদের সৈনিকরা পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের অনেক হতাহতও করতো এবং অনেক সময় ১০৬ মি.মি. আরআর-এর সাহায্যে তাদের বাংকার উড়িয়ে দিয়ে আসতো। এসব আকস্মিক আক্রমণাত্মক কার্যে শত্রুরা যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তো এবং তাদের যথেষ্ট হতাহত হতো। তার পরই তারা শুরু করত গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে অবিরাম বৃষ্টির মতো গোলাগুলি। এভাবে জুলাই মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত চললো। পাকিস্তানিদের যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে ঐ এলাকার জনমনে যথেষ্ট ত্রাসের সৃষ্টি হয়। প্রথমবারের আক্রমণে যদিও জনসাধারণের বেশি ক্ষতি হয়নি, সেহেতু সেবার শত্রুসেনারা ছিল আমাদের হাতে পর্যুদস্ত। যুদ্ধের বিভীষিকা তারা সেবার প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিল, কিন্তু এবারের পাকবাহিনীর প্রস্তুতির খবরে সত্যি তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এ সময় ছিল ভরা বর্ষা। সব জায়গাতে ছিল পানি। পানি ভেঙে ছেলেমেয়ে নিয়ে শত্রুদের অকস্মাৎ আক্রমণের মুখে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়া অসম্ভব হতে পারে। এজন্য আমরা স্থানীয় লোকদের নির্দেশ দেই যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগেই দূরে সরে যায় বা সরে যেতে পারে। কেউবা স্বেচ্ছায় আর কেউবা নিরুপায় হয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে স্ব-স্ব স্থানে রয়ে যায়। আমাদের সৈনিকরা প্রতিরক্ষা ব্যূহের উন্নতি চালিয়ে যেতে থাকে। যেসব জায়গা দিয়ে শত্রুদের আমাদের অবস্থানের ভিতরে অগ্রসর হওয়ায় সম্ভাবনা ছিল আমারা সেসব জায়গাতে মাইন লাগাতে থাকি। ১৭ জুলাই রাত ৮ টায় আমাদের উপর শত্রুরা অকস্মাৎ আক্রমণ শুরু করে দেয়। প্রায় আধঘণ্টা পর তিনটি হেলিকপ্টার আমাদের অবস্থানের পাশ দিয়ে পিছনের দিকে চলে যায়। চারিদিকে অন্ধকার ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। হেলিকপ্টারগুলো অবস্থানের পিছনে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈনিকরা বুঝতে পেরেছিল যে শত্রুসেনারা প্রতিরক্ষা ব্যূহের পিছনে ছত্রীবাহিনী নামিয়েছে। আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো থেকেও খবর আসতে লাগল যে শত্রুরা মুহুরি ও ছিলোনিয়া নদীর পাড় দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওদের সঙ্গে ট্যাংকও আছে। অবস্থানের সামনে বিপুল সৈন্য নিয়ে শত্রুর আক্রমণের প্রতিরক্ষা আর পিছনে তাদের ছত্রীবাহিনী আমাদের সৈনিকদের পিছন থেকে ঘিরে ফেলার জন্যও প্রস্তুত। এ রকম একটা সংকটময় অবস্থাতেও ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এবং ক্যাপ্টেন গাফফার এবং লে. ইমামুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন শহীদের নেতৃত্বে সামান্য শক্তি নিয়েও যুদ্ধের জন্য আমাদের সৈনিকদের মনোবল ছিল অটুট। আমার সব অফিসার ঐ চরম মুহূর্তে তাদের সাহস এবং দৃঢ়প্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছিল। রাত তখন সাড়ে ৯ টা। বৃষ্টি বেশ একটু জোরালো

হয়ে উঠেছে। শত্রুরা তাদের অগ্রসর অব্যাহত রেখেছে। এ সময়ে ক্যাপ্টেন গাফফারের অবস্থানের পিছন থেকে শত্রুরা হামলা চালায়। ক্যাপ্টেন গাফফার এবং তার সৈনিকরা বীরত্বের সাথে শত্রুসেনাদের হামলার মোকাবেলা করে। প্রায় ১ ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুসেনারা বেশ কিছু হতাহত সৈনিক ফেলে ক্যাপ্টেন গাফফারের অবস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। এ সময় ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কোম্পানির সামনেও শত্রুরা আক্রমণ চালায়। শত্রুদের ট্যাংকগুলোও আস্তে আস্তে যুদ্ধেক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে আসছিল। শত্রুদের কামানের গুলি সমস্ত অবস্থানের উপর এসে পড়ছিল। লে. ইমামুজ্জামান, যার কোম্পানি সবচেয়ে বামে ছিল, সেখানেও শত্রুরা আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমাকে এ পরিস্থিতির কথা জানায়। আমি বুঝতে পারলাম যে শত্রুসেনারা ডানে, বামে এবং হেলিকপ্টারের সাহায্যে আমার প্রতিরক্ষা ব্যূহের পিছনে পজিশন নিয়েছে এবং আস্তে আস্তে আমার সমস্ত ট্রুপসদের ঘিরে ফেলার মতলব এঁটেছে। শত্রুদের চাপ আস্তে আস্তে বেড়েই চলছিল। উভয়পক্ষেরই হতাহত ক্রমেই বেড়ে চললো। তাদের অনেকেই আমাদের মাইন ফিল্ডের ভিতর পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছিল, কিন্তু তবুও তারা অগ্রসর হচ্ছিল। ইতোমধ্যে আমার ৫ জন লোক নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়। এই অন্ধকারে সমস্ত অবস্থান জুড়ে চলছিল সম্মুখ সমরে হাতাহাতি যুদ্ধ। যদিও শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছিল, তবুও আমার পক্ষে ৩০/৪০ জন হতাহতের পরিমাণ খুবই মারাত্মক ছিল। তাছাড়া আমার সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক কম আর অস্ত্রশস্ত্রেও ছিলাম আমি তাদের চেয়ে অনেক দুর্বল। আমি বুঝতে পারলাম সকাল পর্যন্ত তারা যদি আমাকে এভাবে ঘিরে রাখতে পারে, তাহলে তাদের বিপুল শক্তিতে দিনের আলোতে এবং ট্যাংক ও কামানের গোলায় আমার সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবে।

রাতের অন্ধকারে তাদের ট্যাংক এবং কামানের গোলা আমাদের উপর কার্যকরী হয়নি। কিন্তু দিনের আলোতে এসব অস্ত্র আমার অবস্থানের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বর্তমান অবস্থান থেকে ডাইনে বা বামে সরে গিয়ে শত্রুদের এগিয়ে পিছনে এসে চিথলিয়াতে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করার নির্দেশ দেই। এ নির্দেশ অনুযায়ী রাত ১ টায় ক্যাপ্টেন জাফর, ক্যাপ্টেন শহীদ এবং ক্যাপ্টেন গাফফার তাদের স্ব-স্ব দল নিয়ে শত্রুদের এগিয়ে চিতুলিয়াতে নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থানে পৌঁছে। পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অবস্থানের জন্য তৈরি শুরু হয়ে যায়। তখন সকাল ৯ টা কী ১০ টা। আমি নিজেও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলাম লে. ইমামুজ্জামান এবং তার দলটির না পৌঁছানোর জন্য। যখন প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি চলছিল আমি তিন-চারজন সিপাই সঙ্গে নিয়ে আগে অগ্রসর হয়ে যাই শত্রুদের সম্বন্ধে জানবার জন্য। চিথলিয়া থেকে বেশ কিছু দূর আগে মুন্সিরহাটের নিকট যেয়ে দেখতে পাই যে শত্রুরা সকাল পর্যন্ত মুন্সিরহাট রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে এবং এর আগে আর অগ্রসর হওয়ার সাহস করেনি। তারা ভাবছিল যে আমাদের পিছনের পজিশনগুলো হয়ত এখনও আছে। আমরা যে রাত্রে এসব ঘাঁটি ত্যাগ করে চিথলিয়াতে নতুন ব্যূহ রচনা করেছি এ সম্বন্ধে তারা সকাল ১০ টা পর্যন্ত জানতে পারেনি এবং তারা খুব সতর্কতার

সাথে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি প্রায় ১ টা পর্যন্ত আমার রেকি বা অনুসন্ধান শেষ করে চিথলিয়াতে ফেরত আসি, ঠিক এই মুহূর্তে শত্রুদের আরো তিন-চারখানা হেলিকপ্টার আসে এবং আমাদের অবস্থানের ৭০০/৮০০ গজ ডাইনের রেলওয়ে লাইনের উঁচু বাঁধের পিছনে অবতরণ করে। এছাড়া আরো দুটি হেলিকপ্টার আসে যেগুলো আমাদের বামে আধা মাইল দূরে একটা পুকুরের বাঁধের পিছনে অবতরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেদিক থেকে ভয়ংকর গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। আমি বুঝতে পারলাম শত্রুরা আমার ট্রুপস্‌দের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে এবং আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান তখনও কিছুই তৈরি হয়নি। এ সময় ছিল আমার পক্ষে চরম মুহূর্ত। বাম থেকে গোলাগুলোর আওয়াজ আরো প্রচণ্ডতর হচ্ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেই এবং ক্যাপ্টেন জাফর ও ক্যাপ্টেন গাফফারকে নির্দেশ দেই এখনই এই মুহূর্তে তাদের নিজ নিজ কোম্পানি নিয়ে বর্তমান অবস্থান পরিত্যাগ করার জন্য। আমি এবং আমার সমস্ত সৈন্যকে অবস্থানটি পরিত্যাগ করার আধা ঘণ্টার মধ্যে শত্রুরা আক্রমণ চালায়।

এবারও শত্রুসেনারা আমাকে এবং আমার সেনাদলকে সামান্য মুহূর্তের জন্য ধরার সুবর্ণ সুযোগ আবার হারিয়ে ফেলে। হয়তোবা এ ছিল পরম করুণাময় আল্লাহর আশীর্বাদ। আমি পরে জানতে পারি আমার অবস্থানের বাম থেকে যে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম তা ছিল লে. ইমামুজ্জামানের সৈনিকদের সঙ্গে পাকসেনাদের সংঘর্ষ। পাকসেনারা যখন হেলিক্টারযোগে বামে অবতরণ করছিল সে সময় লে. ইমামুজ্জামানের সৈন্যদলের সামনে তারা পড়ে যায়। এতে শত্রুর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। লে. ইমামুজ্জামান শত্রুদের প্রচণ্ড আঘাত হেনে পরে বামদিক দিয়ে পিছনে হটে আসে এবং আমার সঙ্গে মিলিত হয়। যদিও আমাকে অবস্থান পরিত্যাগ করতে হয়েছিল এবং পাকবাহিনী আবার বিলোনিয়া পুনর্দখল করে নেয় তবুও শত্রুদের যা হতাহত হয় তা ছিল অপূরণীয়। আমাদের পশ্চাদপসরণ একটা রণকৌশল ছিল। সৈন্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ সবকিছুই ছিল নগণ্য। সে তুলনায় শত্রুদের শক্তি ছিল বিরাট। আমার তখনকার যুদ্ধের নীতি এবং কৌশলই ছিল শত্রুদেরকে অকস্মাৎ আঘাত হানা বা তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে আমার মনোনীত জায়গায় অগ্রসর হতে দেওয়া এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত এবং ধ্বংস করা—শত্রুদের এভাবে ব্যতিব্যস্ত রেখে আস্তে আস্তে নিজের শক্তি আরো গড়ে তোলা এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করা। অঙ্কুরেই ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সব সংঘর্ষেই আমি পাকবাহিনীকে আঘাত হানতাম অতর্কিতে। আমার যখন যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হতো তখন অকস্মাৎভাবেই সংঘর্ষ এড়িয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতাম। এতে শত্রুরা আরো মরিয়া হয়ে উঠত এবং পাগলের মতো আমার নতুন অবস্থানে এসে আঘাত হানতো। বারবারই এ রণকৌশলের পুনরাবৃত্তি হতো। যে সময় বিলোনিয়ায় সম্মুখসমর চলছিল, ঠিক সে সময় আমি শত্রুর পিছনের এলাকায় আঘাত হানার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমার হেডকোয়ার্টার অন্তঃপক্ষে চার হাজার গেরিলা সে সময় প্রশিক্ষণরত ছিল। এদেরকে আমি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিশেষ বিশেষ ধরনের গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে শিক্ষা দিচ্ছিলাম। একটি দলকে শিক্ষা দিচ্ছিলাম ডেমোলিসন (বিস্ফোরক) ব্যবহার যাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল দেশের

অভ্যন্তরে যত রাস্তা ও রেলওয়ে সেতু আছে সেগুলো ধ্বংস করে দেওয়া; যাতে শত্রুরা অনায়াসে যাতায়াত করতে না পারে এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে পাক সেনাদল তাদের রেশন ঠিকমতো পৌঁছাতে না পারে। এছাড়া এ দলটির আরো কাজ ছিল শিল্পক্ষেত্রে কিছু মনোনীত শিল্পকে সাময়িকভাবে অকেজো করে দেওয়া। বিশেষ করে ঐসব শিল্প যাদের তৈরি মাল পাকবাহিনী বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এসব শিল্প অকেজো করার সময় আমাকে অনেক সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করতে হয়েছে, যেহেতু সব শিল্পই আমাদের দেশের সম্পদ এবং এগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর আমাদের নিজেদেরই আবার সংকটের সম্মুখীন হতে হবে, সে কারণে প্রতিটি টার্গেট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিকল্পনাগুলোকে যথেষ্ট বিবেচনার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে হতো এবং তারপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম। শিল্পগুলোকে ধ্বংস না করে এগুলোকে সাময়িক অকেজো করার এক অভিনব পদ্ধতি আমি খুঁজে পাই। আমার সেক্টর-এর বেশিরভাগ শিল্প ঢাকার চারপাশে-ঘোড়াশাল এবং নরসিংদিতে অবস্থিত ছিল। আমি জানতে পেরেছি যে, এসব শিল্পের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সাধারণত শাহজিবাজার পাওয়ার হাউস ও কাপ্তাই থেকে পাওয়ার লাইনের মাধ্যমে আসে। আমি আমার গেরিলাদের প্রথম টার্গেট দেই ওই সব পাওয়ার লাইন উড়িয়ে দেয়ার জন্য। প্রতি সপ্তাহে ২০টি টিম বিভিন্ন এলাকায় পাওয়ার লাইনের পাইলন ধ্বংস করতে থাকে। এর ফলে প্রায় ৭৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প এলাকাগুলোতে বন্ধ হয়ে যায়। পাকবাহিনী নিরুপায় হয়ে প্রত্যেক পাইলনের নিচে এন্টি-পার্সোনাল মাইন পুঁতে রাখত যাতে আমার লোকজন পাইলনের কাছে না যেতে পারে। তারা সিদ্ধিরগঞ্জে পাওয়ার হাউস থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে শুরু করে। আমি যখন এ খবর জানতে পারি, তখন সিদ্ধিরগঞ্জের সরবরাহ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ যাতে না যেতে পারে তার পরিকল্পনা করতে থাকি। আমার হেডকোয়ার্টারস থেকে তিনটি দলকে ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আনার জন্য প্রেরণ করি। এক সপ্তাহের মধ্যে তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে যায় এবং আমাকে সমস্ত খবর পৌঁছায়। তারা আরো জানায়, পাকবাহিনী একটি শক্তিশালী দল ট্যাংকসহ সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে তাদের আস্তানা গেড়েছে। চতুর্দিকে বাংকার প্রস্তুর করে সে জায়গাটিকে পাহারা দিচ্ছে। সে কেন্দ্রটিকে অকেজো করতে হলে একটা বিরাট যুদ্ধের পর সেটিকে দখল করতে হবে। শত্রুঘাঁটি যেরূপ শক্তিশালী ছিল তাতে সফল হওয়া সম্ভব হতেও পারে, নাও হতে পারে। আর তাছাড়া আমিও প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রটি সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলাম না। আমি এসব ভেবে অন্য পন্থা অবলম্ব করার জন্য চিন্তা করতে থাকি। এ সময়ে ওয়াপদার একজন ইঞ্জিনিয়ার আমার ক্যাম্পে আসেন। তার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমার যে অনুসন্ধান দলটি খবরাখবর এনেছিল, তারা আসার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের একটা নীলনকশা ওয়াপদার প্রধান দপ্তর থেকে চুরি করে এনেছিল। আমি ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোমিনুল হক ভূঁইয়াকে এ নীলনকশা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের একটা সম্পূর্ণ হুবহু মডেল আমার হেডকোয়ার্টার-এ তৈরির নির্দেশ দিই। ইঞ্জিনিয়ার জনাব ভূঁইয়া আমার নির্দেশ অনুযায়ী

ঢাকা, টঙ্গি, ঘোড়াশাল, নারায়ণগঞ্জের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের একটা পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরি করেন। সে মডেলের উপর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে আলোচনাকালে আমি বুঝতে পারি যে, ঢাকাতে মোট ন'টি জায়গাতে (পোস্তগোলা, ডেমরা, হাটখোলা, জংসন, খিলগাঁও, মতিঝিল, ধানমণ্ডি, শাহবাগ, কমলাপুর, উলন) গ্রীড সাবস্টেশন আছে এবং এ সাবস্টেশনগুলো যদি আমরা ধ্বংস করে দিতে পারি তবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এও বুঝতে পারি যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে মোটামুটি তিনটা লাইনে আসে এবং যদি সবগুলো সাবস্টেশন একসঙ্গে উড়িয়ে না দেয়া যায়, তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অন্য পথ দিয়ে চলবে। ঢাকার এবং শিল্প এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ অকেজো করে দেয়ার জন্য আমি জুলাই মাস থেকে ১৬টি টিম ট্রেইন করতে থাকি। এসব টিমে ৮ থেকে ১০ জন গেরিলাকে এভাবে ট্রেনিং দেই যাতে তারা সাবস্টেশনগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি খুব কম সময়ের মধ্যে চিনে নিতে পারে এবং সেগুলো অনায়াসে ধ্বংস বা অকেজো করে দিতে পারে। ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয় যাতে তারা এ কাজে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করে। দু'মাস ট্রেনিং-এর পর এসব টিমগুলোকে আমার হেডকোয়ার্টারে মডেলের উপর একটা পূর্ণাঙ্গ রিহার্সালের বন্দোবস্ত করি যাতে প্রত্যেকটা টিমের প্রতিটি ব্যক্তি তার কার্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকে। নিজ নিজ কার্য যাতে তৎপরতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য এ ব্যবস্থা করা হয়। এ টিমগুলোকে আমি কসবার উত্তরে আমাদের যে গোপন প্রবেশপথ ছিল, সে পথে ঢাকাতে প্রেরণ করি। টিমগুলো নবীনগর এবং রূপগঞ্জ হয়ে নদীপথে ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে এরা প্রথম তাদের রেকি সম্পন্ন করে। অনুসন্ধানের পর জানতে পারে যে কতগুলো সাবস্টেশনে পাকিস্তানিরা ছোট ছোট আর্মি পাহারা দলের বন্দোবস্ত করেছে। আবার কোনো কোনোটিতে পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ কিংবা রাজাকার দ্বারা পাহারার বন্দোবস্ত করেছে। দলগুলো তাদের সমস্ত সরঞ্জাম এবং অস্ত্র ঢাকায় বিভিন্ন জায়গাতে লুকিয়ে রেখে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাকে খবর পাঠায় এবং নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। আমি বুঝতে পারলাম যদিও কোনো কোনো জায়গায় ছোট ছোট পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে তবুও এগুলো ধ্বংস করার সুযোগ এখনই। এরপর হয়ত পাহারা আরও সুদৃঢ় হওয়ার আশঙ্কা আছে। সেজন্য আর কালবিলম্ব না করে সবগুলো পাওয়ার সাবস্টেশন একযোগে অতিসত্বর ধ্বংস করার বা অকেজো করার নির্দেশ পাঠাই। আমার নির্দেশ পাওয়ার পর সব টিমই নিজ নিজে কমান্ডারদের নেতৃত্বে একযোগে জুন মাসের ২৭ তারিখের রাতে অকস্মাৎ তাদের আক্রমণ চালায়। তারা এসব আক্রমণে ধানমণ্ডি, শাহবাগ, পোস্তগোলা, উলন, মতিঝিল, ডেমরা প্রভৃতি সাবস্টেশনগুলো ধ্বংস বা সাময়িক অকেজো করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আক্রমণের সময় আমার লোকদের সঙ্গে অনেক জায়গায় পাকসেনাদের সংঘর্ষ হয় বিশেষ করে ধানমণ্ডি সাবস্টেশনে। এই দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল রুমি। সে একাই স্টেনগান হাতে পাকসেনাদের উপর হামলা চালায় এবং সকলকে গুলি করে মেরে ফেলে। তার অসীম সাহসিকতার ফলে দলের অন্যান্য লোকরাও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং পাকসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাবস্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। এরূপ সংঘর্ষ শাহবাগ ও

ডেমরাতে ঘটে। বাকি জায়গাগুলোয় আমার লোকেরা এমন অকস্মাৎ ভাবে সাবস্টেশনগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ে যে পাকসেনারা বা পাকিস্তানি পুলিশরা কিছু বোঝার আগেই তাদের হাতে বন্দি বা নিহত হয়। এ অপারেশন-এ অন্তত ৭৫ শতাংশ সফলতা লাভ করি। ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ২৪ ঘন্টার জন্য সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। যদি পাকিস্তানিরা বিমানযোগে সাবস্টেশনের যন্ত্রপাতি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসে এবং কিছুটা সরবরাহ পুনরুদ্ধার করে তবুও শিল্প এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ চিরতরে কমে যায়। এতে পাটকলগুলো চালাবার প্রচেষ্টা অনেকাংশে কমে যায়।

এ সময়ে আমি আরো জানতে পারি যে, প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান ঢাকায় আসছেন সরজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। জেনারেল টিক্কা খান সে সময় প্রস্তুতি নিচ্ছিল প্রিন্স সদরুদ্দিনকে বাংলাদেশে সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থা দেখাবার জন্য। আমি তার এ প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য আরো পাঁচটি দল তৈরি করি। তাদের কাজ ছিল ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো এবং অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় সে সম্বন্ধে প্রিন্স সদরুদ্দিনকে বুঝিয়ে দেওয়া। পরিকল্পনা অনুযায়ী দলগুলো প্রিন্স সদরুদ্দিনের অবস্থানকালে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটায়। সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ ঘটায় মতিঝিলে। আলম এবং সাদেক এ দু'জন গেরিলা একটা গাড়ির ভিতরে ৬০ পাউন্ড বিস্ফোরক রেখে মতিঝিলে হাবিব ব্যাংক বিল্ডিং-এর সামনে বিলম্বিত ফিউজের মাধ্যমে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটায়। এ বিস্ফোণের ফলে হাবিব ব্যাংকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ঘটনায় সমস্ত ঢাকা শহর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে সব কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। সেদিন রাতেই প্রিন্স সদরুদ্দিন যখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিশ্রাম করছিলেন, এ দলটি হোটেল ইন্টারকন্টিনন্টালের বারান্দায় আরেকটা বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটায়। চতুর্দিকে এসব বিস্ফোরণে জাতিসংঘের মহামান্য পর্যবেক্ষক বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন যে টিক্কা খান যাকে স্বাভাবিকভাবে দেখানোর চেষ্টা করছে, তা স্বাভাবিক নয়। ঢাকায় অপারেশন যখন চলছিল তখন আমি আমার বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের মিলিত দল বিভিন্ন থানায় পাঠাচ্ছিলাম থানাগুলো দখল করে নেয়ার জন্য। এই দিনগুলো ছিল বিশেষ অসুবিধার—কারণ আমার ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেরা ও সেনারা সবাই ছিল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ছিল না শুধু অস্ত্র আর গোলাবারুদ। অনেক চেষ্টা করেও গোলাবারুদ এবং অস্ত্রের কোন ব্যবস্থা করতে পারছিলাম না।

আমাদের বন্ধুরা সব সময় আমাদের আশ্বাস দিত 'এই অস্ত্র এসে পড়ছে'। কোনো সময় বলত 'ট্রেনে মাল ভর্তি হয়ে গেছে, বন্যার জন্য আসতে পারছে না, কেননা রেলাইন বন্ধ'। আবার কোনো সময় বলত 'ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে'। এমনও সময় গেছে যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরিকল্পনা তৈরির পর আমাদেরকে সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হতো অস্ত্রের অভাবে। নিজেদের কাছে যেসব অস্ত্র ছিল সে-সবেরও গোলাবারুদ অত্যন্ত রেশনিং-এর পরেও প্রায় শেষ হওয়ার পথে ছিল। এ সময় সমস্ত মুক্তিবাহিনীতে হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় বহু অনুরোধের পর হয়ত ৩০৩ রাইফেলের ৫ রাউন্ড করে গুলি সাহায্য পেতাম। এ ধরনের যুদ্ধের জন্য যা ছিল

অতি নগণ্য। এসব অসুবিধা এবং সংকটের মধ্যেও আমরা ভেঙে পড়িনি। আমি আমার সেনাদলকে নির্দেশ দিই, যে উপায়ে হোক আর যেখানেই হোক পাক বাহিনীকে এ্যামবুশ করে বা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদেরকে সজ্জিত করে তুলতে হবে। এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সকলকে আত্মনির্ভরশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস আরো বাড়াতে হবে। আমার এ নির্দেশ বেশ কাজে লাগে। সকলেই আরো পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।

জুলাই মাসে টিক্কা খান আবার মন্দভাগ এবং শালদানদী পুনর্দখল করার প্রচেষ্টা চালায়। পাকিস্তানিরা কুটি নামক জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করে। আমাকে এ খবর আমাদের লোকেরা পৌঁছায়। আমি ক্যাপ্টেন গাফফারকে মন্দভাগের অবস্থান আরো এগিয়ে বাজারের নিকট অবস্থান শক্তিশালী করার নির্দেশ দেই শত্রু সেনারা সকালে বেলুচ রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানিকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়। সকাল সাড়ে দশটায় শত্রুসেনারা অবস্থানের অগ্রবর্তী স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং আমাদের মাইনফিল্ডের ভিতর আটকা পড়ে যায়। তবুও তারা অগ্রসর হতে থাকে। তারা যখন আমাদের অবস্থান থেকে ৫০ গজের মধ্যে এসে পড়ে, ক্যাপ্টেন গাফফারের সেনাদল তাদের উপর অকস্মাৎ গুলিবর্ষণ শুরু করে। শত্রুরা আমাদের অবস্থান এত সামনে আছে তা জানত না। চতুর্দিকের গুলিতে তাদের দুটি কোম্পানি সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং শত্রুসেনারা চারিদিকে ছুটাছুটি করতে থাকে। এতে তাদের নিহতের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। ৩৩ বেলুচ কিছুক্ষণ পর তাদের আক্রমণ পরিত্যাগ করে। কিন্তু একঘণ্টা পরে পাকসেনারা শালদানদীর দক্ষিণ তীরের সাথে আমাদের অবস্থানের ডান পাশ দিয়ে পিছনে আসার চেষ্টা করে। তারা যে এরূপ একটা কিছু করতে পারে ক্যাপ্টেন গাফফার তা পূর্বেই অনুমান করেছিল। এজন্য ক্যাপ্টেন গাফফার তৈরিও ছিল। সুবেদার ওহাবের অধীনে একটি কোম্পানিকে সে আগে থেকেই শালদা নদীর দক্ষিণ তীরে এ্যামবুশ পজিশনে রেখেছিল। শত্রুরা অজ্ঞাতে এ এ্যামবুশ পজিশনটির ফাঁদে পড়ে যায়। নিরুপায় হয়ে তারা অবস্থানটির উপর প্রবল আক্রমণ চালায় কিন্তু আমাদের গুলির মুখে এ আক্রমণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আর উপায় না দেখে পরবর্তী আক্রমণ স্থগিত রেখে পাকসেনারা পিছু হটে যায়। ক্যাপ্টেন গাফফারের সেনাদল ও সুবেদার ওহাবের সেনাদল পশ্চাৎগামী শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করে। এ সময় চতুর্দিকে ধানক্ষেতে এবং অন্যান্য জায়গায় বেশ পানি ছিল। শত্রুরা এসব পানি ভেঙে পশ্চাদপসরণ করার সময় অনেক আহত ও নিহত হয়। যুদ্ধের শেষে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা অন্তত ১২০ টা মৃতদেহ খুঁজে পাই এবং আরো অনেক মৃতদেহ যেগুলো পানিতে ছিল, খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ যুদ্ধের ফলাফল আমার পক্ষে অনেক লাভজনক ছিল। আমরা ৮ টা মেশিনগান, ১৮ টা হালকা মেশিনগান, প্রায় ১৫০টি রাইফেল, ২ টা রকেট লঞ্চার, ২ টা মর্টার ও অজস্র গোলবারুদ হস্তগত করি। আরো অনেক অস্ত্রশস্ত্র যেগুলো পানিতে ছিল, সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৃতদেহগুলোর মধ্যে ১ জন ক্যাপ্টেন, ১ জন লেফটেন্যান্ট এবং আরো কয়েকজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারকে সনাক্ত করা হয়। শত্রুরা এ সময় বৃষ্টি এবং বন্যার জন্য আমাদের হাতে বেশ নাজেহাল হচ্ছিল এবং তাদেরকে বাধ্য হয়ে গতিবিধি

শুধু রাস্তায় সীমিত রাখতে হচ্ছিল। কিন্তু আমরা শত্রুদের এ দুর্বলতা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারছিলাম না, যেহেতু তখনও আমরা অস্ত্রশস্ত্রের দিকে দুর্বল ছিলাম—যদিও ইতোমধ্যে আমাদের বেশ সংখ্যক লোক ট্রেনিং পেয়ে প্রস্তুত ছিল। অস্ত্রের অভাবে এসব ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকদের আমরা ভেতরে পাঠাতে পারছিলাম না। শত্রুরা আমাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাদের গতিবিধি আরো বাড়াবার জন্য জলযানের যোগাড় করতে লাগলো—বাংলাদেশের যত লঞ্চ, স্টিমার, স্পীডবোট ছিল, সেগুলো দখল করে মেশিনগান ফিট করে এগুলোকে গানবোট হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলো।

আমার কাছে খবর আসে যে, শত্রুর নারায়ণগঞ্জের 'পাক বে', কোম্পানিতে তিনশত ফাইবার গ্লাস স্পীডবোট তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। 'পাক বে' ডকইয়ার্ডে এসব স্পীডবোট তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই কোম্পানির একজন অফিসারের ভাই গিয়াসউদ্দিন আমার মুক্তিবাহিনীতে ছিল। সে এসে খবর দেয় যে স্পীডবোটে লাগাবার জন্য তিনশ' ইঞ্জিন সদ্য আনা হয়েছে এবং সেগুলো 'পাক বে'র গুদামে মজুদ রাখা আছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই ছেলেটিকে আরো দশজন গেরিলা মনোনয়ন করার নির্দেশ দিই এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, ফাইবার গ্লাস স্পীডবোট প্রস্তুত হয়ে গেলে শত্রুদের গতিবিধি অনেক গুণে বেড়ে যাবে, এই বর্ষার মওসুমে শত্রুসেনারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছতে পারবে। তখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সুদূর গ্রামের গোপন অবস্থানগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। সেজন্য এই মেশিনগুলোকে এখনই ধ্বংস করে দিতে হবে। নির্দেশমতো মনোনীত দলটিকে প্রশিক্ষণের পর নারায়ণগঞ্জ পাঠিয়ে দেই। নারায়ণগঞ্জে এসে তারা প্রথম 'পাক বে'র গুদামটি রেকি করে এবং জানতে পারে যে, দু'জন পুলিশ এবং দু'জন চৌকিদার যে গুদামটিতে মেশিনগুলো রাখা আছে সেখানে পাহারা দিচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যায় আমার দলটি অতর্কিতে পুলিশদের নিরস্ত্র করে ফেলে এবং পুলিশ ও চৌকিদারদের একটি কামরায় বন্ধ করে গুদামের তালা ভেঙে গুদামে প্রবেশ করে। গুদামের ভিতর ডিজেল এবং পেট্রোল ছিল। সেগুলো সব মেশিনের উপর ঢেলে দেয় এবং যেসব ফাইবার গ্লাস নৌকা প্রস্তুত ছিল তাতেও ঢেলে দেয়। এরপর অগ্নিসংযোগ করে বেরিয়ে আসে। কয়েক সেকেন্ডের ভিতর সমস্ত মেশিনে এবং ফাইবার গ্লাস নৌকাগুলোতে আগুন লেগে যায় এবং বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণে শত্রুদের সমস্ত মেশিন এবং ৩০০ নৌকা ধ্বংস হয়ে যায়।

এ অপারেশনের ফলে পাক বাহিনী তাদের গতিবিধি অনেকাংশে সীমিত করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে এই অপারেশনের ফলে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সুদূর গ্রামাঞ্চলে তাদের গোপন অবস্থান বিপদমুক্ত রাখা সম্ভব হয় এবং তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে।

২ জুলাই সকাল সাড়ে ৫ টার সময় একটা দল ক্যাডেট হুমায়ূন কবিরের নেতৃত্বে শত্রুদের লাটুমুড়া অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে মর্টারের সাহায্যও নেয়া হয়। আক্রমণের ফলে ১২ জন পাকসেনা নিহত ও ৪ জন আহত হয়।

কুমিল্লাতে আমাদের এ্যাকশন তীব্রতর হওয়ার জন্য পাকসেনারা কুমিল্লার উত্তরে গোমতী বাঁধের উপর তাদের অবস্থান তৈরি করে এবং এর পরে তারা তাদের কর্তৃত্ব

আরও উত্তরে বাড়ানোর জন্য টহল দিতে শুরু করে। পাকসেনারা যাতে শহরের বাইরে তাদের কর্তৃত্ব পুনর্স্থাপন করতে না পারে সেজন্য আমি 'বি' কোম্পানির দুটি প্লাটুনসহ কোটেশ্বর নামক স্থানে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলতে নির্দেশ দেই। পাকসেনারা ২/৩ দিন এই এলাকায় সম্মুখবর্তী জায়গায় তাদের টহল বজায় রাখে। এরপর ৪ জুলাই পাকসেনাদের একটি ভারি দল সকাল ৪ টার সময় আমাদের অবস্থানের আধামাইল পশ্চিমে কোটেশ্বর গ্রামের ভিতর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সকাল ৪ টা ১৫ মিনিটে তারা আরো অগ্রসর হয়ে আমাদের ২০০/৩০০ গজের মধ্যে পৌঁছে। এ সময় আমাদের সৈন্যরা তাদের উপর গুলি চালায় পাকসেনারা ২/৩ ঘণ্টা প্রবল চাপ চালিয়ে যায় অগ্রসর হবার জন্য কিন্তু আমাদের গুলির মুখে বারবারই পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এরপর তারা ৫০০/৬০০ গজ পিছু হটে গিয়ে আমাদের বামে সারিপুরের দিক থেকে আবার অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। এবারও পাকসেনারা আমাদের গোলাগুলির সামনে টিকতে না পেরে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের কমপক্ষে ৩০ জন হতাহত হয়। আমাদের ১ জন প্রাণ হারায়।

হোমনা থানা পাকসেনারেদ জন্য সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ঢাকাতে যেসব গেরিলাকে পাঠাতাম অপারেশনের জন্য, তারাও এই হোমনা দিয়ে যাতায়াত করতো। সেজন্য পাকসেনারা লঞ্চে করে সব সময় দাউদকান্দি থেকে হোমনায় টহল দিতে আসতো। আর হোমনায় দালাল পুলিশেরা পাকসেনাদের মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে খবরাখবর দিতো। এ পুলিশ স্টেশনটি আমার জন্য একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য এ থানাটিকে দখল করে নেয়ার জন্য আমি হাবিলদার গিয়াসকে নির্দেশ দেই। হাবিলদার গিয়াস তার সেনাদল ও স্থানীয় গেরিলাদের নিয়ে থানাটি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। তারা খবর নিয়ে জানতে পায় যে, থানাতে বাঙালি দালাল পুলিশ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশও যথেষ্ট আছে। থানা রক্ষার্থে পুলিশ থানার চতুর্দিকে বাংকার তৈরি করেছে এবং কয়েকটা হালকা মেশিনগানও তাদের কাছে আছে। সম্পূর্ণ খবরাখবর নিয়ে হাবিলদার গিয়াস থানা আক্রমণের একটি পরিকল্পনা নেয়। ১ জুলাই রাত ১১ টার সময় হাবিলদার গিয়াস তার গণবাহিনী ও নিয়মিত বাহিনীকে নিয়ে থানাটি অতর্কিতে আক্রমণ করে। এ আক্রমণে পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশরা হালকা মেশিনগানের সাহায্যে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আক্রমণের মুখে তারা সবাই নিহত হয়। হাবিলদার গিয়াস থানাটি দখল করে নেয়। এর ফলে থানার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তার হস্তগত হয় এবং আমাদের ঢাকা যাবার রাস্তাও শক্রমুক্ত হয়।

আমাদের ১টি প্লাটুন মিয়াবাজার থেকে ফুলতলীতে টহল দিতে যায়। রাত ৩ টার সময় তারা দেখতে পায় পাকসেনাদের ১টি জীপ এবং ২টি ট্রাক কুমিল্লা থেকে দক্ষিণের দিকে টহল দিতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্লাটুনটি কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তার উপর এ্যামবুশ লাগিয়ে এই গাড়িগুলোর কনভয়টি ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে। এ্যামবুশ-এর জায়গায় তারা ১টি মেশিনগান ও ৩টি হালকা মেশিনগান রাস্তার দু'দিক থেকে লাগিয়ে পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করে। রাত সাড়ে ৪ টায় পাকসেনাদের গাড়িগুলো

মিয়াবাজার অবস্থানে ফেরত আসে। আসার পথে গাড়িগুলো আমাদের এ্যামবুশ-এ পড়ে যায়। এ্যামবুশ পার্টি খুব নিকটবর্তী স্থান থেকে মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের গুলি চালিয়ে গাড়িগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। পাকসেনাদের গাড়ি থেকে লাফিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করে কিন্তু এতেও তাদের অনেক লোক মেশিনগানের গুলিতে হতাহত হয়। পাকসেনাদের কমপক্ষে ৩ জন অফিসারসহ ২১ জন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়। পরে খবর পাওয়া যায় যে নিহতদের মধ্যে ১ জন লে. কর্নেলও ছিলেন। এ এ্যামবুশের সময় পাকসেনারা কুমিল্লা বিমান বন্দর হতে তাদের সাথীদের সাহায্যার্থে কামানের সাহায্যে আমাদের এ্যামবুশ অবস্থানের উপর প্রচণ্ড গোলা ছুঁড়তে থাকে। গোলার মুখে বেশিক্ষণ টিকতে না পেরে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি স্থানটি পরিত্যাগ করে পিছু হটে আসে।

জুলাই মাসের ১ তারিখে পাকসেনারা আবার তাদের শালদানদী ও কসবা অবস্থানের ভিতরে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালায়। সকাল ১০ টার সময় শালদানদী থেকে পাকসেনাদের একটি দল কসাবর দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি কিছুদূর অগ্রসর হবার পর মন্দভাগের নিকট ক্যাপ্টেন গাফফারের 'সি' কোম্পানির সামনে উপস্থিত হয়। দুপুর ১২ টার সময় ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি, পাকসেনারা যখন তাদের অবস্থানের সামনে দিয়ে কসবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ঠিক সে সময়ে তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। পাকসেনারা আর অগ্রসর হতে পারে না এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের মৃতদেহগুলো ফেলেই শালদানদীর অবস্থানে পালিয়ে যায়। পালানোর সাথে আমাদের মর্টারের গোলাও তাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ৮ জন আহত ও ৩ জন নিহত হয়।

পাকসেনারা জুলাই মাসের ৪ তারিখে ফেনী থেকে দুটি কোম্পানি নিয়ে বিলোনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। রাস্তায় তারা শালদার বাজার নামক স্থানে সাময়িক অবস্থান নেয়। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের ১টি প্লাটুন ৩ ইঞ্চি মর্টার সহ দুপুর দু'টার সময় শত্রুদের এ দলটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাদের মনোবল বিলোনিয়াতে আগে থেকেই যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। এ ছাড়া সে সময়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে সাময়িকভাবে বানানো ট্রেঞ্চগুলোতে থাকাও বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের ফলে মেশিনগান এবং মর্টারের গোলাগুলিতে তাদের অসংখ্য লোক হতাহত হয়। পরে জানা যায় যে, তাদের অন্ততঃপক্ষে ৩০ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছে। পাকসেনারা এরপর শালদা বাজারের পার্শ্ববর্তী সাহেবনগর ও অন্যান্য গ্রামগুলো থেকে স্থানীয় লোকদের অন্য স্থানে চলে যেতে বলে। মতলববাজার এলাকাতে মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুনকে লে. মাহবুব পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি মতলব এলাকায় গিয়ে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। সেখানে তারা জানতে পারে যে মতলব থানাতে পাকিস্তানি পুলিশ এবং রেঞ্জার মোতায়েন করা হয়েছে। এসব পুলিশের অত্যাচারে স্থানীয় লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানি পুলিশেরা স্থানীয় দালালদের সহায়তায় শাসনকার্য আয়ত্তাধীনে আনার চেষ্টা করছে। আমাদের দলটি মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে এই থানাকে

আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা থানা সম্বন্ধে সকল খবর যোগাড় করে। জুলাই মাসের ২ তারিখের রাতে গেরিলা দলটি থানার উপর আক্রমণ করে। পাকিস্তানি পুলিশ এবং রেঞ্জাররা এই আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু তীব্র আক্রমণের মুখে ৫ জন পুলিশ নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। ঠিক এ সময়ে গেরিলাদের নিকট যে হালকা মেশিনগানটি ছিল সেটা খারাপ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে গেরিলারা আক্রমণ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। গেরিলাদেরও ১ জন নিহত হয়। কিন্তু এ আক্রমণের পর থেকে পাকিস্তানি পুলিশরা আর থানার বাইরে আসার সাহস পায়নি এবং সমস্ত মতলব থানা এলাকা মুক্তিবাহিনীর আয়ত্তাধীনে এসে যায়।

শালদা নদীতে আমাদের কার্যকলাপ সব সময় চালানো হচ্ছিল। মেজর সালেকের এক পেট্রোল পার্টি খবর আনে যে রেলওয়ে সড়কের পূর্ব দিক দিয়ে একটি ছোট রাস্তা পাকসেনারা তাদের শালদা নদী এবং নয়নপুর অবস্থানের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য ব্যবহার করে। মেজর সালেক ৫ জনের একটি ডিমোলিশন পার্টি পাঠিয়ে সেই রাস্তার উপর মাইন পুঁতে দেয়। ৯ জুলাই সকাল সাড়ে ৫ টার সময় পাকিস্তানিদের একটি প্লাটুন শালদা নদী থেকে নয়নপুর যাবার পথে এসব এন্টি-পার্সোনাল মাইনের উপর পড়ে যায়। মাইন বিস্ফোরণে ১০ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়। পাকসেনারা বিপর্যস্ত হয়ে শালদা নদীতে ফিরে আসে।

৬ জুলাই পাকসেনারা প্রায় ১টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে মন্দভাগ বাজার পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সেখান থেকে তারা সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের 'এ' কোম্পানির এবং 'সি' কোম্পানি মেজর সালেক এবং ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে পাকসেনাদের শালদা নদী এনক্লেভ-এর ভিতর অগ্রসর হতে প্রচণ্ড বাধা দেয়। পাক-সেনারা তাদের ফিল্ড আর্টিলারি মন্দভাগ বাজার পর্যন্ত নিয়ে আসে এবং কামানের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের উপর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে তীব্র গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এই গোলাবর্ষণে আমাদের ১১ জন আহত হয় এবং অন্তত ৩২ জন বেসামরিক ব্যক্তি হতাহত হয়। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে এবং শালদা নদী এনক্লেভ দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। আমাদের মুক্তিসেনারাও তাদের এ আক্রমণে তীব্র বাধা দিতে থাকে। যদিও আমাদের মর্টারের গোলা তাদের কামানের অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি তবুও মর্টারের গোলা এবং মেশিনগানগুলোতে তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়ে যায়। তারা পিছু হটে মন্দভাগ বাজারে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। মেজর সালেক পাকসেনাদের শালদা নদীর অবস্থানের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপ আরও তীব্রতর করার জন্য ৯ জুলাই পাক অবস্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ খবর রেকি পেট্রোল পাঠিয়ে আনিয়ে নেয় এবং অবস্থানগুলোর উপর আমাদের নিজস্ব প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় গোলাবর্ষণের পরিকল্পনা নেয়। সেই সঙ্গে একটি এ্যামবুশ পার্টি শালদা নদীর পিছনে পাঠিয়ে দেয়। এবং তাদেরকে পাকসেনাদের নদীপথে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টির নির্দেশ দেয়। ৯ জুলাই সন্ধ্যা ৬ টার সময় পাকসেনারা যখন তাদের অবস্থানের উপর ঘোরাফিরা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের কামানগুলো এবং মর্টার পাকসেনাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এই

গোলাবর্ষণ প্রায় আধঘন্টা ধরে চলে। এই অকস্মাৎ প্রচণ্ড মর্টার এবং কামানের গোলাবর্ষণে শত্রুরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। এতে তাদের অনেক হতাহত হয়। পরে জানতে পারা যায় যে এই গোলাগুলিতে ১৯ জন পাকসেনা নিহত এবং ১১ জন আহত হয়। একটি মেশিনগান বাংকারসহ তিনটি বাংকার ধ্বংস হয়। কামানের গোলার আঘাতে তাদের একটি এ্যামুনিশন ডাম্প বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এর পরদিন একটি স্পীড বোট পাকসেনাদের নিয়ে শালদা নদী হয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল। আমাদের পেট্রোল পার্টিটি, যেটি আগে থেকেই শালদা নদীর পিছনে অবস্থান নিয়েছিল, তারা পাক-বাহিনীর স্পীডবোট এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশ-এর সময় আমাদের গুলির আঘাতে স্পীডবোটটি ডুবে যায়। ১২ জন পাকসেনা হয় গুলিতে, না হয় পানিতে ডুবে মারা যায়। মৃতদের মধ্যে ১ জন মেজর ও ১ জন ক্যাপ্টেন ছিল এবং তাদের পদমর্যাদার ব্যাজ এ্যামবুশ পার্টি নিয়ে আসে। এ্যামবুশ পার্টি পানি থেকে ১টি মেশিনগান, একটি অয়ারলেস সেট এবং ১টি ম্যাপ (যাতে শত্রু অবস্থানগুলো চিহ্নিত ছিল) উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এরপরই পাক-সেনাদের কামানের গোলা আমাদের দলের উপর পড়তে থাকে। আমাদের দল তখন বাধ্য হয়ে এ্যামবুশ স্থান পরিত্যাগ করে।

১০ জুলাই পাকসেনারা একটি কোম্পানি নিয়ে বিকেল ৪ টার সময় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। পাকসেনারা শালদা নদীর উঁচু স্থান সাগরতলা স্থানটি দখল করার জন্য অগ্রসর হয়। তাদের সঙ্গে তাদের গোলন্দাজ বাহিনীও সাহায্য করে। কিন্তু সাগরতলা উঁচু অবস্থানের উপর আমাদের যে প্লাটুনটি ছিল সেটি এবং রেললাইনের পশ্চিমে আমাদের আর ১ টা প্লাটুন তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। আমাদের ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং মেশিনগানের গোলাগুলিতে পাকসেনাদের আক্রমণ পর্যুদস্ত হয়। তাদের প্রায় ৩০/৪০ জন হতাহত হয়। এরপর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে শালদা নদীতে তাদের নিজ অবস্থানে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তানিদের একটি দল নবীনগরে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। পাকসেনাদের নবীনগরে অবস্থানের পর আমাদের পক্ষে নরসিংদী, ভৈরববাজার এবং কালিগঞ্জে যাতায়াতের রাস্তায় বাধার সৃষ্টি হয়। পাকসেনারা কয়েকজন স্থানীয় দালালের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর জন্য সমস্ত এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন এ এলাকাকে পুনরায় বিপদমুক্ত করার জন্য ১৬ জনের ১টি দলকে হাবিলদার আওয়ালের নেতৃত্বে নবীনগর পাঠায়। হাবিলদার আওয়াল কসবার উত্তর দিয়ে অনুপ্রবেশ করে নবীনগরের ৩ মাইল পশ্চিমে তার গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে। এরপর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ খবর যোগাড় করে। এরপর ৮ জুলাই সকাল ৬ টায় পাকসেনাদের নবীনগরের অবস্থানটির উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। এ অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাকসেনারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা হতচকিয়ে যায় এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি পাকসেনাদের ৭ জন ও ৫ জন দালালকে নিহত করতে সক্ষম হয়। সংঘর্ষে আমাদের ১ জন আহত হয়।

আমি এ সময়ে ঢাকাতে আরো কয়েকটি গেরিলা পার্টি পাঠাই। এই দলগুলোও আগের প্রেরিত দলগুলোর সাথে যোগ দেয় এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী

এলাকায় তাদের গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। একটি দল জুলাই মাসের প্রথমেই পাকসেনাদের ছোট একটি Ammunition Point আক্রমণ করে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে পাকবাহিনী সমস্ত ঢাকাতে সান্ধ্য আইন জারি করে এবং ঢাকা শহরে প্রহরার ব্যবস্থা করে। ঐ দিনই দু'জন গেরিলা নিউমার্কেটের নিকট পাকসেনাদের ১টি জীপের ভিতর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে ১ জন অফিসার ও ৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। ৫ জুলাই নারায়ণগঞ্জে দু'জন গেরিলার আর একটি দল গুলশান সিনেমা হলের পর্দার ভিতর একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে পর্দা সম্পূর্ণ পুড়ে যায় এবং নিকটবর্তী ৫ জন দালালও আহত হয়। সমস্ত নারায়ণগঞ্জে এবং ঢাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ৪ জুলাই দুপুর ১২ টার সময় ৫ জন গেরিলার একটি দল পাগলাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইলন উড়িয়ে দেয়। ১০ জনের গেরিলার একটি দল নিউমার্কেটের নিকট পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং পাকসেনাদের একটি মিলিত দলের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে ৮ জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও ৪ জন পাকসেনা নিহত হয়।

এদিকে ১১ জুলাই সকাল ৮ টা থেকে অকস্মাৎ পাকসেনারা ভারি কামান এবং মর্টারের সাহায্যে আমাদের শালদা নদী অবস্থানের উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালাতে থাকে। এই গোলাগুলির ফলে আমাদের শালদা নদী অবস্থানে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকসেনাদের গোলাগুলি সমস্ত দিন ধরে চলতে থাকে। মর্টার স্প্লিন্টারের আঘাতে ৪র্থ বেঙ্গলের হাবিলদার তাজুল মিয়া এবং সিপাই আব্দুর রাজ্জাক মারাত্মকভাবে আহত হয়। এছাড়াও দু'জন বেসামরিক লোক নিহত ও ৮ জন বেসামরিক লোক আহত হয়। আমদের অবস্থানের সব সৈন্যরা এই প্রচণ্ড গোলাগুলির ফলে স্বাভাবিকভাবে পাকসেনাদের আক্রমণের আশঙ্কায় ছিল, কিন্তু বিকেলের দিকে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং আক্রমণও হয়নি।

৯ জুলাই পাকসেনারা আমাদের কোটেশ্বর অবস্থানের উপর সকাল ৬ টায় আবার তাদের আক্রমণ শুরু করে। আমাদের কোটেশ্বর অবস্থানের সৈন্যরা মর্টার এবং কামানের সহায়তায় পাকসেনাদের এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। পাকসেনারা প্রথমে দুটি কোম্পানি নিয়ে আক্রমণ চালায়। পরে আরও দুটি কোম্পানিকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিয়ে আসে। ৩/৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের কামানের গোলায় এবং মেশিনগানের গুলিতে পাকিস্তানিদের আক্রমণ ব্যাহত হয়। এ যুদ্ধে পাকসেনাদের অন্তত ২৪/২৫ জন নিহত হয়। তারা আক্রমণ বন্ধ করে পিছু হটে যায়।

আমাদের পেট্রোল পার্টি ৯ জুলাই পাকসেনাদের কোম্পানি হেডকোয়ার্টার রেকি করে এবং অবস্থান সম্বন্ধে জানতে পারে। আমাদের কামানগুলো এই কোম্পানি হেডকোর্টারের উপর অতর্কিতে প্রচণ্ড গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে দু'জন পাকসেনা নিহত এবং ছ'জন আহত হয়। এর মধ্যে একজন অফিসার ও তার Signallerও ছিল। স্থানীয় লোকেরা অফিসারটির কাঁধে ব্যাজ দেখে শনাক্ত করতে পেরেছিল। শত্রুদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল।

১০ জুলাই রাতে ক্যাপ্টেন গাফফার ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি থেকে দুটি সেকশন শালদা নদীর পশ্চিমে কামালপুর এবং মাইঝখাইরের ভিতর এ্যামবুশ নেয়ার

জন্য পাঠায়। এই দলটি সকাল হবার আগেই এ্যামবুশ নিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় বসে থাকে। দুপুর আড়াইটায় পাকসেনাদের একটি ভারি দল শালদা নদী অবস্থান থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি যখন আমাদের এ্যামবুশ অবস্থানের ভিতর এসে পড়ে ঠিক সে সময় পাকসেনাদলের সম্মুখবর্তী অংশের উপর আমাদের সৈন্যরা গুলি চালাতে শুরু করে। অতর্কিত আক্রমণে পাকসেনারা হতভম্ব হয়ে যায় এবং কিছু বোঝার আগেই তাদের অনেক লোক হতাহত হয়। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা পিছনের দিকে পালাতে শুরু করে। এ অবস্থাতেও তাদের অনেক হতাহত হয়। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা পিছনের দিকে পালাতে শুরু করে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টি একটি MG1A3 মেশিনগান এবং তার ২২৫ রাউন্ড গুলি, একটি SMG, একটি G-III রাইফেল, একটি ANPRC-10 Wireless set হস্তগত করে।

হোমনাতে হাবিলদার গিয়াসের অধীনে যে মুক্তিবাহিনীর দলটি হোমনা থানায় আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়, সেই দলটি এ এলাকাতেই তাদের ঘাঁটি গড়ে তোলে। এ দলটির কার্যকলাপে পাকবাহিনী নিকটবর্তী সমস্ত থানাগুলোকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। পাকসেনারা রাস্তার প্রত্যেকটি সেতুর উপর তাদের কড়া পাহারা বন্দোবস্ত করে। প্রতিটি হাট-বাজার এলাকাতেও তারা ক্যাম্প তৈরি করে। এছাড়া নিকটবর্তী সমস্ত এলাকার চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ডেকে 'শান্তি কমিটি' গড়ার কড়া নির্দেশ দেয়। প্রতিটি এলাকার চেয়ারম্যানকে স্থানীয় লোক নিয়োগ করে পাকসেনাদের অধীনে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে বাধ্য করে এবং তাদের কাজ করতে বাধ্য করে। কোন স্থানীয় লোক যদি তাদের নির্দেশমতো কাজ করতে অস্বীকার করত, পাকসেনারা তাদের পিতামাতা-বাড়িঘরের ক্ষতি করে বা ভয় দেখিয়ে তাদের নির্দেশমতো কাজ করতে বাধ্য করত। পাকসেনারা স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় হাবিলদার গিয়াসের দলটির সঠিক সন্ধান পায় এবং তাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে পাকবাহিনীর মন্তব্য আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পাই। তাদের ধারণা ছিল যে হোমনা এবং দাউদকান্দি এলাকাতে কমপক্ষে আমাদের ৬ হাজারেরও বেশি লোক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ জন্য পাকসেনারা কখনও রাতে তাদের ক্যাম্পগুলোর বাইরে আসতে সাহস করতো না। এছাড়া কোনো সময়েই দলে ভারি না হলে ক্যাম্পের বাইরে টহলে বের হতো না। পাকসেনাদের এ ভীতসন্ত্রস্ত মানসিক অবস্থার জন্য আমাদের দলটির নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে সুবিধা হয়। সপ্তাহে একদিন কী দু'দিন লঞ্চের সাহায্যে পাকসেনাদের এসব ক্যাম্পে রসদ যোগান হতো। এ সংবাদ আমাদের দলটি জানতে পারে। ৬ জুলাই দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত মাসিমপুর বাজারের অর্ধমাইল পশ্চিমে জয়পুর গ্রামে গোমতীর শাখানদীর পাড়ে হাবিলদার গিয়াস তার দলটি নিয়ে পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পাতে। সকাল ১০ টার সময় পাকসেনাদের দুটি লঞ্চ দাউদকান্দির দিক থেকে গোমতী হয়ে এই শাখানদীতে আসে। লঞ্চগুলো এ্যামবুশের সামনে এসে পড়তেই আমাদের দলটি অতর্কিতে গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকে। পাকসেনারা নদীর ভিতর থেকে এ্যামবুশ দলটির উপর হামলা না করতে পারায় এবং তীরে অবস্থিত এ্যামবুশ পার্টির তীব্র গোলাগুলিতে লঞ্চগুলোর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায়

অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। উপয়ান্তর না দেখে লঞ্চগুলো পিছু হটে যায় এবং দাউদাকান্দির দিকে পালিয়ে যায়। পরে বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা খবর পেয়েছি যে অন্তত ২০/২৫ জন পাকসেনা আহত বা নিহত হয়েছে। লঞ্চগুলো এ্যামবুশের ভিতর পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব হয়নি, কারণ এ্যামবুশ পার্টির নিকট রাইফেল এবং হালকা মেশিনগান ছাড়া বড় অস্ত্র, যেমন রকেট কিংবা ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না, তবুও এ এ্যামবুশের ফলাফল ছিল আমাদের জন্য বিরাট সাফল্য। ফলে পাকসেনারা এ এলাকায় চলাফেরা আরও কমিয়ে দেয়। এতে আমাদের কর্তৃত্ব এবং স্থানীয় লোকের মনোবল আরো বেড়ে যায়। এরপর হোমনা ও দাউদকান্দি থানার জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানির একটি প্লাটুন চৌদ্দগ্রাম এলাকায় পাকসেনাদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকসেনারা কুমিল্লা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক খোলার জন্য তাদের প্রচেষ্টা দিন দিন বাড়িয়ে যাচ্ছিল। যেসব সড়কসেতু আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম সেগুলো পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা নিচ্ছিল। ৯ জুলাই সকাল ৮ টায় আমাদের প্লাটুনটি চৌদ্দগ্রামের উত্তরে সড়কের উপর বালুজুরি ভাঙ্গাপুলের নিকট এ্যামবুশ পাতে। ১১ টার সময় পাকসেনারা একটি ট্রাকে করে এবং দুটি জীপে রাস্তা দিয়ে আসে এবং ভাঙ্গাপুলের নিকট থামে। পুলটি মেরামত করার কাজের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঠিক সে সময় আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর গোলাগুলি চালাতে থাকে। এর ফলে পাকসেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে তাদের অনেক লোক হতাহত হয়। পাকসেনারা পুলের নিকট থেকে পিছু হটে অবস্থান নেয় এবং পরে চৌদ্দগ্রাম থেকে আরো পাকসেনারা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরপর পাকসেনারা আমাদের এ্যামবুশ অবস্থানের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। আমাদের দলটিও একটু পিছু হটে উঁচু জায়গায় আরো শক্ত অবস্থান গড়ে তোলে। পাকসেনারা ৩ টার সময় মর্টার ও মেশিনগানের সহায়তায় আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ করে। আমাদের দলটি সাহসিকতার সাথে এ আক্রমণের মোকাবিলা করে। আমাদের গুলিতে পাকসেনারা পর্যুদস্ত হয়ে ৩/4 ঘণ্টা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিকেল ৫ টায় আক্রমণ পরিত্যাগ করে পিছু হটে যায়। যুদ্ধে পাকসেনাদের ৩০ জন নিহত ও ৬ জন আহত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে মৃতদেহগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রেখে তারা পালিয়ে যায়। পাকসেনারা পিছু হটার পর আমাদের দলটি অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয় এবং শত্রুদের ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকটিও নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয় কিন্তু ট্রাকটির এত বেশি ক্ষতি হয়েছিল যে এটা আনা সম্ভব হয়নি এবং ট্রাকটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়। পাকসেনাদের যে দু'জন দালাল যুদ্ধের সময় পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, তারাও গুলিবিদ্ধ হয়। পাকসেনারা পিছু হটে যাবার পর আমাদের দলটি তাদের ২/৩টি পেট্রোল ও পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে অবস্থিত পাকসেনাদের তাড়িয়ে দেয়। বিকেল সাড়ে চারটার সময় পাকসেনাদের একটি জঙ্গী বিমান যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে এবং আমাদের দলটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের দলটি সেখান থেকে একটু দূরে সরে যাওয়াতে জঙ্গী বিমানটি কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে ফেরত চলে যায়। এ সংঘর্ষের পর

১০ জুলাই সন্ধ্যায় একটি এ্যামবুশ পার্টি উক্ত অবস্থানের ১ মাইল দক্ষিণে লে. ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে আবার অ্যামবুশ পাতে। আমাদের ধারণা ছিল যে, পাকসেনারা আবার উক্ত সেতুর নিকট আসবে। ১০ জুলাই সারাদিন পাকসেনাদের জন্য তারা অপেক্ষা করে থাকে কিন্তু আমাদের ধারণামতো সেদিন না এসে ১১ জুলাই ১১ টার সময় পাকসেনাদের ১ টা কোম্পানি দুটি গাড়িসহ আস্তে আস্তে ভাঙ্গা সেতুর দিকে মিয়াবাজারের দিক থেকে অগ্রসর হয়। পাকসেনারা যখন এ্যামবুশ অবস্থানের ভিতর পৌঁছে, ঠিক সে সময় এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালাতে থাকে। এতে শত্রুদের বেশ হতাহত হয়। তারা পিছু হটে গিয়ে সেনাদের আক্রমণ চালায় এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধ সারাদিন ধরে চলতে থাকে। এ যুদ্ধে পাক সেনাদের ১০/১৫ জন হতাহত হয়। বিকেল ৩ টায় পাকসেনারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে আবার পিছু হটে যায়। আমাদের দলটি রাত ২ টা পর্যন্ত পুনরায় আক্রমণের অপেক্ষায় থাকে। এরপর বালুজুরির ভগ্নাবশেষ সেতুটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে লে. ইমামুজ্জামান তার দলটি নিয়ে নিজ ঘাঁটিতে চলে আসে। আসার পথে চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম রোডের উপর বাংগোড়ার পশ্চিমে এবং চৌদ্দগ্রামের উত্তরে আর একটি ভাঙ্গা ব্রীজের নিকট এন্টি-ট্যাংক এবং এন্টি-পার্সোনাল মাইন পেতে রাখে। মাইন পাতার সময় আমাদের কমান্ডো প্লাটুনের দু'জন লোক দুর্ঘটনায় সামান্য আহত হয়।

এ সময়ে পাকিস্তানিরা চাঁদুপর থেকে ফেনী দিয়ে চট্টগ্রাম রেললাইন পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে। আমার রাজনগর সাব-সেক্টর থেকে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম একটি প্লাটুন ও Engineer-এর একটি দলকে explosive-সহ মিয়াবাজারের দক্ষিণে পাঠিয়ে দেয়। এ দলটি স্বরিসদি রেলওয়ে ব্রীজ সম্বন্ধে খবরাখবর নেয় এবং গোমতীর নিকট স্বরিসদি রেলওয়ে ব্রীজটি আক্রমণ করার জন্য বেছে নেয়। কিছুসংখ্যক স্থানীয় দালাল পাকবাহিনীর অস্ত্র দিয়ে এই ব্রীজটি পাহারা দিত। ১৩ জুলাই রাত ১১ টার সময় আমাদের দলটি স্বরিসদি ব্রীজটি আক্রমণ করে। পাহারারত সশস্ত্র দালালদের কিছু নিহত এবং বাকিদের তাড়িয়ে দিয়ে তারা demolition লাগিয়ে ব্রীজটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে পাকিস্তানিরা শুধু ফেনী এবং গুণবতীর মধ্যে ট্রেন মাঝে মাঝে চলাচল চালু রাখতো। অবশ্য এর আগে ট্রেন চলাচল করতে পারতো না। এ দলটি পাকিস্তানিদের নয়াপুর বিওপি-র উপর ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। এর ফলে দু'জন পাকসেনা নিহত এবং ৭ জন আহত হয়।

১৩ জুলাই রাত ১০ টায় পাকসেনাদের দত্তসার দিঘী এবং আমতলা অবস্থানগুলোর উপর ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে দুটি দল আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের পাকসেনাদের ১৫ জন আহত ও কিছু নিহত হয়। শালদা নদীতে পাকসেনারা আবার নতুন করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। ১১ জুলাই পাকসেনারা আমাদের শালদা নদী অবস্থানের দিকে মারমুখী পেট্রোলিং চালাতে থাকে। আমাদের সৈন্যরাও মেজর সালেকের নেতৃত্বে তাদের অবস্থানে সাহসের সঙ্গে পাকসেনাদের উপর লক্ষ্য রাখে। ১২ জুলাই রাত ৮ টায় পাকসেনারা প্রচণ্ডভাবে আমাদের শালদা নদী অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি মেজর সালেকের নেতৃত্বে এ

আক্রমণের মোকাবিলা করে। আমাদের সৈন্যদের গুলির আঘাতে পাকসেনাদের প্রচুর হতাহত হয়। তারা পর্যুদস্ত হয়ে আক্রমণ পরিত্যাগ করে রাত ১১ টায় পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। সমস্ত রাত উভয়পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে। ভোর ৫ টায় পাকসেনারা এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য নিয়ে আবার শালদা নদীর দক্ষিণে গোরঙ্গলা অবস্থানের উপর নতুনভাবে আক্রমণ শুরু করে। সেই সঙ্গে তারা আমাদের আশাবাড়ি অবস্থানেও হামলা চালায়। এই দুই আক্রমণ ও আমাদের মেশিনগানের গুলি ও মর্টারের গোলার সামনে তারা পর্যুদস্ত হয়। পাকসেনাদের অসংখ্য হতাহত হয়। দিনের আলোতে আমাদের সৈন্যরা বাংকার থেকে অগ্রসরমান শত্রুদেরকে হতাহত করে। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ ভঙ্গ করে দিতে বাধ্য হয় এবং পিছু হটে যায়। আমাদের সৈন্যরা পলায়নপর শত্রুদেরকে তাড়া করে। যুদ্ধের সময় আমাদের মর্টারের গোলাতে পাকসেনাদের চাপাইতে অবস্থিত একটি অ্যামুনিশন এবং রেশন স্টোর-এ বিস্ফোরণ ঘটে, ফলে ২১ জন আহত ও কিছু সংখ্যক নিহত হয়। ঐ দিনই ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরের একটি দল পাকসেনাদের লাটুমুড়াতে যে অবস্থান ছিল তার পিছনে আক্রমণ চালায় এবং বেশ কয়েকজনকে আহত ও নিহত করে। পাকসেনাদের গোসাইস্থল বিওপি'র একটি টহলদার পার্টি এন্টি-পার্সোনাল মাইন বিস্ফোরণে ১১ জন হতাহত হয়। ১৩ জুলাই ক্যাপ্টেন গাফফারের একটি দল সন্ধ্যা ৬ টায় মন্দভাগ বাজারের শত্রু অবস্থানের উপর এবং নাক্তেরবাজার শত্রু অবস্থানের উপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকসেনাদের ১২ জন নিহত এবং বেশ কয়েকটি বাংকারও ধ্বংস হয়। পাকিস্তানিরা আমাদের মন্দভাগ অবস্থানের উপর কামানের সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এতে আমাদের ১ জন নায়েক এবং ৩ জন সিপাই আহত হয়।

আমাদের স্পেশাল কম্যান্ডোরা জুলাই মাসে ৯, ১০, ১১ তারিখে ঢাকা শহরে তাদের কার্যকলাপ আরো তীব্র করে। গেরিলা কমান্ডার হাবিবুল আলম এবং কাজী কামালউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি ইমপ্রুভাইসড্ টাইম বোমা ফার্মগেটের একটি পাঞ্জাবীদের 'মাহরুফ রেস্টুরেন্টে' স্থাপন করা হয়। এই রেস্টুরেন্টে পাকসেনারা এবং দালালেরা সব সময় আসতো। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বোমাটি বিস্ফোরিত হয় এবং এতে ১৬ জন পাকসেনা কয়েকজন দালালসহ হতাহত হয়। এর মধ্যে ৮ জন মারা যায় এবং ১২ জন আহত হয়। হলিক্রস কলেজ ভবনেরও কিছু ক্ষতি হয়।

৪ জনের আর একটি গেরিলা দল ডিআইটি ভবনের নিকট ২ জন প্রহরারত পাকসেনাকে নিহত করে। এই পার্টি এরপর সিদ্দিকবাজারের নিকট একটি টহলদার পাকসেনাদলকে এ্যামবুশ করে এবং ২/৩ জন পাকসেনা এতে নিহত হয়। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক, নাজ সিনেমা হল, ওয়াপদা ভবন ইত্যাদি স্থানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এসব ঘটনার ফলে সমস্ত ঢাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাকসেনারা ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ঢাকার স্বাভাবিক অবস্থাও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এবং এলাকাবাসীদের মনোবল আরো বেড়ে যায়।

জুন মাসে আমি যখন পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সব ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সে সময় আমি বুঝতে পারলাম যদিও আমাদের যোদ্ধাদের আঘাতে পাকসেনাদের প্রচুর

ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল এবং যতই আমাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছিল তবুও আমাদের চেয়ে তাদের শক্তি অনেকাংশে বেশি ছিল। বিশেষ করে যেখানে পাকসেনারা শক্তিশালী ঘাঁটি গেড়ে বাংকারে অবসস্থান নেয় সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা আমাদের পক্ষে বিশেষ করে সব সম্ভব হতো না। আমি সবসময়ে সংগঠিত গোলন্দাজ বাহিনীর অভাব অনুভব করতাম। বাংলাদেশে অবস্থিত পাকসেনাদের বেশ কয়েকটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ছিল। এসব রেজিমেন্টে যেসব বাঙালি নিযুক্ত ছিল, ২৫ মার্চের পরে অনেককে পাকিস্তানিরা হত্যা ও বন্দি করে। আবার অনেকে প্রাণ বাঁচায় এবং পরে সেসব গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যরা আমাদের সেক্টরে যোগ দেয়। তাদের আমি বিভিন্ন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োগ করি। যুদ্ধে এসব সৈন্যরা যথেষ্ট সাহাসেরও পরিচয় দেয়। এসব সৈন্যদের নিয়ে আমি একটা গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিই। এই পরিপ্রেক্ষিতে গোলন্দাজ বাহিনীর সব সৈন্যকে কোনাবনে একত্রিত করা হয়। একটি নতুন রেজিমেন্ট গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই কষ্ট নতুন রেজিমেন্টটিকেও বহন করতে হয়। এদের কোনো থাকার জায়গা ছিল না, খাওয়া এবং রান্নার কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। রেজিমেন্টের জন্য বিভিন্ন রকমের টেকনিক্যাল লোকের দরকার হয়, কিন্তু সব রকমের সৈন্য আমাদের ছিল না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় জিনিস কামান এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি, যা একটি গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। আমি পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের মিলিটারী অধিনায়কদের সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অস্ত্রের জন্য অনুরোধ জানাই। অনেক ছোটাছুটির পর তারা কয়েকটি ৩.৭ ইঞ্চি ছোট কামান আমাদের দেয়। এই কামানগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ছিল এবং সম্ভবত সেকেলে হিসেবে পরিত্যক্ত ছিল কিন্তু তবুও এগুলো পাবার পর আমার গোলন্দাজ বাহিনীর লোকদের মধ্যে একটি নতুন সাড়া জাগে। তারা তৎক্ষণাৎ এই কামানগুলোর প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে দেয়। প্রকৌশলী লোকের অভাব থাকায় বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং গণবাহিনী থেকে লোক ভর্তি করে তাদেকে ট্রেনিং দিয়ে নেয়া হয়। এ সময় ক্যাপ্টেন আবদুল আজিজ পাশা পাকিস্তান থেকে কোনোরকমে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর লোক ছিলেন। ক্যাপ্টেন পাশা রাতদিন খেটে আমাদের এই গোলন্দাজ বাহিনীকে ট্রেনিং করিয়ে শত বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে মোটামুটি যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত করে তোলেন। এভাবে বাংলাদেশের প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর (ফার্স্ট ফিল্ড ব্যাটারী) জন্ম হয়। জন্মের পর থেকে ফার্স্ট ফিল্ড ব্যাটারী বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে জুলাই মাস থেকে আমার কয়েকটি সাব-সেক্টরের কমান্ডারের অপারেশনকে ফলপ্রসূ করে তোলে। বিশেষ করে শালদা নদী, কোনাবনে প্রথম এই ফিল্ড ব্যাটারীর সহায়তার জন্যই পাকবাহিনীর বারবার আক্রমণ ক্যাপ্টেন গাফফার এবং মেজর সালেক প্রতিহত এবং পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন পাশার নেতৃত্বে আমাদের এই সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যরা অনেক সময় এমনভাবে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে যে, গোলন্দাজ বাহিনীর ইতিহাসে তা বিরল। পাকসেনাদের নিকট ছিল অত্যাধুনিক কামান, আর সেসব কামানের গোলা নিক্ষেপের

ক্ষমতা ছিল বেশি। সব সময় পাকসেনাদের চেষ্টা ছিল তাদের কামানের গোলাতে আমাদের এই ছোট পুরাতন কামানগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়া। সেজন্য দিনরাত আমাদের প্রথম ফিল্ড ব্যাটারী কোন জায়গাতেই বেশিক্ষণ একস্থানে থাকতে পারতো না। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানিদের গোলা তাদের উপর পড়ে। তাছাড়া আমাদের পুরাতন কামানগুলোর গোলা ক্ষেপণের দূরত্ব ছিল পাকিস্তানিদের অর্ধেকের কম। সে কারণে অধিকাংশ সময় আমাদের প্রথম ফিল্ড ব্যাটারীর লোকেরা তাদের কামানগুলো মাথায় করে নিকটে বা পশ্চাতে দুর্গম রাস্তায় নিয়ে যেত এবং শত্রুদের উপর আক্রমণ করতো। এসব আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তো। ফার্স্ট ফিল্ড ব্যাটারীর কৌশল কতকটা কমান্ডো ধরনের। পরবর্তী পর্যায়ে প্রথম ফিল্ড ব্যাটারী আমাদের মুক্তি বাহিনী যখন ডিসেম্বর মাসে ফেনী, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়, তখন 'কে' ফোর্সের ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, ১০ম ইস্ট বেঙ্গল এবং ৯ম ইস্ট বেঙ্গলকে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাহায্য করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ফার্স্ট ফিল্ড ব্যাটারীর অবদান সুবর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে এবং ভবিষ্যতে গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য হবে এটা গৌরবের দৃষ্টান্ত।

জুলাই মাসের ১২ তারিখে ক্যাডেট হুমায়ুন কবির সিএন্ডবি রাস্তার উপর একটি প্লাটুনের পেট্রোল পাঠায়। এই পেট্রোলটি শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে খবরাখবর নেবার জন্য কুটি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। দুপুর ২ টার সময় এই পেট্রোল পার্টি যখন কুটির নিকট দিয়ে টহল দিচ্ছিল তখন তারা দেখতে পায় অনেক গাড়িতে কুমিল্লা থেকে এসে পাকিস্তানিরা সৈন্য সমাবেশ করছে। কুটিতে গাড়ি থেকে নেমে ওদের একটি ব্যাটালিয়নের মতো দল মন্দভাগ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বাকি দুটি দলের একটি নয়নপুরের দিকে, অন্যটি লাটুমুড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের পেট্রোলটি বুঝতে পারে যে, এই পাকসেনারা নয়নপুর, মন্দভাগ বাজার এবং লাটুমুড়া টি. আলীর বাড়ির নিজ অবস্থানগুলো শক্তিশালী করার জন্য যাচ্ছে। মন্দভাগ বাজারের দলটি বাজারে এসে অবস্থান নেয় এবং দোকানের ভিতর বাংকার তৈরি করতে থাকে। এছাড়া তাদের অবস্থানের চতুর্দিকে পাট এবং ধান কেটে পরিষ্কার করে ফেলে যাতে তাদের গুলি আমাদের অবস্থানে এসে পড়ে। এসব সংবাদ পেট্রোল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে। সংবাদ পাবার পর আমি পাকসেনাদের ঘাঁটিগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগেই তাদের উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিই। ক্যাপ্টেন গাফফারকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি দিয়ে ফার্স্ট ফিল্ড ব্যাটারীর সহায়তায় প্রথমে মন্দভাগ বাজার আক্রমণ করার নির্দেশ দেই। ক্যাপ্টেন গাফফার তার কোম্পানি নিয়ে ১২ জুলাই বিকেলে প্রথম ফিল্ড ব্যাটারীর কামানগুলোসহ মন্দভাগ বাজারের নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সন্ধ্যা হবার আগেই ছোট ছোট কয়েকটি দল পাঠিয়ে বাজারটি এবং শত্রু অবস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবরা-খবর নেয়। সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন গাফফার তার কোম্পানি এবং ফার্স্ট ফিল্ড ব্যাটারীর সহায়তায় গোপন পথে নৌকাযোগে বাজারের পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে অবস্থান নেয়। ক্যাপ্টেন গাফফারের আক্রমণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কামানগুলো থেকে অতি নিকটবর্তী শত্রু অবস্থানের বাংকারগুলো এবং বাজারের ঘরগুলোতে প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করতে থাকে, ফলে

অনেক বাংকার এবং ঘর ধ্বংস হয়ে যায় এবং বাজারে অবস্থিত পাকসেনারা আহত ও নিহত হয়। এত নিকট থেকে অতর্কিত কামানের গোলার আক্রমণ পাকসেনারা আশা করতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকসেনাদের অন্তত ৬০/৭০ জন লোক হতাহত হয়। পাকসেনাদের আর্তনাদ এবং চিৎকার আমাদের লোকেরাও শুনতে পায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের প্রতিরোধশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে এবং তারা অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। দু'ঘন্টা যুদ্ধের পর মন্দভাগ বাজার এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র ক্যাপ্টেন গাফফারের দখলে আসে। এরপর মন্দভাগ দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আমাদের দখলে থাকে। এর পরদিন আমাদের একটি পার্টি শালদা নদীতে অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকসেনাদের একটি স্পীডবোট দুপুর ১ টায় এ্যামবুশে পড়ে যায়। এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে স্পীডবোটটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ২০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। কেউ কেউ নদীতে পড়ে ভেসে যায়। এ্যামবুশ পার্টিটি পরে নিরাপদে মন্দভাগ অবস্থানে ফিরে আসে। আমাদের হেডকোয়ার্টারে খবর পাই যে, দাউদকান্দিতে পাকসেনারা ফেরীঘাটের নিকটে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এখানে প্রায় দুই কোম্পানির মতো পাকসেনা বাংকার নির্মাণ করে ঘাঁটিটি বেশ শক্তিশালী করে তোলে। এখানে পাকসেনারা ঢাকা-কুমিল্লাগামী প্রতিটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে অনুসন্ধান চালায়। তাছাড়াও নিকটবর্তী এলাকায় স্পীডবোট-এ টহল দেয়। আমরা একটি প্লাটুন দাউদাকান্দিতে পাঠিয়ে দিই। এদের সঙ্গে আর একটি দল পাঠানো হয় শহীদনগর অয়্যারলেস স্টেশন এবং ইলিয়টগঞ্জ রাস্তার সেতু ধ্বংস করার জন্য। আমাদের দলগুলো দাউদকান্দিতে গিয়ে গৌরীপুর নামক স্থানে তাদের ঘাঁটি তৈরি করে। এরপর শত্রুদের গতিবিধি সম্বন্ধে খবর নেয়। ১৩ জুলাই সন্ধ্যা ৮ টার সময় প্লাটুনটি দাউদকান্দির উত্তরে গোমতী নদীতে পাকসেনাদের একটি টহলদারী স্পীডবোটকে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে একজন লেফটেন্যান্ট এবং ২০ জন পাকসেনা নিহত হয়। অফিসারটির র‍্যাঙ্কের ব্যাজ এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা হয়। এরপর এই দলটি পরদিন রাতে শহীদনগর অয়্যারলেস স্টেশনটি ধ্বংস করে। দলের অপর অংশ ইলিয়টগঞ্জের নতুন সেতুটিতে ডেমোলিশন লাগিয়ে দুটি স্প্যান উড়িয়ে দেয়। তাদের কাজ সম্পূর্ণ করে দলগুলো নিরাপদে হেডকোয়ার্টারে ফেরত আসেন।

কুমিল্লা—চাঁদপুর রাস্তায় হাজিগঞ্জের নিকট রামচন্দ্রপুরের ব্রীজ উড়িয়ে দেয়ার পর পাকসেনাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার বেশ অসুবিধা হয়। পাকসেনারা ঐ জায়গাতে ফেরীর বন্দোবস্ত করে। এই ফেরী যোগাযোগকে বিনষ্ট করার জন্য লে. মাহবুব একটি কোম্পানি রামচন্দ্রপুরে পাঠায়। ৬ জুলাই ভোরে এই দলটি রামচন্দ্রপুর ফেরীঘাটের নিকট এ্যামবুশ পাতে। এই দলের অন্য অংশ ফেরীঘাট থেকে আরও দক্ষিণে আর একটি এ্যামবুশ পাতে। ঐ দিনই সকালে ৭ টার সময় পাকসেনাদের ১টি দল রামচন্দ্রপুর ফেরীঘাটে আসে। তাদের জিনিসপত্র যখন ফেরীতে উঠাচ্ছিল ঠিক সেই সময় এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর গুলি চালায়। এতে পাকসেনাদের ৪ জন নিহত হয়। উভয়পক্ষে প্রায় ঘন্টাখানেক গোলাগুলি চলে। গোলাগুলির সংবাদ পেয়ে চাঁদপুর থেকে পাকসেনাদের প্রায় দুই কোম্পানি সৈন্য সাহায্যের জন্য আসে। পাকসেনারা ফেরীঘাটের

কিছু দূরে এসে গাড়ি থেকে নামে এবং এ্যামবুশ অবস্থানে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত হয়। ঠিক সেই সময়ে আমাদের অন্য এ্যামবুশ পার্টিটি তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে পাকসেনারা সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের ৩১ জন নিহত এবং ৫৪ জন আহত হয়। আমাদের একজন এনসিও এবং একজন সিপাই গুরুতরভাবে আহত হয়। এরপর আমাদের দলটি এ্যামবুশ অবস্থান পরিত্যাগ করে। আসার পথে ৮ জুলাই মুদ্দাফরগঞ্জ সড়কসেতুটি উড়িয়ে দিয়ে আসে। এরপর পাকসেনারা সেতুটির নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে মর্টারের সাহায্যে গোলাগুলি করে। সে সময় পাকসেনাদের অভ্যর্থনার জন্য অনেক স্থানীয় দালাল শান্তি কমিটির সভার আয়োজন এবং মিছিল করে পাকসেনাদের অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাকসেনারা এই মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে তাদের অনেককে হত্যা করে।

আমাদের চাঁদপুর কোম্পানি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার কার্যকলাপ আরও বৃদ্ধি করে। স্থানীয় লোকদের সহায়তায় হাজীগঞ্জ এবং লাকসাম, চাঁদপুর ও কুমিল্লার সিএন্ডবি রাস্তা ও রেলওয়ে সড়কের ২০০ গজ কেটে ধ্বংস করে দেয়া হয়। এ সময়ে পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন ড্রাইভার এবং শ্রমিক এনে রাস্তা মেরামত করার চেষ্টা চালায়। আমাদের গেরিলারা এইসব পাকিস্তানি রেলওয়ে কর্মচারীদের পিটিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। এর ফলে রেল এবং সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে ২৬ জুলাই পাকবাহিনী একটি কোম্পানিকে চাঁদপুর থেকে এই এলাকায় পাঠায়। পাকসেনাদের এই কোম্পানিটি রেলওয়ে লাইনের সঙ্গে সঙ্গে লাকসামের দিকে অগ্রসর হয়। ঠাকুরবাজারের নিকট আমাদের একটি এ্যামবুশ পার্টি আগে থেকেই অবস্থান নিয়েছিল। দুপুর ২ টার সময় পাকসেনাদের এই কোম্পানিটি যখন এ্যামবুশ অবস্থানের মাঝে আসে তখন আমাদের দলটি তাদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে পাকসেনাদের একজন জেসিও সহ ২২ জন পাকসেনা আহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চাঁদপুরে পলায়ন করে। এর পরদিন আমাদের গেরিলারা মধু রেলওয়ে স্টেশনের নিকট রেলওয়ে এবং সড়কসেতু ধ্বংস করে দেয় এবং যে পাকিস্তানি ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনের জন্য আসে, তাকেও আহত করে।

আমাদের ঢাকার গেরিলা দল তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকারের একটি পার্লামেন্টারী দল বাংলাদেশের সে সময়ের পরিস্থিতি সরেজমিনে জানার জন্য ঢাকায় আসে। এই দলটি ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অবস্থান করছিল। ২৪ জুন সকাল সাড়ে সাতটায় হোটেলের ভিতরে লবীতে বসে বিমানবন্দরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠিক সে সময় আমাদের ৩ জন গেরিলা হোটেলের সামনে বারান্দায় দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায় এবং সেই পরিষদীয় দলটিকে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করায়। এর ক'দিন পর আমাদের গেরিলারা জানতে পারে যে নারিন্দার গৌরিমা মন্দিরে পাকিস্তানিদের অনেক দালাল সমবেত হয়ে আলোচনার আয়োজন করেছে। দালালেরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় আমাদের গেরিলারা আলোচনা সভায় একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রায় ২০/২৫ জন পাক দালাল হতাহত হয়। ঢাকার গেরিলা দল টিএন্ডটি বিভাগের একজন পাকিস্তানি ঊর্ধ্বতন

কর্মচারীর গাড়িতে এম-১৪ মাইন দিয়ে বুবিট্রাপ লাগিয়ে রাখে। ফলে পাকিস্তানি অফিসারটি গাড়িসুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। পাকিস্তানি অফিসাররা মাঝে মাঝে ধানমণ্ডির সাংহাই চাইনিজ রেস্টুরেন্টে সান্ধ্যভোজে আসতো। এ সংবাদ পাবার পর আমাদের ১টি গেরিলা দল ৮ জুলাই রাত ৯ টায় পাকিস্তানি অফিসাররা সেখানে আসলে তাদের উপর গ্রেনেড ছোঁড়ে। ফলে ২/৩ জন পাকিস্তানি অফিসার নিহত হয়। পাকিস্তানি পুলিশরা এ সময়ে রাতে ট্যাক্সিতে কিংবা জীপে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় পেট্রোলিং করত। এসব টহলদার পাকিস্তানি পুলিশদের এ্যামবুশ করার জন্য ঢাকার গেরিলাদল একটি পরিকল্পনা নেয়। তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবরাখবর নেয়া হয়। ১০ জুলাই একটি পাকিস্তানি টহলদার পুলিশ পার্টি ধানমন্ডি রাস্তা নং ২-এর দিকে যাচ্ছিল। গেরিলা দল একটি পার্টি তাদের পিছু নেয়। পুলিশদের পেট্রোলটি ২ নং রাস্তার মোড়ে যখন তাদের গতি কমিয়ে দেয়, ঠিক সে সময় গেরিলারা পুলিশের গাড়িতে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। এতে একজন অফিসারসহ ৫ জন পাকিস্তানি পুলিশ নিহত হয়। আমাদের গেরিলা দলটি নিরাপদে সে স্থান ত্যাগ করে। এর ক'দিন পর আমাদের আর একটি গেরিলা দল নিউ বেইলী রোডে পাক বাহিনীর একটি জীপের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৩/৪ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং জীপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত আমাদের গেরিলা দলটি পোস্ট অফিসের ভিতর বিস্ফোরণ ঘটায় এবং মণ্ডলপাড়া ও চৌধুরীবাড়ি ইলেকট্রিক সাবস্টেশনটি ১২ জুলাই রাত সাড়ে ১০ টার সময় ধ্বংস করে দেয়। এছাড়া সিদ্ধিরনগর ও আশুগঞ্জের সাথে একটি বৈদ্যুতিক পাইলন উড়িয়ে দেয়। সিদ্ধিরগঞ্জ এবং নরসিংদির মাঝে দুটি বৈদ্যুতিক পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে কাঞ্চন এবং কালীগঞ্জের বেশ কয়েকটি শিল্প কারখানা বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর ফতুল্লা এবং ঢাকার মাঝে পাগলা রেলওয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। ফলে নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকার মাঝে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে আমাদের হেডকোয়ার্টারে খবর আসে যে, পাক সরকার পাকবাহিনীর তত্ত্বাবধানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পরীক্ষাকে বানচাল করে দেয়ার জন্য আমরাও একটা পরিকল্পনা নেই। এই পরিকল্পনানুযায়ী আমার হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকার গেরিলা দলগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষার দিন সিদ্ধেশ্বরী স্কুল এবং আরো অন্যান্য স্কুলে পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গ্রেনেড বিস্ফোরণ করানো হয়। ফলে খুব কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেয়ার জন্য পরীক্ষা হলে আসে। ১৫ জুলাই রাতে একটি গেরিলা দল বকশীবাজারে অবস্থিত বোর্ড অফিস আক্রমণ করে। ডিমোলিশন দিয়ে বোর্ড ভবনের বেশ কিছু অংশ ধ্বংস করে দেয়া হয়। তার ফলে বোর্ডের বেশ কিছু দলিল এবং কাগজপত্র ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে এই পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয় এবং অনেক ছাত্রছাত্রী ইচ্ছাকৃতভাবেই পরীক্ষা বর্জন করে।

হাবিলদার গিয়াসের নেতৃত্বে আমাদের মুরাদনগেরর দলটি ১৬ জুলাই রাত ১১ টার সময় ইলিয়টগঞ্জের দেড় মাইল পশ্চিমে পুটিয়া গ্রামের সামনে কুমিল্লা-দাউদকান্দি সড়কের উপর কয়েকটি এন্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে রাখে। পরদিন সকালে পাকবাহিনীর

নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি ওয়াপদা ট্রাক মাইনের উপর বিস্ফোরিত হয়। ফলে ট্রাকটি ধ্বংস হয়ে যায়। ট্রাকে অবস্থানরত একজন পাকসেনা, দু'জন রাজাকার ও ড্রাইভারসহ সবাই নিহত হয়। পরে পাকসেনাদের আর একটি জীপ ও ট্রাক এন্টি-ট্যাংক মাইনে বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়। ফলে ৫ জন পাকসেনা, ১ জন পাক মেজর ও ৬ জন রাজাকার নিহত হয়। এই সংবাদ পেয়ে কুমিল্লা থেকে পাকসেনারা ৩০টি গাড়িতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পাকসেনাদের গাড়িগুলো ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে এসে দাঁড়ায়। সামনের গাড়ি থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পাকসেনা নেমে আস্তে আস্তে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। তারা রাস্তার পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। অগ্রসর হবার সময় আমাদের পুঁতে রাখা এন্টি-পার্সোনাল মাইনের বিস্ফোরণে তাদের ৬/৭ জন লোক নিহত হয় এবং আরও অনেক আহত হয়। এরপর পাকসেনারা আর সম্মুখে অগ্রসর হয়নি। সমস্ত দিন পাকসেনারা মাইন ডিকেক্টটরের সাহায্যে ঘটনাস্থলের চতুর্দিকে তন্ন-তন্ন করে তল্লাশী চালায়। সমস্ত বেসামরিক যাতায়াতও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পাকসেনারা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে মুক্তিবাহিনীর সন্ধানে যথেষ্ট তল্লাশী শুরু করে। হাবিলদার গিয়াসের দলের একজন নায়েক মোস্তফা কামাল স্থানীয় লোকদের সাথে মিশে পাক সেনাদের দুরবস্থা দেখে। দাউদকান্দি থেকে পশ্চিমে নারায়ণগঞ্জ এবং দাউদকান্দি সড়কের উপর বাউসিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ছিল। এই সেতুটি সম্পূর্ণ কংক্রীটের তৈরি এবং বেশ মজবুত। এই সেতুটি ধ্বংস করার জন্য জুলাই মাসের প্রথমে আমি রফিকুল ইসলাম নামে একজন বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাকে মনোনীত করি। তার সঙ্গে আরেকটি গেরিলাকে দিয়ে এই সেতুটি রেকি করার জন্য পাঠাই। রফিক সেতুটি পুঙ্খানপুঙ্খরূপে রেকি করে এবং সেতুটির একটি নকশা বানিয়ে নিয়ে আসে। এরপর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর ছেলে ভাষণের নেতৃত্বে ১০ জনের একটি ডিমোলিশন পার্টিকে রফিককে সঙ্গে দিয়ে বাউসিয়া সেতুটি ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দিই। এই দলটি প্রথম মুরাদনগরে গিয়ে তাদের স্থানীয় ঘাঁটি করে। এর পর তারা গোমতী নদী পার হয়ে বাউসিয়াতে পৌঁছে। সেখানে একদিন থাকার পর স্থানীয় গেরিলাদের সাহায্য নিয়ে ১২ জুলাই রাতে বাউসিয়া সেতুতে ডেমোলিশন লাগায় কিন্তু ডেমোলিশন বিস্ফোরণের সময় 'ইগনিশন' ঠিকমতো কাজ করে না। ইত্যবসরে স্থানীয় দালাল চেয়ারম্যান এবং রাজাকার পাক বাহিনীদের খবর দেয়। পাক বাহিনী এবং রাজাকার অকস্মাৎ ভাষণের ডিমোলিশন পার্টির উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ভাষণের দলের ৩ জন গেরিলা গুরুতরভাবে আহত হয়। এই ৩ জনের মধ্যে ১ জন স্থানীয় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাক কোরাইশীও ছিল। গেরিলা দলটি ইগনিশন কাজ না করার দরুন সেতু উড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে পাক বাহিনীর আক্রমণের চাপে অবস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। যদিও আহত গেরিলাদের সঙ্গে আনতে সক্ষম হয় কিন্তু যেসব বিস্ফোরক সেতুটিতে লাগনো হয়েছিল সেগুলো উঠিয়ে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং তারা ২৬০ পাউন্ড টিন্ডটি স্ল্যাব সেখানেই ফেলে রেখে হেডকোয়ার্টারে ফেরত আসে। এত বিরাট পরিমাণ টিএন্ডটি স্ল্যাব শত্রুর হাতে পড়া ও নষ্ট হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে একটা বিরাট ক্ষতির কারণ। ঐ সময়ে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আমাদের খুব

কম ছিল। অনেক চেষ্টার পর হয়ত কিছু কিছু আমরা যোগাড় করতে সক্ষম হতাম। ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তা বন্ধ করে দেয়া আমার লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় আমি যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং এর পরই আবার বিস্ফোরক যোগাড়ের চেষ্টায় থাকি। ২/৩ সপ্তাহ পরে অনেক কষ্টে আবার কিছু পরিমাণ টিএন্ডটি স্ল্যাব সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। টিএন্ডটি স্ল্যাব যোগাড়ের পর আমি রফিককে ডেকে পাঠাই। শেষ পর্যন্ত আমরা বাউসিয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলাম।

লাটুমুড়াতে ক্যাডেট হুমায়ুনের নেতৃত্বে যে কোম্পানি অবস্থান নিয়েছিল, সেই অবস্থানের উপর পাকবাহিনী তাদের চাপ অব্যাহত রাখে। লাটুমুড়ার উত্তরে চন্দ্রপুরে এবং ইয়াকুবপুরে পাকসেনারা তাদের অবস্থানগুলো আরও জোরদার করে তোলে এবং লাটুমুড়া অবস্থান থেকে আমাদেরকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে। ক্যাডেট হুমায়ুনের কোম্পানিটি পাকবাহিনীর প্রচণ্ড চাপের মুখে তাদের অবস্থানটি সাহসের সঙ্গে ধরে রাখে। মুক্তিযোদ্ধারা এই অবস্থান থেকে প্রায় পাকসেনাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাতে থাকে। ১৭ জুলাই বিকেল ৪ টায় আমাদের ওপি দেখতে পায় যে, লাটুমুড়া থেকে একটি শত্রুদল চন্দ্রপুর শত্রু অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। লে. হুমায়ুন কবির তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন চন্দ্রপুরের রাস্তায় পাকসেনাদের এ্যামবুশ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি চন্দ্রপুর থেকে একটু দূরে অবস্থান নিয়ে পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পাকসেনারা যখন সেই অবস্থানে পৌঁছে, ঠিক তখনই তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালানো হয়। ফলে ৪ জন পাকসেনা নিহত এবং একজন আহত হয়। পাকসেনারা এ্যামবুশ থেকে বাঁচার জন্য লাটুমুড়ায় পলায়ন করে।

২০ জুলাই সকাল ৯ টার সময় একটি প্লাটুন পাকসেনাদের ইয়াকুবপুর, চন্দ্রপুর এবং বাগাবাড়ি অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য পাঠানো হয়। এই প্লাটুনটি গোপন পথে গ্রামের ভিতর দিয়ে পাকসেনাদের অবস্থানের অতি নিকটে যেতে সমর্থ হয়। রেকি করার পর তারা দেখতে পায় যে, পাকসেনাদের কিছু লোক বিভিন্ন বাংকারের উপর বসে চা পানে ব্যস্ত এবং তাদের প্রহরার ব্যবস্থা বেশ শিথিল। এছাড়াও আরও ৩/৪ দল বাংকারের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের একজন ওপি গাছের উপর বসা ছিল। আমাদের প্লাটুনটি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে তাদের বাংকারগুলোর অতি নিকটে পৌঁছে প্রথমে তারা ওপি'কে গুলি করে গাছ থেকে ফেলে দেয় এবং অতর্কিতে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। গোলাগুলিতে যেসব পাকসেনা বাংকারের উপর বসে চা পানে ব্যস্ত ছিল এবং দাঁড়িয়েছিল, তারা সঙ্গে সঙ্গে আহত ও নিহত হয়। নিকটবর্তী একটি ঘর থেকে কিছু পাকসেনা বেরিয়ে আসে এবং বাংকারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে তারাও আহত ও নিহত হয়। এরপর পাকসেনাদের প্রতি আক্রমণ করার আগেই আমাদের প্লাটুনটি অবস্থান পরিত্যাগ করে নিজেদের এলাকায় নিরাপদে ফিরে আসে। এই সংঘর্ষের ফলে ১৩ জন পাকসেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। আমাদের একজন গুরুতররূপে আহত হয়।

শালদা নদীতে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি এবং 'সি' কোম্পানি তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকসেনারা শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন থেকে নয়নপুরের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিল। ১৭ জুলাই তাদের একটি দল

রেলওয়ে স্টেশনের প্রায় এক হাজার গজ দক্ষিণে মনোরা রেলওয়ে ব্রীজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ব্রীজের কাছে এসে পাকসেনাদের দলটি ব্রীজের চতুর্দিকে বাংকার তৈরির প্রস্তুতি নেয়। বেলা সাড়ে ১২ টার সময় 'এ' কোম্পানির একটা প্লাটুন মর্টারসহ পাকসেনাদের এই দলটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনারা সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের বেশকিছু লোক আহত ও নিহত হয়। পাকসেনারা উপায়ান্তর না দেখে আবার শালদা নদীতে পিছু হটে যায়। পরদিন সকাল ৯ টার সময় শালদা নদী থেকে পাকসেনারা আবার মনোরা ব্রীজের দিকে অগ্রসর হয়। সকাল ৯ টায় আমাদের সৈনিকরা আবার তাদের বাধা দেয় এবং পাকসেনাদের উপর মর্টার এবং কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। ফলে পাকসেনাদের ৪ জন লোক নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। পাকসেনারা আর অগ্রসর না হয়ে পিছু হটে মনোরা ব্রীজের উত্তরে অবস্থান নেয়। ১৯ জুলাই পাকসেনারা ব্রীজের দক্ষিণে আবার অবস্থান নিয়ে বাংকার খোঁড়ার চেষ্টা করে। এবারও পাকিস্তানিরা আমাদের মর্টার, কামান এবং মেশিনগানের গোলাগুলিতে অনেক হতাহত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে স্থানীয় লোকের কাছে জানা যায় যে, পাকসেনারা তাদের আহত ও নিহত সঙ্গীদের নৌকায় করে পিছনে নিয়ে যায়। এদের সঠিক সংখ্যা সম্বন্ধে তাৎক্ষণিক সংবাদ জানা না গেলেও পরে জানা যায় ৮ জন নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়। ২১ জুলাই সন্ধ্যায় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানির একটা প্লাটুন শালদা নদীর অবস্থানের ভেতর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ৮ জন পাকসেনা নিহত ও ৭ জন আহত হয়। দেড়ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের দলটি শত্রু অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এই আক্রমণের সাথে আমাদের ফার্স্ট ফিল্ড ব্যাটারী পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বহু পাকসেনাকে হতাহত করে। জুলাই মাসে কুমিল্লায় পাকসেনারা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং কিছুটা সফলও হয়েছিল। এ সময় কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন স্থানে পাকসেনারা তাদের ক্যাম্প গড়ে তুলেছিল। এসব ক্যাম্প থেকে তারা শহরে ঘন ঘন টহল চালাত। কুমিল্লায় পাকসেনাদের এই তৎপরতা খর্ব করার জন্য আমাদের গেরিলাদের ২০ জনের একটি দল একটি ৩ ইঞ্চি মর্টারসহ কুমিল্লার উত্তরে অনুপ্রবেশ করে। ২০ জুলাই সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গেরিলাদের এই দলটি কুমিল্লা শহরে পাকসেনাদের বিভিন্ন অবস্থানের উপর মর্টারের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করে। একটি গোলা আজাদ স্কুলে, একটি গোলা সাধনা ঔষধালয়ের নিকটে, একটি গোলা গোয়ালপট্টিতে, একটি গোলা কালিবাড়ির নিকটে এবং একটি গোলা এসডিও-র অফিসের নিকটে বিস্ফোরিত হয়। গোলাগুলো বিস্ফোরণের ফলে পাকসেনাদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে ছুটাছুটি করতে থাকে। বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সদ্য আগত সেনারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। অনেক পাকসেনা স্থানীয় লোকদের নিকট সেনানিবাসের রাস্তা জানতে চায়। আবার অনেকে ভয়ে ব্রীজের তলায় লুকিয়ে পড়ে। আবার কুমিল্লাতে যখন গেরিলারা তাদের তৎপরতা চালাচ্ছিল ঠিক সে সময়ে গেরিলাদের আর একটি দল চাঁদপুরেও তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১৭ জুলাই রাত ১০ টায় বাবুরহাটের পূর্বে

কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তায় আশীকাটি গ্রামের নিকট পাকসেনাদের একটি কনভয় যখন যাচ্ছিলো তখন আমাদের গেরিলারা গাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে ৮ জন পাকসেনা নিহত এবং আরও অনেক আহত হয়। ১৯ জুলাই দুপুর ১ টার সময় বাবুরহাটে পাকসেনাদের একটি গাড়ির উপর গেরিলারা গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এর ফলে ৫ জন পাকসেনা নিহত ও ৭ জন আহত হয়।

১১ জুলাই বিকেল সাড়ে ৬ টায় ২ জন গেরিলা চাঁদপুর পাওয়ার স্টেশনের সামনে পাহারারত ২ জন পাকসেনা ও ২ জন পাকিস্তানি পুলিশের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের নিহত করে।

চাঁদপুরে শান্তি কমিটির দালালদের একটি আলোচনা সভায় গ্রেনেড নিক্ষেপ করার পর ৭ জন দালাল আহত হয়। এছাড়াও ইলিয়টগঞ্জ পাকসেনাদের স্থানীয় এক দালালের লঞ্চে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এ সমস্ত কার্যকলাপের ফলে স্থানীয় লোকদের মনোবল আবার বেড়ে যায়। তারা মুক্তিবাহিনীর উপর আবার আস্থা ফিরে পায়।

কসবার উত্তরে কাসিমনগর রেলওয়ে সেতুর নিকট পাকিস্তানিদের দুটি প্লাটুন অবস্থান নিয়ে সেতুটি প্রহরার কাজে নিযুক্ত ছিল। এই সেতুটিকে ধ্বংস করার জন্য আমি ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে নির্দেশ দেই। নির্দেশ পাওয়ার পর ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন সেতুটি রেকি করার জন্য ডিমোলিশন এক্সপার্টসহ একটি রেকি পার্টি পাঠায়। এই রেকি পার্টি শত্রুর অবস্থান সম্বন্ধে এবং সেতুটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবরাখবর নিয়ে আসে। এরপর ১৮ জুলাই রাত ২ টায় একটি রেইডিং প্লাটুন ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে কাশিমপুর সেতুর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাত ৮ টার সময় সেতুটির নিকটবর্তী পাক অবস্থানের উপর প্লাটুনটি আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১৭ জন পাকসেনা নিহত এবং যারা বেঁচেছিল তারা অবস্থানটি পরিত্যাগ করে খাইরাতুল্লাতে পালিয়ে যায়। আমাদের রেইডিং পার্টি সেতুটিকে বিস্ফোরণ লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের অবস্থান থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। আমি যখন কুমিল্লা ও নোয়াখালী এলাকায় যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম, সে সময় শত্রুদের খবরাখবর নেবার জন্য একটি ইন্টেলিজেন্স নেট স্থাপন করি। এদের দায়িত্ব ছিল শত্রুদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর আমাদের নিকট প্রেরণ করা। বিশেষ করে এইসব ইন্টেলিজেন্স-এ এমন কতকগুলো লোক কাজ করত যাদের সম্বন্ধে কিছু কথা বলা দরকার। যেমন লাতু মিয়া। সে কুমিল্লা সেনানিবাস হাসপাতালে মালীর কাজ করতো। সে আমাদের খবর পাঠায় সেনানিবাসে পাকসেনাদের দুটি ব্রিগেড আছে এবং সেখানে একটা ডিভিশন হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ৫০০/৬০০ রাজাকার এবং ৫০০ রেঞ্জার মোতায়েন করা হয়েছে। সে আরও খবর পাঠায় কুমিল্লা সেনানিবাসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুবই মজবুত করা হয়েছে এবং প্রতিরক্ষা ব্যূহ সেনানিবাসের বাইরে উত্তরে গোরা কবরস্থান পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে। কুমিল্লা বিমানবন্দরেও একটি ব্যাটালিয়ন শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করেছে।

কুমিল্লা এবং নোয়াখালী এলাকায় পাকসেনাদের শক্তি এক ডিভিশনেরও বেশি। কিন্তু পাকসেনাদের এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের মনোবল বেশ কমে গেছে। সাধারণ

সিপাইরা এই যুদ্ধে নৈরাশ্যজনক ফলাফল সম্বন্ধে মন্তব্য করত। তাদেরকে জোর করে যুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেজন্য তারা যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করতো। তাদের মধ্যে পলায়নপর মনোভাব খুবই প্রবল। তারা যুদ্ধ এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে খুবই ইচ্ছুক। আমাদেরকে আরও খবর পাঠায় যে পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশি। শুধু সেনানিবাস হাসপাতালেই প্রায় ৫০০/৬০০ জন আহত সৈনিক চিকিৎসাধীন আছে। হাসপাতালে স্থানের অভাবে তাঁবুর ভিতরে অনেক আহত সৈনিককে রাখা হয়েছে এবং গুরুতর আহত সৈনিকদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। আহতের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার জন্যেও সাধারণ সৈনিকদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল। কুমিল্লা শহরে আমাদের এবং পাকিস্তানিদের তৎপরতার ফলে লোকজন শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক শহরবাসী পরিচয়পত্র ছাড়া শহরে বের হতে পারছে না। কুমিল্লার উত্তরে পাকসেনারা আমাদের কোটেশ্বর অবস্থান পুনর্দখলের জন্য চেষ্টা চালায়। ২৪ জুলাই পাকসেনাদের একটি কোম্পানি গোঙ্গজপার হয়ে কোটেশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সকাল ১০ টায় পাকসেনাদের কোম্পানিটি যখন আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের সামনে পৌঁছে যায়, তখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা তাদের উপর মর্টার এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে তাদের অগ্রসরে বাধা দেয়। আমাদের গোলাগুলিতে পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবুও পাকসেনারা তাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও সাহসের সঙ্গে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে পাকসেনারা আক্রমণ পরিত্যাগ করে দু'ঘণ্টা পরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষের ফলে পাকসেনাদের ১৫ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা সমস্ত দিন আমাদের অবস্থানের উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করে।

ঐ দিনই কোটেশ্বর এবং কসবা অবস্থান থেকে দুই দল গেরিলা বুড়িচং থানার নিকট একটি সড়কসেতু, তিনটি বিদ্যুৎ পাইলন এবং কসবার নিকট একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। বিলোনিয়াতে আমাদের সৈন্যরা যখন পাকিস্তানিদের সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত এবং পাকিস্তানিরা ফেনীর দিক থেকে বিলোনিয়া ব্রীজে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল ঠিক সেই সময় পাকসেনারাও আমাদের পিছনে ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তারা কিছুসংখ্যাক দালালকে এই কাজে নিয়োগ করে। এইসব দালালকে মাইনসহ আমাদের অবস্থানের পিছনে পাঠায়। দালালরা আমাদের লাইনের পিছনে রাস্তায় ৬ টা এন্টি-পার্সোনাল এবং ৯ টা এন্টি-ট্যাংক মাইন লাগায়। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের সতর্কতার জন্য এই এন্টি-ট্যাংক মাইনগুলোতে আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। মাইন পোতার খবরটি একজন স্থানীয় লোক আমাদের বিলোনিয়া হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়। খবর পাওয়া মাত্র হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের একটি ডিমোলিশন বিশেষজ্ঞ দল গাইডের সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ মাইনগুলো নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আমরা স্থানীয় লোকদের পাকিস্তানি ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে বলি। এরপর যখনই পাকিস্তানি দালালরা এ রকম ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য আমাদের অবস্থানের পিছনে আসার চেষ্টা করেছে, স্থানীয় জনগণ তাদের সে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। জুলাই

মাসের শেষের দিকে লে. মাহবুব তার সাব-সেক্টর মিয়ারবাজার, চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ ইত্যাদি এলাকাতে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে তৎপরতা জোরদার করে। পাকসেনারা মিয়ারবাজারে যে ক্যাম্প করেছিল সেখান থেকে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তা আবার খোলার চেষ্টা করে। লে. মাহবুব মিয়ারবাজার শত্রু ক্যাম্পটি রেইড করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩ জুলাই লে. মাহবুব ১৫ জনের একটি কমান্ডো প্লাটুনকে মিয়ারবাজারে পাকসেনাদের ক্যাম্প রেইড করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই দলটি সন্ধ্যায় মিয়ারবাজারের নিকট পৌঁছে যায়। সেখান থেকে তাদের একটি ছোট রেকি দল পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর সংগ্রহ করে। রাত ১২ টায় কমান্ডো দলটি গোপন পথে অগ্রসর হয়ে শত্রুর অবস্থানের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এই অতর্কিত হামলার জন্য পাকসেনারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। আমাদের কমান্ডো দলটি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে পাকসেনাদের বেশ কয়েকটি বাংকার গ্রেনেড ছুঁড়ে উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা আক্রান্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং আমাদের সৈনিকদের গুলিতে প্রায় ২০ জন নিহত হয় এবং ১০ জন আহত হয়। একঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর আমাদের কমান্ডো দলটি পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। শত্রুসেনাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে চলে আসে। চাঁদপুরে পাকিস্তানিরা তাদের ঘাঁটি আরও শক্তিশালী করে তোলে। চাঁদপুরের এই ঘাঁটি থেকে তারা বিভিন্ন জায়গায় গাড়িতে পেট্রোলিং করত। পেট্রোলিংয়ের জন্য ২/৩টি জীপ এবং ২/৩টি ৩ টন ট্রাক কনভয়-এর আকারে ব্যবহার করতো। এইসব পেট্রোলিং ভোরে, দুপুরে, সন্ধ্যায় এবং রাত ১২ টার পর পাকসেনারা চালাতো এবং প্রত্যেক গাড়ির ব্যবধান ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে। এই সংবাদ স্থানীয় গেরিলা লে. মাহবুবের কাছে পৌঁছায়। খবর পেয়ে লে. মাহবুব দুটি প্লাটুন ২০ জুলাই চাঁদপুরের পূর্বে পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুন দুটি চাঁদপুর থানার আশীকাটির নিকট এ্যামবুশ পাতে। পরদিন ভোর ৫ টায় চাঁদপুর থেকে একটি পেট্রোল কনভয় আশিকাটির দিকে অগ্রসর হয়। কনভয়টি যখন এ্যামবুশ অবস্থানের মাঝে পৌঁছে যায় ঠিক তখনই আমাদের এ্যামবুশ পার্টি মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে গুলি চালায়। এর ফলে কনভয়-এর প্রথম তিনটি জীপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রাস্তা থেকে পড়ে যায় এবং অবশিষ্ট গাড়িগুলোরও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করা হয়। পাকসেনারা গাড়ি থেকে নেমে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে তাদের অন্তত ১০ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়। পাকসেনারা গুলির মুখে টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। ঐদিন আশিকাটির ৩ মাইল পশ্চিমে সন্ধ্যায় আমাদের আর একটি এ্যামবুশ পার্টি পাকসেনাদের আর একটি কনভয়কে এ্যামবুশ করে। ফলে পাকসেনাদের ৩ জন নিহত এবং ৫ জন আহত ও একটি ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমাদের এ্যামবুশ পার্টির হস্তগত হয়। এছাড়া একটি মটর সাইকেলও দখল করে নেয়। এ্যামবুশের খবর পেয়ে পাকসেনারা তাদের হাজীগঞ্জ ক্যাম্প থেকে একটি শক্তিশালী কোম্পানি আমাদের এ্যামবুশ পার্টিকে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই কোম্পানিটি একঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ততক্ষণে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি সংঘর্ষ শেষে মোটামুটি

প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিল। পাকসেনারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি আবার তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এর ফলে পাকসেনাদের ১২ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। এরপর আমাদের দলটি অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে। পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল হাজীগঞ্জের নিকট নরসিংপুরে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘাঁটি থেকে পাকসেনারা ঐ এলাকার চতুর্দিকে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এই ঘাঁটিকে আক্রমণ করার জন্য লে. মাহবুব নিয়মিত ও গণবাহিনীর একটি সম্মিলিত কোম্পানি পাঠিয়ে দেয়। এই কোম্পানিটি ১৭ জুলাই তারিখে হাজীগঞ্জের দক্ষিণে তাদের অস্থায়ী গোপন অবস্থান তৈরি করে। এরপর পেট্রোল পাঠিয়ে পাকসেনাদের অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য যোগাড় করে। ১৭ জুলাই সন্ধ্যায় আমাদের কোম্পানিটি অতর্কিতে পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ১৩ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়। এরপর আমাদের কোম্পানিটি নিরাপদে নিজ অবস্থানে ফিরে আসে।

ফরিদপুরে আমাদের গেরিলা দল তাদের কার্যকলাপ জুন মাস থেকে চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন বেসামরিক শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অচল করে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ জুন গেরিলারা চিকানদী তহশীল এবং মুন্সেফ অফিস ধ্বংস করে সমস্ত অফিসিয়াল কাজগপত্র জ্বালিয়ে দেয়। ১৮ জুলাই একটি গেরিলা দল গোসাইরহাট থানার দামুদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির উপর আক্রমণ চালিয়ে ফাঁড়িটি ধ্বংস করে দেয়। ফাঁড়ি থেকে ৫টি রাইফেল, প্রচুর গুলি এবং একটি অয়্যারলেস সেট দখল করে নেয়। গেরিলা দল দামুদিয়া তহশীল অফিস ও সার্কেল অফিস জ্বালিয়ে দেয়। এই ঘটনার দুইদিন পর আর একটি গেরিলা দল ভেদেরগঞ্জ থানা আক্রমণ করে দুইজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশকে আহত করে এবং একটি অয়্যারলেস সেট হস্তগত করে। সঙ্গে সঙ্গেই তহশীল অফিস ও পালং থানার আঙ্গারিয়া বাজারে জুট গোডাউনে আগুন লাগিয়ে ২৫ হাজার মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়। গেরিলারা আঙ্গারিয়া তহশীল অফিসও জ্বালিয়ে দেয়। এসব কার্যকলাপের ফলে মাদারিপুরের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে যায়।

শালদা নদীতে এবং মন্দভাগে ক্যাপ্টেন গাফফার এবং মেজর সালেক পাকবাহিনীকে বারবার আঘাত করতে থাকে। আমাদের রেকি পার্টি খবর নিয়ে আসে যে, ২৪ জুলাই বিকেল ৩ টার সময় পাকসেনারা নওগাঁও স্কুলে স্থানীয় দালালদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। এই সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন গাফফার একটি প্লাটুন মর্টারসহ নওগাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়। বিকেল ৫ টায় পাকসেনাদের ৫০/৬০ জন লোক ও স্থানীয় দালালরা স্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে তাদের আলোচনা সভা শুরু করে। সভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই আমাদের প্লাটুনটি মর্টারের সাহায্যে পাকসেনাদের এই সমাবেশের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ফলে আলোচনা সভা ভেঙ্গে যায় এবং পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পাকসেনাদের ৩০ জন লোক ৭ জন দালালসহ নিহত হয়। আমাদের প্লাটুনটি নিরাপদে ফিরে আসে। পাকসেনারা শালদা নদীর দক্ষিণে মনোরা ভাঙ্গা রেলওয়ে সেতুটি মেরামত করার জন্যে আবার চেষ্টা চালায়। ২৬ জুলাই সকাল ১০ টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল তাদের শালদা নদী অবস্থান থেকে

মনোরা সেতুর নিকট সমবেত হয়। এরপর সেতুর চতুর্দিকে তারা বাংকার তৈরির প্রস্তুতি নেয়। সংবাদ পেয়ে মেজর সালেক মর্টারসহ একটি প্লাটুন পাকসেনাদের মনোরা সেতু থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। বিকেল ৪ টায় আমাদের দলটি অবস্থান নেয় এবং পাকসেনাদের উপর মর্টার এবং মেশিনগানের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আমাদের গোলাগুলিতে পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অনেক হতাহত হয়। মনোরা সেতু থেকে তারা পালিয়ে যায়। পরে বিশ্বস্তসূত্রে আমরা জানতে পারলাম যে, পাকসেনাদের কমপক্ষে ৪ জন নিহত এবং অনেক আহত হয়েছে।

২৬ জুলাই ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন একটা এ্যামবুশ পার্টি নওগাঁও এবং আকসিনার মাঝামাঝি রাস্তায় এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনাদের একটি দল নওগাঁর পথে সেই এ্যামবুশ-এ পড়ে যায়। ফলে ৭ জন পাকসেনা নিহত ও ৪ জন আহত হয়। আমাদের একজন গুরুতরভাবে আহত হয়। প্লাটুনটি ফেরার পথে কল্যাণসাগরে আবার একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকসেনাদের একটি কোম্পানি সাইদাবাদ থেকে কসবার পথে সেই এ্যামবুশে পড়ে যায়। ফলে ২১ জন পাকসেনা ও ১ জন দালাল নিহত হয় এবং ৯ জন আহত হয়। পাক পেট্রোল পার্টির একটি ট্রাকও ধ্বংস হয় ঐ দিনই। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের একটি কমান্ডো দল বগাবাড়িতে একটি রেলওয়ে ব্রীজ ও ২/৩টি টেলিফোন পাইলন উড়িয়ে দেয়। আমরা যেসব গেরিলাদের ঢাকা এবং কুমিল্লার পশ্চিম ও ভৈরববাজার এলাকায় পাঠাতাম তারা কসবার উত্তর দিক দিয়ে ছতোরা ও নবীনগর হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অনুপ্রবেশ করতো। এসব গেরিলাদের সম্বন্ধে এবং আমাদের নিয়মিত বাহিনীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে খবরাখবর নেয়ার জন্য পাকসেনারা দালালদের নিযুক্ত করে এবং আমাদের অনুপ্রবেশের রাস্তাকে বন্ধ করার জন্য রাজাকারদের রাস্তায় এবং নদীপথে পাহারায় মোতায়েন করে। এই সব দালাল এবং রাজাকাররা আমার অপারেশনের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করে। দালালদের ধরার জন্য এবং রাজাকারদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন ও লে. হারুনকে আমি নির্দেশ দিই। নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন এবং লে. হারুন বিভিন্ন স্থানে তাদের লোকজনকে দালালদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয় এবং এ্যামবুশ পেতে রাখে। ২৫ জুলাই সন্ধ্যায় নরসিংহের নিকট লে. হারুনের লোক পাকসেনাদের ৬ জন দালালকে এ্যামবুশ করে বন্দি করে। এদের নিকট ১৪ পাউন্ড বিস্ফোরক, তিনটি গ্রেনেড পাওয়া যায়। এর পরদিন আরও ৭ জন দালাল আমাদের এ্যামবুশে ধরা পড়ে এবং তাদের কাছ থেকে দুইটি রাইফেল, ৪টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ১টি অয়্যারলেস সেট এবং ১২০ রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়। এরপর থেকে দালালরা আমাদের এলাকাতে আর আসার সাহস পায়নি। বন্দি দালালদের কাছ থেকে জানা যায় যে তাদেরকে পাকিস্তানি অফিসাররা প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং সঙ্গে করে এনে মুক্তিবাহিনী অবস্থানের নিকট ছেড়ে দেয়। তাদের উপর নির্দেশ ছিল মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, অন্যথায় তাদের পরিবারবর্গের উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরপর রাজাকারদের শায়েস্তা করার জন্য ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন একটি কোম্পানি পাঠিয়ে দেয়। এই কমান্ডো কোম্পানিটি ছতোরার নিকট রাজাকার ক্যাম্পের উপর ২৫ জুলাই অতর্কিত হামলা

চালায়। হামলার ফলে ১৬ জন রাজাকার নিহত এবং ৬ জন আহত হয়। ঐ এলাকার রাজাকাররা ভীত হয়ে সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। তারা পরদিন তাদের নেতাকে আমাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় এবং মুক্তিবাহিনীর সাথে সহায়তা করার অঙ্গীকার করে। এছাড়া অনেক রাজাকার মুক্তিবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপর থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই এলাকার রাজাকারদের সক্রিয় সহায়তা মুক্তিবাহিনী সব সময় পেয়েছে। অনেক সময় রাজাকাররাই আমাদের গেরিলাদেরকে নিরাপদ রাস্তায় তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়েছে। সিএন্ডবি রাস্তায় যে সেতুর নিচ দিয়ে আমাদের গেরিলারা নৌকায় যাতায়াত করতো রাজাকাররা সেই সেতুর উপর পাকবাহিনীর গতিবিধি সম্বন্ধে সংকেত দিত। কোনো সময় যদি পাকসেনারা ঐ জায়গায় টহলে আসত তবে আগে থেকে হারিকেনের লাল আলো বা টর্চের সাহায্যে সংকেত দিয়ে আমাদের জানাতো। এর ফলে এই রাস্তাটি আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়।

মেজর সালেক একটি ডিমোলিশন পার্টি ও একটি কমান্ডো প্লাটুনকে ২৮ জুলাই রাত ২ টার সময় হরিমঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। এই দলটি হরিমঙ্গলের নিকটে রেলওয়ে সেতুটির রেকি করে এবং সকাল সাড়ে ৬ টা পর্যন্ত ডিমোলিশন বানিয়ে সেতুটিকে উড়িয়ে দেয়। বিস্ফোরণের ফলে সেতুটির মাঝখানে ৪০ ফুটের একটি গ্যাপ সৃষ্টি হয়। এছাড়া সেতুটির দক্ষিণ পাশে ২৭০ ফুট রেলওয়ে লাইন বারুদ লাগিয়ে নষ্ট করে দেয়া হয়। এর পরদিন এই ডিমোলিশন পার্টি বিজনা রেলওয়ে সেতুটি বিস্ফোরক লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ২৮ জুলাই সকাল ৮ টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল বিজনা ব্রীজের নিকটে পরিদর্শনে আসে। ঠিক সেই সময় আমাদের কামান তাদের উপর গোলাগুলি করে। ফলে পাকসেনাদের ৩ জন নিহত ৭ জন আহত হয়। পাকসেনারা সেই অবস্থান পরিত্যাগ করে গ্রামের দিকে পলায়ন করে। এরপর ১ আগস্ট পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী কোম্পানি হরিমঙ্গল সেতুর নিকট অগ্রসর হয় এবং সেখানে তাদের ঘাঁটি করার চেষ্টা করে। এবারও আমাদের সৈন্যরা তাদের অগ্রসরে বাধা দেয়। আমাদের সৈন্যদের গোলাগুলিতে পাকসেনাদের ৩০ জন হতাহত হয়। ফলে পাকসেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

কসবার টি. আলীর বাড়িতে পাকসেনাদের যে অবস্থান ছিল, সে অবস্থান থেকে পাকসেনারা চাউল পর্যন্ত প্রায়ই যাতায়াত করতো। এই সংবাদ লাটুমুড়ার নিকট লে. হুমায়ুন কবির সংগ্রহ করে। সে আরও জানতে পারে যে কাঁচা রাস্তায় পাকসেনাদের কমপক্ষে একটি কোম্পানি যাতায়াত করে। পাকসেনাদের এই দলকে আক্রমণ করার জন্য লে. কবির একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি কল্যাণসাগরের নিকট ২৩ জুলাই ভোর সোয়া ৪ টায় এ্যামবুশ নিয়ে পাকসেনাদের অপেক্ষায় থাকে। দু'ঘণ্টা অপেক্ষার পর পাকসেনাদের একটি বিরাট দল এই এ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের যোদ্ধাদের অতর্কিত গুলির আঘাতে পাকসেনাদের ২০ জন নিহত ও ৮ জন আহত হয়। ১ জন স্থানীয় দালাল, যে পাকসেনাদের পথনির্দেশক ছিল, সেও মারা যায়। ২/৩ ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং আমাদের লোকেরা অবস্থান তুলে নিজ ঘাঁটিতে ফেরত আসে।

কসবার উত্তরে পাকসেনাদের গোসাইস্থানে একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটিতে অন্তত ৪০/৫০ জন পাকসেনা অবস্থান করছিলো। আমাদের যেসব গেরিলা ঢাকার পথে যাতায়াত করতো, এই অবস্থান থাকাতে তাদের যাতায়াতের গোপন পথ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দিয়ে যাতায়াতের গোপন পথ নিরাপদ করার জন্য আইনউদ্দিন ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানিকে পাঠায়। 'ডি' কোম্পানি ৩১ জুলাই রাত ১০ টার সময় দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হয়ে গোসাইস্থান অবস্থানের নিকটে পৌঁছে। এই অবস্থানটি রেকি পূর্বেই করা ছিল। পাকসেনাদের অবস্থানটির দক্ষিণ হতে 'ডি' কোম্পানি অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। আক্রমণ ২/৩ ঘণ্টা চলে। 'ডি' কোম্পানির সৈন্যরা বেশ কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করে দেয় এবং অন্তত ২০ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। আক্রমণের প্রবল চাপে টিকতে না পেরে পাকসেনারা গোসাইস্থান পরিত্যাগ করে পিছনে পালায়ন করে।

শালদা নদীতে আমাদের সঙ্গে পাকসেনাদের সংঘর্ষ পুরো জুলাই মাস চলতে থাকে। ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে শালদা নদীর শত্রু অবস্থানটির উত্তর দিকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি মোটামুটি ঘিরে ফেলেছিল। এদিকে দক্ষিণ দিকে আগরতলা ও কাটামোড়ায় মেজর সালেক ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি দিয়ে পাকসেনাদের শালদা নদী অবস্থানের উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। পাকসেনাদের পিছন থেকে সরবরাহের রাস্তা একমাত্র নদী ছাড়া সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নদীপথেই লুকিয়েই মাঝে মাঝে পাকসেনাদের অবস্থানে রসদপত্র সরবরাহ করা হতো। এই সরবরাহ পথে পাক সেনাদের এ্যামবুশ করার জন্য মেজর সালেক একটি প্লাটুন গোপন পথে শত্রুসেনাদের অবস্থানের পিছনে পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি ১ আগস্ট রাতে শালদা নদীর পশ্চিমে নদীর উপর এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। রাত ১ টার সময় ৭/৮টি নৌকায় প্রায় ১৫০ জন সৈন্য ও অন্যান্য সরবরাহসহ পাকসেনারা তাদের শালদা নদী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। নৌকাগুলো যখন এ্যামবুশ অবস্থানের ভিতরে আসে আমাদের প্লাটুনটি মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটি নৌকা ডুবে যায়। পাকসেনারাও পিছন হতে পাল্টা গোলাগুলি শুরু করে। সংঘর্ষ প্রায় আধা ঘণ্টা স্থায়ী থাকে। এরপর পাকসেনাদের পিছনের নৌকাগুলো ফেরত চলে যায়। এই সংঘর্ষে পাকসেনাদের প্রায় ৬০/৭০ জন হতাহত হয়, ৪/৫ নৌকা ডুবে যায় এবং অনেক রসদ নষ্ট হয়। নৌকার আরোহী পাকসেনারা ডুবে যায়। পাকসেনাদের গুলিতে আমাদের ৪ জন নিহত ও একজন আহত হয়।

কুমিল্লার উত্তরে কলাছড়া চা বাগানের নিকট পাকসেনাদের একটি ঘাঁটি ছিল। এখানে মাসাধিককাল ধরে পাকসেনা ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছিল। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে পাকসেনারা কলাছড়া চা বাগান অবস্থানে বাংকার তৈরি করে। ২ আগস্ট রাত ১২ টার সময় লে. হারুনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল শত্রু অবস্থানের উপর হামলা চালায়। পাকসেনাদের এক কোম্পানি সৈন্য কামান এবং মর্টারের সহায়তায় শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছিল। ২ আগস্ট মুক্তিবাহিনীর অসম সাহসী ক্ষুদ্র দলটি হ্যান্ড গ্রেনেড ও ৩০৩ রাইফেলের সাহায্যে

আক্রমণ চালায়। গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত্রুদের ১০টি বাংকার ধ্বংস করে দেয়। পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ৫০ জন নিহত সঙ্গীকে ফেলে পিছনে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। সেখানেও গ্রামের লোক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অনেক পাকসেনা নিহত হয়। দুইজন পাকসেনা আমাদের হাতে বন্দি হয়। MG1A3 মেশিনগানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং ২০/২৫ হাজার গুলি আমাদের হস্তগত হয়। এছাড়া অনেক খাদ্যসামগ্রী ও কাপড় আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের পক্ষে দুইজন মুক্তিসেনা নিহত হয়। জুলাই মাসে নোয়াখালীতে অপারেশনের জন্য ১৪ জন গণবাহিনীর গেরিলা গোপন পথে চৌদ্দগ্রামের আলকরা বাজার হয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। রাত ১ টার সময় বাজারের নিকটে শত্রুদের একটি দল অতর্কিতে গেরিলাদের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের গেরিলারা সাহসের সঙ্গে আক্রমণের মোকাবিলা করে কিন্তু শত্রুদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সংঘর্ষে আমাদের একজন গেরিলা নিহত ও কয়েকজন আহত হয় এবং বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে তারা পালিয়ে আসে। হাবিলদার গিয়াসের নেতৃত্বে যে দলটি হোমনা থানায় অবস্থান করছিল, সেই দলটি ২৮ জুলাই রাতে হোমনা থানার সাঘুটিয়া (হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, রামচন্দ্রপুরের সঙ্গমস্থল) লঞ্চঘাটে পাকবাহিনীর টহলদার একটি লঞ্চের উপর এ্যামবুশ করার জন্য অবস্থান নেয়। ১৩ ঘণ্টা অবস্থানের পর উক্ত টহলদারী লঞ্চটি হাবিলদার গিয়াসের এ্যামবুশের ফাঁদে আটকা পড়ে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হাবিলদার গিয়াসের দল আকস্মিকভাবে শত্রুদের উপর হামলা চালায়। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর্যন্ত পাকসেনারা কোনো জবাব দেয় না। দুর্ভাগ্যবশত রকেট লঞ্চার কাজ না করায় সুবেদার গিয়াসের দল লঞ্চটাকে ডুবাতে সক্ষম হয়নি। ১ ঘণ্টা ধরে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে। পাকসেনারা বিক্ষিপ্তভাবে মর্টারের গোলা ছুঁড়তে থাকে। হাবিলদার গিয়াসের দলের এতে কোনো ক্ষতি হয়নি। ১ ঘণ্টা সংঘর্ষের পর পাকসেনাদের লঞ্চটি পালিয়ে যায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছে ধাওয়া করে। পাকসেনাদের হতাহতের সংবাদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা না গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, ক্ষতবিক্ষত লঞ্চটি দেড়ঘণ্টা হোমনা থানার ঘাটে নোঙ্গর করে থাকে। সেখানে বেশকিছু আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় এবং অবশেষে অনেক মৃতদেহসহ লঞ্চটি ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করে। জুলাই মাসে পাকসেনারা চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রোড খুলতে চেষ্টা করে। এই সময় মাঝে মাঝে পাকসেনাদের শক্তিশালী দল এই রাস্তায় টহল দেয়ার জন্যে আসতো। চৌদ্দগ্রামের উত্তরে ও দক্ষিণে লে. ইমামুজ্জামান এইসব পাকসেনাদের টহলদারী দলগুলোকে তাড়িয়ে দিত।

৩০ জুলাই সকাল ৭ টায় লে. ইমামুজ্জামানের একটি প্লাটুন চৌদ্দগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে নানকারা নামক স্থানে এ্যামবুশ পাতে। এ্যামবুশ পার্টি সারাদিন অপেক্ষা করার পর জানতে পারে যে, জগন্নাথ দিঘীর নিকট একটি জীপ টহলে বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এই জীপকে এ্যামবুশ করার জন্যে এ্যামবুশ পার্টি তখনই তৈরি হয়ে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার সময় পাক-বাহিনীর এই জীপটি চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশ অবস্থানে পৌঁছে। পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে এ্যামবুশ পার্টি জীপটির

উপর মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগান থেকে গুলি চালায়। গুলিতে ড্রাইভার আহত হয়। ৬ জন পাকসেনা জীপ থেকে লাফিয়ে নিচে নামে কিন্তু তারাও আমাদের এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে নিহত হয়। পরে এ্যামবুশ পার্টি একটি মৃত পাকসেনার পকেটে একটি চিঠি পায়। তা থেকে জানা যায় যে এই পাকসেনারা ২৯ বেলুচ রেজিমেন্টের 'সি' কোম্পানির লোক। নিহত পাকসেনাদের নিকট হতে রাইফেল এবং যথেষ্ট গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। একজন আহত পাকসেনা আমাদের হাতে বন্দি হয়। এই এ্যামবুশের পর পাকসেনারা কুমিল্লা থেকে আরও সৈন্য চৌদ্দগ্রামে নিয়ে আসে এবং সারারাত ধরে আমাদের অবস্থানের উপর মর্টার এবং কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। আমাদের লোকেরাও শত্রু অবস্থানের উপর মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে। পরদিন ৩১ জুলাই সকালে পাকিস্তানিদের একটি কোম্পানি চৌদ্দগ্রাম থেকেও আর একটি কোম্পানি জগন্নাথ দিঘী থেকে ট্রাঙ্ক রোড হয়ে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাকসেনারা যখন আমাদের অবস্থানের ২০০ গজের মধ্যে পৌঁছে, তখনই আমাদের এ্যামবুশ অবস্থান থেকে তাদের উপর অতর্কিত গুলি চালানো হয়। গুলির আঘাতে ২০ পাকসেনা রাস্তায় উত্তরে এবং ৬ জন দক্ষিণে আহত ও নিহত হয়। পাকসেনারা কামানের গোলার সহায়তায় পিছনে সরে যেতে থাকে। এই সময়েও আমাদের গুলির আঘাতে তাদের আরও কিছু সৈন্য হতাহত হয়। এরপর আমাদের এ্যামবুশ পার্টি সেই অবস্থান পরিত্যাগ করে হরিশ্বরদার হাটের নিকট নতুন অবস্থান নেয়। এর দুইদিন পর ২ আগস্ট সকাল ৭ টায় পাকসেনাদের একটি ব্যাটালিয়ন উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম হতে হরিশ্বরদার হাটের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময়ে আমাদের অবস্থানে লে. ইমামুজ্জামান আরও দুটি প্লাটুন পাঠিয়ে অবস্থানটি শক্তিশালী করে। পাকসেনারা হরিশ্বরদার হাটের নিকট অবস্থিত তিনটি ভাঙ্গা সেতু পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সেখানে পিছন থেকে আরও সৈন্য একত্রিত করে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টিটি শত্রুদের একত্রিত পেয়ে তাদের উপর অতর্কিতে গোলাগুলি চালায়। এই গোলাগুলি সমস্ত দিন ধরে চলে। পাকসেনারা কামানের গোলার সাহায্যে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের কোম্পানিটিও সাহসের সঙ্গে পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে থাকে। সমস্ত দিনের যুদ্ধে পাকসেনাদের ২৫ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা ২ আগস্ট রাতে প্রধান সড়কের উপর তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। এর পরদিন ৩ আগস্ট সমস্ত দিন ধরে পাকসেনাদের সাথে সংঘর্ষ চলে। ঐদিন সন্ধ্যায় আমাদের কোম্পানিটি অবস্থান পরিত্যাগ করে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় সুদৃঢ় ঘাঁটি করে অবস্থান করছিল। অনেক সময় এই অবস্থানের সঙ্গে অতীতে আমাদের যথেষ্ট সংঘর্ষ হয়। পাকসেনারা এই ঘাঁটিকে আরও বাড়িয়ে শালদা নদীর অবস্থান পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছিল। মেজর সালেক পাকসেনাদের নয়নপুর ঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ঘাঁটিতে পাকসেনাদের অন্তত এক কোম্পানির চেয়ে বেশি সৈন্য ছিল। পাকসেনারা স্টেশন ও নিকটবর্তী রেলওয়ে গুদাম এলাকায় তাদের সুদৃঢ় বাংকার তৈরি করে। মেজর সালেক পাকসেনাদের এই অবস্থানটি সম্বন্ধে বিস্তারিত

খবরাখবর সংগ্রহ করে। এরপর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি এবং কিছুসংখ্যক গণবাহিনী নিয়ে রাত সাড়ে ১২ টার সময় পাকসেনাদের অবস্থানের নিকট জমায়েত হতে থাকে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত আড়াইটার সময় স্টেশনের উত্তর দিক থেকে দুটি প্লাটুন একসাথে পাক অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। একটি প্লাটুন স্টেশনের ২০০ গজ উত্তরে রেললাইন পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এই সময়ে পাকসেনাদের গোলাগুলি ভীষণ তীব্র হতে শুরু করে এবং আমাদের সেনাদের আক্রমণ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। মেজর সালেক অন্য প্লাটুন অর্থাৎ যারা স্টেশনের দিকে ছিল তাদের আক্রমণ আরও তীব্র করার নির্দেশ দেয়। এই প্লাটুনটি পাকসেনাদের প্রবল গুলিবৃষ্টির মধ্যে রেললাইনের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে থাকে। এই প্লাটুনের লোকেরা রেল স্টেশনের ২৫ গজের মধ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং পাকসেনাদের প্রায় ৬/৭টি বাংকার উড়িয়ে দেয়। এই সময় স্টেশনের নিকটস্থ গুদাম এলাকা থেকে আমাদের লোকদের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু হয়। অতর্কিত এই আক্রমণে আমাদের অনেক লোক হতাহত হয়। অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। মেজর সালেকের পক্ষে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হয় না। নিরুপায় হয়ে মেজর সালেক তার আহত ও নিহত সৈনিকদের নিয়ে পশ্চাতে হটে আসতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে আমাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। 'এ' কোম্পানির ৭ জন নিহত ও ৯ জন গুরুতর আহত হয়। এছাড়াও সৈনিকদের মনোবল কিছুটা দমে যায়। পাকসেনারা তাদের অবস্থান অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়। আমার সেক্টরে এটাই ছিল প্রথম এবং সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়—যাতে এতজন একসাথে নিহত ও আহত হলো।

ঢাকা এবং ঢাকার চারপাশে গেরিলারা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। ২৫ জুলাই সকাল ৬ টায় পুবাইলের নিকট কালসজ স্থানে রেলওয়ে লাইনের উপর বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি ট্রেন উড়িয়ে দেয়া হয়। ইঞ্জিনসহ তিনটি রেলওয়ে বগী লাইনচ্যুত হয় এবং ইঞ্জিনে আগুন লেগে বিধ্বস্ত হয়। ট্রেনের আরোহী ৩০/৩৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ সেই সাথে নিহত হয়। বগীগুলো লাইনচ্যুত হয়ে পানিতে পড়ে যায়। গেরিলাদের আর একটি দল ৪ আগস্ট আড়াইহাজার থানার নিকট পাঞ্চকাপি সড়কসেতু এবং নওগাঁও সড়কসেতু উড়িয়ে দেয়। ফলে নরসিংদি-ডেমরার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তায় ৫ আগস্ট বাতেচরের নিকট সড়কসেতু এবং কুমিল্লা-দাউদকান্দির দিসলা সড়কসেতু উড়িয়ে দেয়। ফলে ঢাকা-কুমিল্লা সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে ২৭ জুলাই ৪ জনের একটি গেরিলা দল মতিঝিলের (পীরজঙ্গী মাজার) নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ সাব-স্টেশনের উপর আক্রমণ চালায়। পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এই সাব-স্টেশনটিকে পাহারা দিচ্ছিল। গেরিলারা দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশকে নিহত এবং বাকিদের নিরস্ত্র করে। তারা তালা ভেঙে সাব-স্টেশনে প্রবেশ করে ও সাব-স্টেশনটি এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ফলে মতিঝিল, কমলাপুর স্টেশন, শাহজাহানপুর, গোপিবাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। গেরিলা দলটি এর পর ফেরার পথে শাহজাহানপুরে রাজাকারদের দ্বারা আক্রান্ত হয় কিন্তু সাহসের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ৮/১০ জন রাজাকারকে নিহত করে

নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে আর একটি গেরিলা দল সিদ্ধিরগঞ্জ এবং খিলগাঁও ও কমলাপুরের মাঝে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের পাইলন উড়িয়ে দেয়। ফলে টঙ্গী, কালিগঞ্জ প্রভৃতি শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ১৫ জুলাই পাগলা এলাকায় গেরিলা দল ফতুল্লা এবং ঢাকার মাঝে একটি রেলওয়ে সেতু এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফার্মগেটের নিকট পাকিস্তানিদের একটি চেকপোস্ট ছিল। এই চেকপোস্ট-এ ৮/১০ জন মিলিটারী পুলিশ সবসময় পাহারায় থাকতো। এইসব মিলিটারী পুলিশ যাতায়াতকারী সমস্ত যানবাহন থামিয়ে তল্লাশী করতো। ঢাকার একটি গেরিলাদল এই চেকপোস্ট আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েকদিন গাড়িতে রেকি করার পর তারা দেখতে পায় যে পাহারারত মিলিটারী পুলিশ সবসময় মোটেই সতর্ক থাকে না। একদিন সন্ধ্যায় হাবিবুল আলম, গাজী দস্তগীর, কাজী কামালউদ্দিন এবং কামরুল হক স্বপন নামে চারজন ঢাকার গেরিলা একটি গাড়িতে ফার্মগেটে আসে। মিলিটারী চেকপোস্টের নিকটে পৌঁছার সময় তাদেরকে পাকসেনারা আসতে নির্দেশ দেয়। তারা তাদের গাড়িটি নির্দেশ অনুযায়ী দ্বিতীয় রাজধানীর দিকে মুখ করে রাস্তা করে দাঁড়ায়। চারজন পাকসেনা গাড়ির দিকে তল্লাশীর জন্য অগ্রসর হয়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে গেরিলারা তিনটি চায়নিজ স্টেনগান থেকে গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনাদের অন্যান্য লোকও গাড়ির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। গেরিলা দল তাদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোঁড়ে এবং তীব্র গতিতে গাড়ি চালিয়ে অবস্থান পরিত্যাগ করে। এ সংঘর্ষের ফলে পাকসেনাদের ৫ জন মিলিটারী পুলিশ আহত ও ৪ জন নিহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফার্মগেট এবং কাওরান বাজার এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ২ আগস্ট ঢাকার গেরিলাদের আর একটি দল 'গ্যানিস' এবং 'ভোগ' নামক দুটি বড় দোকানে গ্রেনেড ছুঁড়ে দোকান দুটির ক্ষতি সাধন করে।

লে. ইমামুজ্জামানের রেকি পার্টি সংবাদ নিয়ে আসে, পাকসেনাদের দুটি জীপকে রেশন এবং গোলাবারুদ সরবরাহের জন্য বালিয়াজুরি ভাঙ্গা ব্রীজের নিকট শত্রু অবস্থানের দিকে যেতে দেখা গেছে। লে. ইমামুজ্জামান তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন জীপ দুটিকে এ্যামবুশ করার জন্য হরিসর্দার-বলিয়াজুরি ব্রীজের নিকট পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি পাক অবস্থানের নিকট পৌঁছে অবস্থান নেয় এবং দেখতে পায় যে, জীপ দুটি রাস্তার উপর ব্রীজের নিকট দাঁড়িয়ে আছে। লে. ইমামুজ্জামানের প্লাটুনটি সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান নিয়ে জীপের উপর রাইফেলের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের দু'জন নিহত হয়। একটি জীপ মৃত সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত ঘুরে পালিয়ে যায়। অন্য জীপটির উপর প্লাটুনটি গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনারা রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থান নিয়ে আমাদের প্লাটুনটির উপর গুলি চালাতে থাকে তাদের গুলি ফুরিয়ে এলে তারা গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ আক্রমণের তাদের ৬ জন মারা যায়। পরে পাকসেনারা আমাদের এ্যামবুশ অবস্থানের উপর প্রচণ্ড গোলা ছুঁড়তে থাকে। বাধ্য হয়ে আমাদের প্লাটুনটি অবস্থান ত্যাগ করে। শত্রুদের গাড়িটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এরপর পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল দুপুর দেড়টার সময়

আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি যখন আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের নিকট পৌঁছে, তখন আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড সংঘর্ষে ১০ জন পাকসেনা নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়। পাকসেনারা বাধ্য হয়ে তাদের আক্রমণ পরিত্যাগ করে ফেরত চলে যায়।

মেজর সালেক ১০ আগস্ট একটি প্লাটুন নিয়ে শালদা নদীর পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা সিএন্ডবি রাস্তার একটি শিদলাই গ্রামে তার গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে। পরদিন স্থানীয় লোকের নিকট খবর পায় যে, সিএন্ডবি রাস্তার উপর দিয়ে প্রতিদিন কুমিল্লা থেকে উজানিশ্বর পাক অবস্থানে ৩/৪টি জীপ যাতায়াত করে। এই সংবাদ পেয়ে মেজর সালেক পাকসেনাদের জন্য সিএন্ডবি রাস্তায় একটা এ্যামবুশ পাতে। সমস্ত দিন ও রাত অপেক্ষা করার পরও পাকসেনারা সেদিন আর আসেনি। বোঝা গেল যে, হয়তো বা তাদের কোন দালাল বা রাজাকার আগে থেকেই এ্যামবুশ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল। অনেক অপেক্ষা করার পর রাস্তায় মাইন লাগিয়ে মেজর সালেকের দলটি তার ঘাঁটিতে রওয়ানা হয়। পথে রসুলপুর গ্রামের নিকট একটি রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। আক্রমণের সময় ক্যাম্পভবনের ভিতর বেশ কয়েকটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। এই আক্রমণের ফলে ২০ জন রাজাকার নিহত ও ৩০ জন বন্দি হয়। এরপর দলটি নিজেদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসে।

শালদা নদী, মন্দভাগ এবং এর চতুর্দিকে আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তানিদের ওপর প্রায়ই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যাও দিন দিন আরো বেড়ে যাচ্ছিল। আমাদের আক্রমণের ফলাফল সম্বন্ধে দুটি সঠিক বিবরণ গ্রামবাসী মারফত জানতে পাই। শালদা নদীর শত্রু অবস্থানের উপর আমরা গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় গোলার আক্রমণ চালানোর ফলে আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে শত্রুপক্ষের অন্তত ৬০ জন নিহত হয়। বাধ্য হয়ে শত্রুরা স্টেশন ছেড়ে নয়নপুর গ্রাম, শালদা নদী গোডাউন ইত্যাদি এলাকায় অবস্থান তৈরি করে। মন্দভাগেও শত্রু অবস্থানের ওপর আমাদের গোলার আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের প্রায় ১৫০ জন হতাহত হয়। পাকসেনাদের ১টি ১২০ মি.মি. মর্টারের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করা হয়। সন্ত্রস্ত পাকসেনারা বাধ্য হয়ে তাদের কামানের অবস্থান পিছু হটিয়ে ব্রাহ্মণপাড়ায় নিয়ে যায়। আমাদের এ্যামবুশের ফলে শালদা নদীর রাস্তা পরিত্যাগ করে নাগাইশ হয়ে ব্রাহ্মণপাড়া থেকে একটি নতুন রাস্তা খোলার চেষ্টা করে। ১১ আগস্ট পাকসেনাদের একটি কোম্পানি এই নতুন রাস্তায় আসে। আসার পথে নাগাইশ গ্রাম থেকে একজন স্থানীয় লোককে পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে। এই লোকটি পরে আমাদের জানায় যে পাকসেনাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। নৌকাতে আসার সময় অনেক সৈন্যই সামনে অগ্রসরে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাদের কমান্ডাররা অনেকভাবে তাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা চালায়। এছাড়াও তাদের অনেককে চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তারা তাদের পুরানো দাম্ভিক স্বভাব অনেকটা পরিত্যাগ করেছে। পাকসেনারা গ্রামবাসীদের সাথে মিশবার চেষ্টাও করছিল। শত্রুদের এই নতুন রাস্তার খবর পেয়ে মেজর সালেক একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি নাগাইশ গ্রামে পাকসেনাদের রাস্তায় এ্যামবুশ পাতে। ১৫

আগস্ট সকাল ৮/৯ টার সময় পাকসেনাদের দুটি রসদ বোঝাই নৌকা ব্রাহ্মণপাড়া থেকে নারায়ণপুরের দিকে যাচ্ছিল। আমাদের প্লাটুনটি তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং ১১ জন পাকসেনাকে নিহত করে নৌকাগুলো ডুবিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে পাকসেনাদের আরও তিনটি নৌকা শালদা নদী থেকে ব্রাহ্মণপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। এই নৌকাগুলোকেও আমাদের এ্যামবুশ পার্টি শশিদল গ্রামের নিকট এ্যামবুশ করে এবং এতে ১০ জন পাকসেনা নিহত হয়। পরদিন পাকসেনাদের দুটি শক্তিশালী প্লাটুন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দমনে নাগাইশের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের প্লাটুনটি সংবাদ পেয়ে সুবেদার নজরুল ও নায়েব সুবেদার মুনিরের নেতৃত্বে পাকসেনাদের এই দলটিকে নাগাইশ পৌঁছার আগেই অতর্কিত আক্রমণ করে ২৫ জন পাকসেনাকে নিহত করে। পাকসেনারা পিছু হটে যায়। ১৭ আগস্ট ব্রাহ্মণপাড়ার এই নদীপথ খোলার জন্য পাকসেনাদের একটি বিরাট দল নদীর পাড় দিয়ে অগ্রসর হয়। এবং সঙ্গে সৈন্য বোঝাই তিনটি নৌকাও অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই দলটিকে আমাদের সৈন্যরা আবার এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশের ফলে নৌকার আরোহী ১৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনাদের যে দলটি পাড় দিয়ে আসছিল, তাদের প্রবল চাপে বাধ্য হয়ে আমাদের সৈন্যরা পিছু হটে আসে। পাকসেনারা দুই/তিনবার এ্যামবুশে পড়ার পরও শালদা নদীর নাগাইশ-ব্রাহ্মণপাড়া যোগাযোগ পথ খোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এই খাল ছাড়া পিছন থেকে শালদা নদীতে সরবরাহের আর কোন রাস্তা ছিল না।

১৯ আগস্ট দুপুর ১২ টার সময় পাকসেনাদের তিনটি নৌকা শালদা নদী থেকে ব্রাহ্মণপাড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই নৌকাগুলো যখন নাগাইশের নিকট পৌঁছে তখন আমাদের সৈন্যরা নৌকাগুলোর উপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা পাল্টা গুলি চালিয়ে আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের সৈন্যদের তীব্র আক্রমণের মুখে তাদের দুটি নৌকা ডুবে যায় এবং ২০ জন নিহত হয়। পিছনের নৌকাটি দ্রুত পিছনে ফিরে পাড়ে পৌঁছায়। পাকসেনারা নৌকা থেকে নেমেই আমাদের সৈন্যদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করে। প্রায় চার ঘণ্টা উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলার পর পাকসেনারা পিছু হটে যায়। ঐদিনই বেলা ১ টার সময় আমাদের কামানের গোলায় শালদা নদী গুদামে অবস্থিত পাকসেনাদের একটি বাংকার ধ্বংস হয়। ফলে আটজন পাকসেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

মন্দভাগেও ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাদের চারটি বাংকার ধ্বংস করে দেয়। ফলে ১১ জন নিহত ও তিনজন আহত হয়। লে. ইমামুজ্জামান পাকবাহিনীর হরিসর্দার হাটের অবস্থানের উপর তার চাপ রেখে যাচ্ছিল। এই চাপের ফলে পাকসেনাদের মনোবল দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। এই অবস্থানটিতে বারবার অতর্কিত আক্রমণ এবং এ্যামবুশ চালানোর ফলে পাকসেনারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে সব সময় সজাগ থাকতো।

শত্রুদের এই অবস্থানটি মুক্ত করার জন্যে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ভীতসন্ত্রস্ত পাকসেনাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়ার জন্যে অবস্থানটির নিকটবর্তী

এলাকায় গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে পাকসেনাদের এই অবস্থানটির ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের রেজিমেন্ট আক্রমণ করার জন্য অতিসত্বর হরিসর্দার হাটের দিকে উত্তর থেকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধু রাষ্ট্রের দেয়া অনেক কামানও আছে। এছাড়াও অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও আক্রমণের জন্য একত্রিত হচ্ছে। এই ধরনের গুজব প্রায়ই পাকসেনাদের আমানগোণ্ডা অবস্থানের এলাকায় প্রচার করা হচ্ছিল। এর ফলে পাকসেনাদের মনোবলে আরও ভাঙ্গন ধরে। ১৪ আগস্ট আরও গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয়ে যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসেই এই আক্রমণ চালানো হবে। ১৪ আগস্ট রাত ১০ টার সময় লে. ইমামুজ্জামানের কয়েকজন সিপাই আমানগোণ্ডার নিকটে গিয়ে ভেরিলাইট পিস্তল এবং দুই ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে ইল্যুমিনেটিং প্যারাস্যুট বোমা ছোঁড়া হয় এবং কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। এর পরদিন আমানগোণ্ডা অবস্থানের নিকট পৌঁছে দেখা গেল যে পাকসেনারা সমস্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে রাতে ভয়ে পালিয়ে গেছে এবং এলাকাবাসী পাক সেনাদের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করছে।

এ ছাড়াও পরে আমরা আরো অনেক সূত্রে জানতে পারি যে, মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ সম্বন্ধে পাকিস্তানিরা এত বেশি সন্দিহান এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে, ১৩ আগস্ট ঢাকা থেকে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য এবং চারটি লাইট ট্যাংক কুমিল্লাতে আনা হয়। এই ব্যাটালিয়নটি বানাসিয়া থেকে গাজীপুর পর্যন্ত রেললাইনের পাশে প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করে, দুটি ট্যাংক কুমিল্লা বিমানবন্দরের নিকট মোতায়েন করে এবং বাকিগুলো কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে রাখা হয়। কুমিল্লার সামরিক প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার মাসুদ ঘোষণা করেন যে, যদি কোনো বাঙালি সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে যে মুক্তিবাহিনী তার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে তবে তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এইভাবে পাকবাহিনী তাদের দোষ মুক্তিবাহিনীর ওপর চাপাবার প্রচেষ্টা চালায় এবং এইসব অভিযোগকে তাদের প্রচারকাজের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

পাকসেনারা হোমনা থানায় একবার আক্রান্ত হবার পর এই থানাটিতে আবার পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং কিছুসংখ্যক পাকসেনা মোতায়েন করে শক্তিশালী করে তোলে। থানাটিতে পাকসেনাদের অবস্থান শক্তিশালী হবার পর হোমনা এলাকায় মুক্তিবাহিনীর পক্ষে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়াতে বাধার সৃষ্টি হয়। এই এলাকা আবার মুক্ত করার জন্য হাবিলদার গিয়াস থানাটিকে আক্রমন করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে থানাটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবর সংগ্রহ করে। স্থানীয় গেরিলাদেরকে তার প্লাটুনের সঙ্গে একত্রিত করে। ১৫ আগস্ট রাত ১২ টার সময় আমাদের সম্মিলিত দলটি হোমনা থানার উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। থানার ভিতরে অবস্থিত পুলিশ ও পাকসেনারা যথেষ্ট সাহসের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু দু'ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে তাদের ১০ জন নিহত ও ১৪ জন বন্দি হয়। আমাদের দলটির দু'জন আহত হয়। থানাতে ২৪টি রাইফেল, দুটি বন্দুক, ১৬টি বেয়োনেট, একটি অয়্যারলেস সেট, ২টি টেলিফোন সেট, ১০টি গ্রেনেড ও দেড় হাজার গুলি আমাদের হস্তগত হয়। বন্দিদের থানা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া

হয়। হোমনা থানার বিস্তৃত এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। আর দুই দিন পর হোমনা পতনের খবর পেয়ে পাকসেনাদের ৩টি দল মুরাদনগর থেকে হোমনার দিকে নৌকায় অগ্রসর হয়। মুরাদনগরে অবস্থিত আমাদের গেরিলারা এই সংবাদ পেয়ে যায়। স্থানীয় গেরিলা কমান্ডার মুসলেউদ্দিনের নেতৃত্বে দুপুর দু'টার সময় নদীর পাড়ে অগ্রসরমান পাকসেনাদের জন্য এ্যামবুশ পাতে।

মুরাদনগর থেকে ৮ মাইল দূরে সন্ধ্যা ৬ টার সময় পাকসেনাদের নৌকাগুলো এ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের গেরিলাদের গুলিতে দুটি নৌকা ডুবে যায়। গোলাগুলিতে ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ২৯ জন পাকসেনা এবং পাঁচজন রাজাকার নিহত হয়। আমাদের গেরিলারা তিনটি এলএমজি এবং দুটি বেল্ট বক্স (৫০০ গুলিসহ), ৫০০ চাইনিজ রাইফেলের গুলি এবং একটি ৩০৩ রাইফেল হস্তগত করে। অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পানিতে ডুবে যাওয়ায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কুমিল্লা থেকে তিন মাইল উত্তর-পূর্বে কংশনগরে পাকসেনারা আগস্ট মাসে তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। এ ঘাঁটিতে পাকসেনাদের অন্তত এক কোম্পানি শক্তি ছিল। পাকসেনাদের এই নতুন ঘাঁটির সংবাদ ক্যাপ্টেন মাহবুবের নিকট পৌঁছে। তিনি একটি পেট্রোল পার্টি পাঠিয়ে এই ঘাঁটি সম্বন্ধে বিস্তরিত খবর সংগ্রহ করেন। ১৬ আগস্ট সন্ধ্যা ৭ টায় লে. মাহবুবের নেতৃত্বে দুটি প্লাটুন শত্রুঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয়। রাত দু'টার সময় লে. মাহবুবের দলটি পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমন চালায়। মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা পাক-ঘাঁটির ভিতরে অনুপ্রবেশ করে পাকসেনাদের হতচকিত করে দেয়। তুমুল সংঘর্ষে কিংবর্তব্যবিমূঢ় পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকসেনারা পর্যুদস্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমাদের দলটি পলায়মান পাকসেনাদের খায়েশ বাজার এবং লক্ষ্মীপুর ঘাঁটি থেকেও হটে যেতে বাধ্য করে। সমস্ত রাতের সংঘর্ষে পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ ৩০ জন হতাহত হয়। এরপর আমাদের দলটি নিরাপদে তাদের কেন্দ্রে ফিরে আসে।

এর তিনদিন পর কুমিল্লার একমাইল উত্তরে আমাদের আরও একটি দল পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ২০ আগস্ট রাত ৮ টায় পাকসেনাদের একটি টহলদার প্লাটুন এই এ্যামবুশের আওতায় পড়ে যায়। পাকসেনাদের প্লাটুনটি যখন পুরোপুরি আমাদের এ্যামবুশ পার্টির সম্মুখে এসে যায় তখন আমাদের দলটি হালকা মেশিনগান এবং অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। পাকসেনারা অতর্কিত এই আক্রমণে হতচকিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। এই এ্যামবুশে ১১জন পাকসেনা নিহত এবং ৩ জন আহত হয়। আমাদের দলটি পাকসেনাদের ১টি MG1A3 মেশিনগান ও কয়েকটি G-III রাইফেল দখল করে।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল জগন্নাথ দিঘীতে ঘাঁটি করেছিল। এই দলটি মাঝে মাঝে নিকটবর্তী চিয়োরা গ্রামে রাত্রিতে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতো। এই খবর আমরা পেয়ে যাই। ২৩ আগস্ট মেজর জাফর ইমাম এই দলটিকে আক্রমণ করার জন্য দুটি প্লাটুন নিয়ে চিয়োরা গ্রামের নিকট পাকসেনাদের অপেক্ষায় অবস্থান করে। রাত সাড়ে ১২ টায় জগন্নাথ দিঘী পাক অবস্থানের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল

আক্রমণ চালায়। একই সঙ্গে চিয়োরা গ্রামে অবস্থিত পাকসেনাদের উপর মেজর জাফর ইমামের নেতৃত্বে আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণের ফলে চিয়োরা গ্রামে অবস্থিত পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং ২৪ জন পাকসেনা আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়। কিছু শত্রুসেনা আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নয়নপুর রেল স্টেশনে পাকসেনাদের উপর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি এবং 'সি' কোম্পানি তাদের চাপ আরো জোরদার করে। ২৩ আগস্ট সকাল ১১ টায় উক্ত কোম্পানি দুটি মিলিতভাবে স্টেশনের উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে মর্টার ও ১০৬-এমএম আরআর নিয়ে পাক অবস্থানের উপর সাঁড়াশী আক্রমণ চালায়। ১০৬ এমএম আরআর-এর আঘাতে পাকিস্তানিদের বেশ ক'টি শক্ত বাংকার বিধ্বস্ত হয়। স্টেশনের কিছু দূরে একটি গুদাম ছিল। তার ভিতরেও পাকসেনারা বাংকার বানিয়েছিল। গুদামটিতেও রকেট মারা হয়। ফলে গুদামে আগুন ধরে যায়। রকেটিং-এর পর মর্টার এবং মেশিনগানের সাহায্যে শত্রু অবস্থানের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়। এই আক্রমণ এত সফল হয়েছিল যে, শত্রু অবস্থান থেকে ভীতসন্ত্রস্ত আর্তনাদ এবং চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। পাকিস্তানিরা আমাদের আক্রমণের জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। শত্রুদের প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা সে সময়ে জানা যায়নি। পরে আমরা গ্রামবাসী সূত্রে খবর পেয়েছি যে, পাকসেনাদের যথেষ্ট হতাহত হয়েছে।

নোয়াখালী এবং বিলোনিয়াতে আমাদের সৈনিকরা এবং গেরিলা দল পাকসেনাদের নাজেহাল করে তুলেছিল। ২২ আগস্ট পাকসেনাদের একটি দল সোনাগাজীর দিকে ট্রাকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের একটি দল রাস্তায় এন্টি-ট্যাংক মাইন পেতে ভোর ৫ টায় পাকসেনাদের দলটিকে এ্যামবুশ করে। মাইনের আঘাতে পাকসেনাদের তিনটি ট্রাক ধ্বংস হয় এবং সেই সঙ্গে তাদের ২০ জন সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে প্রায় ৪০ জন পাকসেনা এবং রাজাকার হতাহত হয়। প্রায় একঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের দলটি অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে ফিরে আসে। ঘটনার দু'দিন পর চৌদ্দগ্রামে এবং লাকসাম সড়কের উপর আমাদের গেরিলারা মাইন পুঁতে রাখে। পাকসেনাদের একটি ডজ গাড়ি মাইনের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। গাড়িতে অবস্থানরত একজন অফিসার এবং একজন পাকসেনা নিহত হয়। একই সময় ফেনী থেকে একটি ট্রাক পাকসেনাসহ চৌদ্দগ্রামের দিকে আসছিল। আমাদের একজন গেরিলা ট্রাকের ভিতর একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। প্রায় ২৫ জন পাকসেনা হতাহত হয়। অপর পক্ষে পাকসেনাদের গুলিতে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শাহজাহান শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনার হাতে ধরা পড়ে। গেরিলারা ফেনীর কাছে গুমদণ্ডী রেলওয়ে লাইন ডিমোলিশন দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ফেনী এবং কুমিল্লার মধ্যে ট্রেন যোগাযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২১ আগস্ট সকাল সাড়ে ৭ টায় আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি পাকসেনাদের একটি দলকে কুমিল্লার উত্তরে গাজীপুরে রেলওয়ে সেতুর দিকে অগ্রসর হতে দেখে। আমাদের পেট্রোল পার্টিটি পুলের নিকট এ্যামবুশ পেতে পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে পাকসেনারা এ্যামবুশ অবস্থানটির মধ্যে এসে যায় এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধা দ্বারা

অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে একজন লেফটেন্যান্টসহ ছ'জন পাকসেনা নিহত হয় এবং অবশিষ্ট পাকসেনারা পালিয়ে বাঁচে। বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং ম্যাপ আমাদের দখলে আসে। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি আগস্ট মাসের শেষের দিকে কুমিল্লার উত্তরে মন্দভাগ এবং সিএন্ডবি সড়কের উপর তাদের কার্যকলাপ জোরদার করে তোলে। ২৩ আগস্ট রাত ১ টায় ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে দুটি প্লাটুন মন্দভাগ বাজারের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের সময় আমাদের সৈনিকরা গ্রেনেড চার্জ করে পাকসেনাদের চারটি বাংকার ধ্বংস করে দেয়। এই আক্রমণে পাকসেনাদের অন্তত ২৫ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে দু'জন মারাত্মকভাবে আহত এবং একজন শহীদ হয়। একঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের যোদ্ধারা শত্রু অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে ফিরে আসে। ২৫ আগস্ট আমাদের একটি ডিমোলিশন পার্টি সিএন্ডবি সড়কের কালামোড়া সেতুতে প্রহরারত পাকসেনাদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে ৭ জন পাকসেনা ও রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসহ আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। সেতুটিকে আমাদের দলটি উড়িয়ে দেয়। ঐদিন ভোর ৫ টায় পাকসেনাদের একটি জীপ দ্রুতগতিতে বিধ্বস্ত হয় এবং ঐ জীপের আরোহী তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। আমাদের আরেকটি দল সিএন্ডবি রাস্তার উপর একটি এ্যামবুশ পেতে রাখে।

২৫ আগস্ট সকাল ৮ টার সময় পাকসেনাদের একটি ডজ গাড়ি এ্যামবুশের আওতায় এলে গাড়িটি ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং ডজের আরোহী চারজন পাকসেনাকে (একজন হাবিলদার ও তিনজন সিপাই) বন্দি করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এ যান থেকে ছ'টি রাইফেল, ২২৫ রাউন্ড গুলি, ২টি পিস্তল ও ৩টি গ্রেনেড হস্তগত করে। কুমিল্লার উত্তরে জামবাড়ি ও আম্রতলী এলাকায় পাকসেনারা প্রায়ই টহল দিতে আসতো। পাকসেনাদের এই দলটিকে এ্যামবুশ করার জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়। ২৫ আগস্ট তারিখে আমাদের একটি প্লাটুন লে. দিদারুল আলমের নেতৃত্বে বিকেল ৪ টায় মর্টারসহ পাকসেনাদের টহল দেয়া রাস্তার পাশে এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। সন্ধ্যা ৬ টার সময় পাকসেনাদের একটি কোম্পানি গোমতী পার হয়ে জামবাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। এ্যামবুশের নিকট পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর প্রবলভাবে মর্টারের গুলিবর্ষণ করা হয়। পাকসেনারা এই আকস্মিক আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের এ্যামবুশ পার্টি পলায়নপর শত্রুসেনাদের উপর মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে তাদের প্রতি আক্রমণ চালায়। এই এ্যামবুশে ৩০ জন পাকসেনা নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা রাতের আঁধারে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

পাকসেনারা শালদা নদী এবং নয়নপুরে তাদের সরবরাহ নদীপথে পাঠাতো। তাদের এই নদীপথ বন্ধ করার জন্য প্রায়ই পাকসেনাদের অবস্থানের পেছনে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি পাঠানো হতো। ২৩ আগস্ট আমাদের এ্যামবুশ পার্টি সেনেরবাজারে অবস্থান নিয়েছিল। সকাল ১১ টায় পাকসেনাদের একটা নৌকা সেনেরবাজারের পশ্চিম পাড় ঘেঁষে আসতে থাকে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টি দ্রুত শত্রুর নৌকার উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়, অবশিষ্ট সৈন্যরা নৌকাটিকে তাড়াতাড়ি পশ্চিম তীরে ভিড়িয়ে নৌকা থেকে নেমে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার ৩ দিন

পর আমাদের আরেকটি টহলদার দল ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের নিকট পাকসেনাদের ৬টি নৌকা নয়নপুরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। প্রত্যেকটি নৌকায় ছয় থেকে আটজন করে পাকসেনা ছিল। টহলদার দলটি হাবিলদার সৈয়দ আলী আকবরের নেতৃত্বে সেনেরবাজারের নিকট নদীর পশ্চিম তীর এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। নৌকাগুলো যখন এ্যামবুশের আওতায় আসে তখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নৌকাগুলোর উপর মেশিনগানের সাহায্যে গুলিবর্ষণ শুরু করে। প্রথম নৌকাটি গুলির আঘাতে উল্টে যায় এবং ৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। অবশিষ্ট ৩ জন আরোহী পানিতে ঝাঁপ দিয়ে উল্টে যাওয়া নৌকার আড়ালে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অপর ৫টি নৌকা দ্রুতগতিতে নাগাইশ গ্রামের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আমাদের আরেকটি দল সুবেদার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে পলায়নপর পাকসেনাদেরকে নাগাইশ গ্রামের কাছে আক্রমণ করে এবং তাদের ৩টি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এতে ১৮ জন পাকসেনা পানিতে ডুবে মারা যায়। শুধু ২টি নৌকা থেকে পাকসেনারা রক্ষা পায় এবং নয়নপুরের দিকে পলায়ন করে। এই সংঘর্ষে আমাদের ছাত্র গেরিলা আবদুল মতিন গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাৎ বরণ করে।

২৭ আগস্ট সকালে পাকসেনারা নয়নপুরের পশ্চিম পাশে শশীদল গ্রামের নিকট তাদের সৈন্য সমাবেশ করে সেনেরবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই দলটি মর্টারের গোলার সাহায্যে সেনেরবাজারের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। সমস্ত দিন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার সময় আমাদের সেনারা পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। পাকসেনারা অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে যায়। পরে জানা যায় যে, এই সংঘর্ষে ১৫ জন পাকসেনা নিহত হয়।

২৮ আগস্ট পাকবাহিনী ব্রাহ্মণপাড়া থেকে ৫টি নৌকায় শালদা নদী দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথে আবার আমাদের এ্যামবুশ পার্টি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই এ্যামবুশে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের ৫টি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এখানে একজন ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ৩০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। এর ফলে পাকসেনাদের জন্য নদীপথে অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোতে সরবরাহ পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের রেজিমেন্টের 'এ' কোম্পানির একটি টহলদার দল মাধবপুর এলাকার নিকট ২৭ আগস্ট তাদের গোপন বেস্ গড়ে তোলে। এখান থেকে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার জন্য সিএন্ডবি সড়কে তাদের লোক পাঠায়। ২৮ তারিখে সকাল ৭ টায় খবর আসে যে, পাকসেনারা একটি জীপ ও ট্রাকে সিএন্ডবি সড়ক থেকে কাঁচা রাস্তায় মাধবপুরের দিকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর জন্য এগিয়ে আসছে। আমাদের টহলদার দলটি এই সংবাদ পেয়ে মাধবপুর গ্রামের বাইরে কাঁচা রাস্তায় যে পথে পাকসেনারা অগ্রসর হচ্ছিল সেখানে একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। এগারটার সময় পাকসেনাদের জীপ এবং ট্রাকটি এ্যামবুশের আওতায় আসে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টি আক্রমণ চালিয়ে গাড়ি দুটির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এই এ্যামবুশে ৯ জন পাকসেনা নিহত এবং ৬ জন আহত হয়। কিছুসংখ্যক পাকসেনা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে কুমিল্লার দক্ষিণে আমাদের গেরিলারা তাদের কার্যকলাপ আরো জোরদার করে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটি গেরিলা দল বরুড়াতে তাদের বেইস-এ যাওয়ার পথে পাকসেনা এবং রাজাকার দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়। এই সংঘর্ষে একজন পাকসেনা নিহত এবং দু'জন আহত হয়। আমাদের একজন গেরিলা গুরুতররূপে আহত হয়। এই সময় ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, দাউদকান্দি, চাগোরা প্রভৃতি জায়গায় পাকসেনাদের সঙ্গে গেরিলাদের সংঘর্ষে ১৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। এসব সংঘর্ষে ২০টি রাইফেল এবং প্রচুর গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয়। আগস্ট মাসের ২৯ তারিখে আমাদের মিয়ারবাজার সাব-সেক্টরে খবর আসে যে, পাকসেনারা লাকসাম থানার বুটচি গ্রামে সন্ধ্যা ৭ টায় শান্তি কমিটির একটি সভা করার প্রস্তুতি নিয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন ইমামুজ্জামান সভাটি পণ্ড করার জন্য এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে দেয়। পাকসেনা এবং রাজাকাররা সভা শুরু করলে আমাদের প্লাটুনটি তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে ৮ জন পাকসেনা, ৯ জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং ২০ জন রাজাকার হতাহত হয়। শান্তি কমিটির সভাটি আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে আসে।

২৫ আগস্ট সকাল ৯ টার সময় পাকসেনাদের একটি প্লাটুনকে ব্রাহ্মণপাড়া থেকে ধানদইল গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়। আমাদের একটা পেট্রোল পার্টি দূর থেকে পাকসেনাদের অগ্রসর হতে দেখে ধানদইল গ্রামে এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনারা এ্যামবুশের ভিতর এসে গেলে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এতে ১ জন ক্যাপ্টেন সহ ১০ জন পাকসেনা নিহত হয়। অবশিষ্ট সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। পরদিন আমাদের এই টহলদার দলটি উত্তর নাগাইশ এবং ছোট নাগাইশ গ্রামের মাঝে শালদা নদীর পাড়ে এ্যামবুশ পাতে। সকাল ৫ টায় আমাদের এ্যামবুশ দল পাকসেনাদের একটি টহলদার দলকে শালদা নদীর পূর্ব তীর ঘেঁষে অগ্রসর হতে দেখে। পাকসেনাদের এই দলটি তাদের কয়েকটি সরবরাহবাহী নৌকাকে নয়নপুর থেকে মন্দভাগের দিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই দলটা আমাদের এ্যামবুশ পার্টির আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে দুটি নৌকা ধ্বংস এবং ১৪ জন লোক নিহত হয়। পাকসেনাদের অপর পাহারা দল আমাদের এ্যামবুশ পার্টির প্রতি পাল্টা গুলি চালায়। প্রায় একঘণ্টা উভয় পক্ষের মধ্যে গোলা বিনিময় চলতে থাকে। নয়নপর থেকে আরো ২টি নৌকায় পাকসেনারা তাদের দলটিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য অগ্রসর হয়। প্রথম নৌকাটি আমাদের গুলিতে ডুবে যায় এবং ৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। অন্য উপায় না দেখে দ্বিতীয় নৌকার সৈন্যরা তীরে নেমে পালিয়ে যায়। এরপর পাকসেনারা সমস্ত দিন এবং রাত হরিমঙ্গল, শশীদল এবং সেনেরবাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আমাদের সেনেরবাজার এবং গৌরাঙ্গল অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। পরের দিন সকাল ৯ টায় ৩০ জন পাকসেনা দুটি নৌকায় সেনেরবাজার অবস্থানের দিকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। অগ্ররস হওয়ার পথে আমাদের মেশিনগানের গুলিতে ২টি নৌকাই ডুবে যায় এবং সকল পাকসেনাই নদীতে ডুবে মারা যায়।

আগস্ট মাসের শেষে ঢাকাতে আমাদের গেরিলাদের শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তারা পাকসেনাদের ঢাকায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পাকসেনারা প্রায়ই রাতে ঢাকা শহরে ট্রাকে করে টহল দিতে বেরুতো। টহল দেয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে শহরবাসীদের উপর জঘন্য অত্যচার চালাতো। পাকসেনাদের রাতের এই তৎপরতা সীমিত করার জন্য আমাদের গেরিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেসব রাস্তায় সাধারণত পাকসেনারা টহল দিতো গেরিলারা সেসব রাস্তার ওপর বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য রাখে। কোন্ রাস্তায় কতটার সময় কতগুলো গাড়ি কত গতিতে চলে, কত ব্যবধান দুই গাড়ির ভিতরে বিরাজ করে প্রভৃতি সংবাদ তারা সংগ্রহ করে। ২৭ আগস্ট রাতে সাড়ে ১১ টায় গ্রীন রোডের (স্টাফ কোয়ার্টারের বিপরীত দিকে) কতকগুলো নির্মাণাধীন দোকানের ছাদে আমাদের গেরিলাদল এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। গেরিলারা রাস্তার উপর গাড়ি বিধ্বংসী মাইন পেতে রাখে। এরপর এ্যামবুশ পার্টি পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় পাকসেনাদের ৪/৫টি বেডফোর্ড গাড়ি এবং জীপ তেজগাঁর দিকে গ্রীন রোড হয়ে অগ্রসর হয়। প্রথম গাড়িটি যখন এ্যামবুশ অবস্থানের শেষপ্রান্তে পৌঁছে তখন একটি মাইন-এর আঘাতে গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় গাড়িটির চালক এই অবস্থা দেখে হকচকিয়ে পাশ কাটাতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী দালানের সঙ্গে ধাক্কা মারে, ফলে এই গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পেছনে পেছনে পাকসেনাদের আরেকটি জীপ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে মাইনের আঘাতে সেটিও উল্টে যায়। যেসব পাকসেনা ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলোতে অক্ষত অবস্থায় ছিল তারা গাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা করে এবং গুলিবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টির গেরিলারা ছাদ থেকে তাদের উপর গ্রেনেড আক্রমণ চালায় এবং গুলি ছুঁড়তে থাকে। এর ফলে অধিকাংশ পাকসেনা হতাহত হয়। পেছন থেকে আরো একটি গাড়িতে পাকসেনারা ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয় এবং গাড়ি থেকে নেমে আমাদের গরিলাদের উপর আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করে। আমাদের গেরিলারাও তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন কোনো উপায় না দেখে তারা ক্যান্টনমেন্টের দিকে পালিয়ে যায়। গোলাগুলির শব্দে স্থানীয় জনসাধারণ তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। তারা ২৪ জন পাকসেনার মৃতদেহ ও ৪১ জনকে আহত অবস্থায় এবং দুটি বিধ্বস্ত ট্রাক এবং একটি জীপ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। আমাদের পক্ষে দু'জন সামান্য আহত হয়। আমাদের গেরিলারা কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রীন রোডের পিছন দিকের নিচু জায়গা, দিয়ে নিরাপদে চলে আসতে সক্ষম হয়। পরের দিন এই খণ্ডযুদ্ধ এবং পাকিস্তানিদের দুরবস্থার কাহিনী হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে জানতে পারে। এই সংবাদ সমস্ত ঢাকায় মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঢাকা শহরের মুক্তিকামী জনগণের মনে আশার সঞ্চার হয়। দু'দিন পরে ঢাকার গেরিলারা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজে এবং আরো কয়েকটি কলেজে আক্রমণ চালায়। তারা পরীক্ষার খাতাপত্র জ্বালিয়ে দেয়। টঙ্গী এবং জয়দেবপুরের মাঝে দুটি বিদ্যুতের পাইলনও তারা উড়িয়ে দেয়। ২ সেপ্টেম্বর রাতে পাকিস্তানিদের একটি জীপ যখন গ্রীন রোড দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমাদের কয়েকজন

মুক্তিযোদ্ধা জীপটির ভিতর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে চারজন পাকসেনাকে নিহত করে। গ্রেনেড নিক্ষেপে জীপটির আংশিক ক্ষতি হয়।

এছাড়া ঢাকার গেরিলা দল পশ্চিম পাকিস্তানি একটি পুলিশের দলকে কলাবাগানের কাছে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে দশজনকে নিহত করে। কালিগঞ্জ-ডেমরা এবং কালিগঞ্জ-টঙ্গীর মধ্যস্থিত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের চারটি পাইলন উড়িয়ে দেয়। আমাদের আরেকটি গেরিলা দল রূপগঞ্জের নিকট নদীর পাড়ে পাকসেনাদের যাতায়াতের রাস্তায় একটি এ্যামবুশ পেতে রাখে। ১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫ টায় কালিগঞ্জ থানার দারোগা, ৭০ জন পাকসেনা এবং ৭০ জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ মুক্তিবাহিনীর সম্পর্কে তদন্তের জন্য ঢাকা থেকে কোনো দূরবর্তী গ্রামে নৌকাযোগে যাচ্ছিল। নৌকাটি যখন এ্যামবুশের আওতায় পৌঁছে তখন গেরিলারা নৌকার উপর হালকা মেশিনগান দ্বারা গুলি চালায়। গুলিতে নৌকার আরোহী পাকসেনা, পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং দারোগা নিহত হয় এবং নৌকাটি ডুবে যায়। ঢাকার আজিমপুরে গেরিলারা অতর্কিতে একটি রাজাকার দলের উপর আক্রমণ চালিয়ে চারজন রাজাকারকে নিহত এবং ৪টি রাইফেল ও ৬০ রাউন্ড গুলি দখল করে। টঙ্গীতেও একটি রাজাকার ক্যাম্প দখল করে নেয়। ডেমরার নিকট আমাদের একটি গেরিলা দল ১৩ আগস্ট বিকাল ৩ টার সময় পাক বিমানবাহিনীর একটি জীপ এ্যামবুশ করে ধ্বংস করে দেয়। এ্যামবুশে ৪ জন বিমানবাহিনীর এবং সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সৈনিক নিহত হয়। তাদের কাছ থেকে অনেক কাগজপত্র, পরিচয়পত্র এবং কয়েকটি রিভলবার দখল করা হয়। দখলীকৃত কাগজপত্র আমাদের হেডকোয়ার্টার-এ গেরিলারা পাঠিয়ে দেয়।

আগস্ট মাসের শেষে পাকসেনাদের কোনো গুপ্তচর আমাদের ঢাকার গেরিলাদের ধোলাই খাল ঘাঁটি সম্পর্কে পাকসেনাদের অবহিত করে। সংবাদ পেয়ে পাকসেনারা ২০/২৫টি ট্রাকে ধোলাই খালে আমাদের ঘাঁটিটি আক্রমণের জন্য আসে। পাক সেনাদের অতর্কিত আক্রমণে আমাদের গেরিলারা কোনো উপায় না দেখে তাদের সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। সংঘর্ষে পাকসেনাদের প্রায় ৪০/৪৫ জন হতাহত হয় বলে খবর পাওয়া যায়। অপরদিকে আমাদের দু'জন গেরিলা মারাত্মকভাবে আহত হয়। প্রবল চাপের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের গেরিলারা সাঁতরিয়ে ধোলাইখাল পার হয়ে অবস্থান পরিত্যাগ করে। পিছু হটার সময় একটি ২ ইঞ্চি মর্টার, ৩টি ম্যাগাজিন খালে ফেলে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়। পরদিন পাকসেনারা সেগুলো উদ্ধার করে এবং তাদের প্রচারের কাজে ব্যবহার করে। এর পরদিন আমদের গেরিলারা সূত্রাপুর থানায় আক্রমণ চালিয়ে দু'জন পাকসেনাকে নিহত করে। সূত্রাপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টর এবং ওসি গুরুতরভাবে আহত হয়।

আগস্টের শেষের দিকে আমাদের ২/৩ জন গেরিলা ১ জন মেজর ও ২ জন ক্যাপ্টেনকে (পাক গোলন্দাজ বাহিনীর) একটি জীপে করে আজিমপুরের নিকট এসে জীপ থেমে নেমে দূরে কোনো এক বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে। কিছুক্ষণ পর সে বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে আমাদের গেরিলারাও সেই বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা বুঝতে পারে যে অফিসাররা ঐ বাড়ির মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে। তৎক্ষণাৎ

গেরিলারা অফিসারদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। গেরিলারা পাক অফিসারদের মৃতদেহ দূরে অপেক্ষমান পাক জীপের মধ্যে রেখে দেয় এবং নিরাপদে সে স্থান পরিত্যাগ করে। পাক-পুলিশের একটি দলকে আমাদের ধানমণ্ডির গেরিলারা প্রতিদিন ধানমন্ডী সাতমসজিদ রোড ও নিকটবর্তী রাস্তায় টহল দিতে দেখে। আমাদের গেরিলারা ২৫ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ১৮ নং রোডের মোড়ে একটি চলন্ত গাড়ি থেকে স্টেনগানের গুলি দ্বারা ৯ জন পুলিশকে গুলি করে হত্যা করে। গুলির শব্দ পেয়ে নিকটবর্তী টহলদারী পাকসেনারা জীপ নিয়ে গেরিলাদের পিছু ধাওয়া করে। গেরিলারা গাড়ি থেকে গুলি ছুঁড়ে জীপের ড্রাইভারকে নিহত করে। এ সময় দ্রুতগতিসম্পন্ন চলন্ত জীপটি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং পার্শ্ববর্তী দেয়ালে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়। এর ফলে গাড়ির আরোহী ২ জন পাকসেনা নিহত এবং ৩ জন আহত হয়। এই গেরিলাদের নেতৃত্ব দেয় রুমী (শহীদ, বীরবিক্রম)। পাকসেনারা পরে রুমীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আগস্টের ২৯ তারিখে ছ'জনের একটি গেরিলা দল ঢাকার সায়েদাবাদ সেতুটি এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। এর ফলে ঐ সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ই গেরিলারা একটি বার্জে দু'শো মণ পাটসহ লতিফ বাওয়ানী জুটমিলে যাওয়ার পথে বার্জটিকে ধ্বংস করে দেয়। বরাইদের নিকট আরো তিনশ' মণ পাট ফসফরাস বোমা ফেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গেরিলারা নারায়ণগঞ্জের জিএমসি ঘাটে পাঁচ হাজার বেল বহনকারী কামচাম ফ্ল্যাটটি ডুবিয়ে দেয়। আরসিএম জুটমিলের শ্রমিক (আমাদের একজন গেরিলা) ফসফরাস ৮০ গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আরসিএম মিলের গুদামস্থিত প্রায় একলাখ মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়। পরে জানা যায় যে, দমকল বাহিনীর সাতটি গাড়ি ৩/৪ ঘণ্টা চেষ্টা করেও সেই জ্বলন্ত পাটের অগ্নিনির্বাপণে ব্যর্থ হয়। ফলে সমস্ত পাট পুড়ে যায়।

৩০ আগস্ট আমাদের গেরিলারা আড়াই হাজার থানা অতর্কিত আক্রমণ করে থানার দারোগাকে নিহত করে। গেরিলারা থানার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। এর পরদিন গেরিলারা একজন পাক দালালের দু'লাখ টাকা মূল্যের সুতাবাহী নৌকা ডুবিয়ে দেয়। আমাদের আরেকটি গেরিলাদল শিবপুর থানা আক্রমণ করে থানা এবং রাজস্ব অফিস জ্বালিয়ে দেয়। তারা থানা থেকে ৮টি রাইফেল, ৫টি শর্টগান এবং ৪০ রাউন্ড গুলি দখল করে। এই খবর পেয়ে নরসিংদী থেকে পাকসেনাদের একটি কোম্পানি ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের গেরিলারা আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ছিল। পুটিঘরের নিকট আমাদের একটি গেরিলা দল পাকসেনাদেরকে আক্রমণের জন্য এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনারা এ্যামবুশের ফাঁদে পড়লে গেরিলারা গুলি চালায়। চারঘণ্টা সংঘর্ষের পর ৩৩টি মৃতদেহ ফেলে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে নরসিংদির দিকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে পাকসেনাদের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সেলিমও নিহত হয়। মৃতদেহ থেকে পরিচয়পত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র উদ্ধার এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের গেরিলারা হস্তগত করে। গেরিলারা নরসিংদীর বিভিন্ন মিলে গ্রেনেড এবং মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে মিলের ভিতর সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। ফলে পাকসেনারা একে একে সব মিলগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। পাকসেনাদের একটি দল ঝিনারদিতে

(ঘোড়াশালের নিকট) তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। আগস্ট মাসের ১৩ তারিখে দুপুর আড়াইটায় আমাদের একটি গেরিলাদল পাকসেনাদের এই ক্যাম্পটি অতর্কিতে আক্রমণ করে। আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধের পর একজন পাকসেনা নিহত হয় এবং ১৫ জন গেরিলাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। সাতজন পাকসেনা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। গেরিলারা জিনারদি রেল স্টেশনটিকে ধ্বংস করে দেয়। স্টেশনের টেলিফোন যোগাযোগের সেটটিও তারা ধ্বংস করে দেয়। টিকিট ও অন্যান্য কাগজপত্রও তারা জ্বালিয়ে দেয়। ক্যাম্প থেকে আমাদের গেরিলারা একটি হালকা মেশিনগান, ১১টি রাইফেল, হালকা মেশিনগানের ৪,৫০০ গুলি, ১টি স্টেনগান, ১০০ রাউন্ড স্টেনগানের গুলি, ১৪টি বেল্ট, ২৬ জোড়া বুট, ১৭ ব্যাগ আটা, ১১ পেটি দুধের টিন এবং আরো অন্যান্য জিনিসপত্র দখল করে এবং কয়েকদিন পর পাকসেনারা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমাদের গেরিলা ইউনিট হেডকোয়ার্টারে দু'দিক থেকে আক্রমণ করে। আমাদের গেরিলারা দুর্জয় সাহসের সঙ্গে তাদের সে আক্রমণের মোকাবিলা করে এবং আক্রমণ প্রতিহত করে। দু'ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। ১৪ আগস্ট পাকসেনাদের একটি দল ঝিনারদি স্টেশনের কাছে একটি গ্রামে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে আসে। এই খবর পেয়ে আমাদের একটি গেরিলা দল পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর দুটি মৃতদেহ ও কয়েকটি আহত সেনাকে ফেলে নরসিংদীর দিকে পালিয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা আহত পাকসেনাদেরকে পিছু ধাওয়া করে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এর দু'দিন পর ১৬ আগস্ট আমাদের আরেকটি গেরিলা দল নরসিংদী-তারাবো সড়কে পাঁচদোনার নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে প্রহরারত পাকসেনাদের একটি দলের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ প্রায় আধঘণ্টা চলে। আমাদের আক্রমণ প্রবল হওয়ায় আহত পাকসেনাদের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শোনা যায়। এমন সময় চার ট্রাক পাকসেনা তাদের সাহায্যে সেখানে উপস্থিত হয়। পাকসেনারা ভারি অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের গেরিলাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। ভারি অস্ত্রের মোকাবিলা করতে না পেরে আমাদের গেরিলারা বাধ্য হয়ে পিছু হটে আসে। পাকসেনাদেরকে পাঁচটি মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। পাকসেনারা নরসিংদীর নিকটস্থ আমাদের গেরিলা অবস্থানের খবর পেয়ে আগস্টের ২১ তারিখে প্রায় এক কোম্পানি শক্তি নিয়ে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে আমাদের একটি গেরিলা দল তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। প্রায় একঘণ্টা গোলাগুলির পর পাকসেনারা তাদের গোলাগুলি বন্ধ করে আমাদের অবস্থানের ২/৩ মাইল দূরে থাকতেই আর অগ্রসর না হয়ে পিছু হটে যায়।

আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু পাকসেনারাও খুব দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনগুলো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মেরামত করে ফেলে। এর ফলে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সীমিত পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ পায়। পাকসেনাদের বিদ্যুৎ সরবরাহে আরো বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য নতুন করে আরেকটি পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিতাস গ্যাসের পাইপ লাইনের নক্শা যোগাড় করি এবং পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, গ্যাসের পাইপ কেটে দিলে সিদ্ধিরগঞ্জ এবং

ঘোড়াশালের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রগুলো গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। হানাদার কর্তৃপক্ষ এইসব বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র চালাবার ব্যবস্থা করলে তাদের তেলের সংকট দেখা দেবে। পাইপ লাইন উড়িয়ে দেবার জন্য নরসিংদী এবং রূপগঞ্জের গেরিলাদের নির্দেশ দেই। আমার নির্দেশ অনুযায়ী ২০ আগস্ট রাত ১ টায় নরসিংদী গেরিলা ইউনিটের ডিমোলিশন পার্টি তিতাস গ্যাস লাইন বারুদ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। এই অপারেশন পুরোপুরি সফল হয়। বিস্ফোরণের ফলে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা প্রায় ১০ মাইল দূর থেকে যায় এবং ৬/৭ মাইল দূর থেকে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা যায়। ঘোড়াশালের উত্তরে সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। নরসিংদী, ঘোড়াশাল এবং পাঁচদোনাতে অবস্থানরত পাকসেনারা এই বিস্ফোরণের বিকট শব্দে ভীষণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অনেকেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং জিনিসপত্র ফেলে ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। পরে স্থানীয় লোকজনের মুখে শোনা যায় যে, পাকসেনারা ধারণা করছিল ভারতীয় বিমান বোমা ফেলেছে। এর পরদিন আশুগঞ্জের নিকটও কয়েক জায়গাতে পাইপ লাইন উড়িয়ে দেয়া হয়। এই গ্যাসের পাইপ লাইন মেরামত করতে বেশ ক'দিন সময় লাগে। ততদিন শিল্প-কারখানাগুলো বন্ধ থাকে।

রূপগঞ্জের একটি গেরিলা দল ২২ আগস্ট রাতে নরসিংদী এবং ঝিনারদি রেলস্টেশনের মাঝে রেল লাইনের নিচে মাইন পুঁতে রাখে। রাতে একটি ট্রেন দুটি বগীসহ সেখান দিয়ে চলে যায়। ট্রেন এবং বগী দুটি চলে যাবার সাথে সাথেই মাইনটি বিস্ফোরিত হয়। এতে ট্রেনটির ক্ষতি না হলেও রেল লাইনের অনেকখানি ধ্বংস হয়। আমাদের বৈদ্যেরবাজার থানার গেরিলা দল সোনারগাঁও এবং সিএন্ডবি রোডের অনেক জায়গায় মাইন পুঁতে রাখে। ১৬ আগস্ট রাতে পাকসেনাদের একটি ট্রাক মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয় এবং সাথে সাথে ১১ জন পাকসেনা ও তিনজন রাজাকার নিহত হয়। ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তায় ভাটেরচরের নিকটস্থ সড়কসেতুতে অবস্থানরত পাকিস্তানিদের ওপর আমাদের গেরিলারা ৩১ আগস্ট অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। সংঘর্ষে কয়েকজন পাকসেনা এবং রাজাকার নিহত হয়। গেরিলারা সেতুটির ৬০ ফুট লম্বা স্প্যান উড়িয়ে দেয়। তার পরিদন রাতে ঢাকা-দাউদকান্দি সড়কে বাউসিয়া এবং ভবেরচর সেতুটিও বিস্ফোরক লাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। পাকসেনারা ভবেরচর সেতুর যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য ফেরীর বন্দোবস্ত করে। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে আমাদের গেরিলারা ফেরীঘাট আক্রমণ করে এবং ফেরীটি ধ্বংস করে দেয়। এই আক্রমণে ফেরী থেকে চারটি ব্যাটারী মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয়।

নারায়ণগঞ্জ-দাউদকান্দি সড়কে গজারিয়াতে পাকসেনাদের একটি চেকপোস্ট ছিল। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে রাত ৮ টায় আমাদের গেরিলাদের একটি দল সেই চৌকিটি আক্রমণ করে। একঘণ্টা যুদ্ধে ৩ জন ইপিকাফ নিহত ও একজন বন্দি হয়। এখান থেকে ৫টি রাইফেল এবং ১৫০ রাউন্ড গুলি আমাদের গেরিলারা দখল করে। পরদিন ১০টি রাইফেল এবং ২০০ রাউন্ড গুলিসহ ১১ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ঢাকার মুন্সিগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ মহকুমার গেরিলারাও তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। গেরিলাদের একটি দল হরিরামপুর থানার নিকট পাকসেনাদের একটি লঞ্চ আক্রমণ করে। লঞ্চে পাকসেনারা হরিরামপুর অবস্থান থেকে তাদের সৈনিকদের জন্য রসদ নিয়ে যাচ্ছিল। একঘণ্টা গোলাগুলির পর ১১ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়। পাকসেনারা আর অগ্রসর হতে না পেরে লঞ্চ নিয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এর পরদিন হরিরামপুর থানার সেকেন্ড অফিসার এবং কয়েকজন পাকিস্তানি পুলিশ আমাদের গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিশদের নিহত করে আমাদের গেরিলারা ৩টি রাইফেল দখল করে নেয়। ঘিওর থানাতেও পাকসেনাদের একটি টহলদারী দলের উপর আমাদের গেরিলারা আক্রমণ চালিয়ে ৮ জন নিহত করে এবং ৮টি রাইফেল দখল করে। সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে নওয়াবগঞ্জ থানা আমাদের গেরিলারা আক্রমণ করে। এই আক্রমণে সেখানকার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গেরিলাদের হস্তগত হয়। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের গেরিলারা লৌহজং, শিবালয়, সিরাজদীখান এবং শ্রীনগর থানাগুলোতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাক পুলিশ হত্যা করে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শিবালয় থানার গেরিলা দল পাকসেনাদের একটি প্লাটুনকে টহল দেয়ার সময় এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে ১৩ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়। পাকসেনারা ঢাকা থেকে আরো সৈন্য এনে শিবালয়ে আমাদের গেরিলা দলটির ঘাঁটিতে ১৭ সেপ্টেম্বর আক্রমণ চালায়। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে ১০ জন পাকসেনা এবং ১১ জন রাজাকার নিহত হয়।

১৯ সেপ্টেম্বর আমাদের গেরিলারা মালোচিন বাজারে অবস্থানরত পাক পুলিশের একটি দলকে আক্রমণ করে ১৯ জন পাক পুলিশকে নিহত এবং ৩ জনকে আহত করে। ঘোড়াশালের গেরিলা দল ৯ আগস্ট রাতে আড়াইহাজার থানার নিকটে পুরিন্দা বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনে আক্রমণ চালায়। এই ঘটনার দুই দিন পর সিদ্ধেশ্বরী-ঘোড়াশালের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ক্ষতিসাধন করে। গেরিলা দল মাশরেকী জুট মিলস লিমিটেডের বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। ফলে ঐ এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কলকারখানাগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা রূপগঞ্জের নিকট যে গ্যাস লাইন ধ্বংস করে দিয়েছিল পাকসেনারা পশ্চিম পাকিস্তানি প্রকৌশলীদের দ্বারা তা মেরামত করে নেয়। এই সংবাদ আমার হেডকোয়ার্টারে যথাসময়ে পৌঁছে। এই গ্যাস লাইনকে পুনরায় ধ্বংস করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘোড়াশালের নিকট গ্যাসলাইনটি নদীর মাঝে ক্ষতি করার জন্য নির্দেশ দেই। ঘোড়াশালের নিকট গ্যাসলাইনটি মেঘনা নদীর মাঝ দিয়ে গেছে। নির্দেশ অনুযায়ী গেরিলারা লাইনটির পথ গোপনে অনুন্ধান করে। ৯ সেপ্টেম্বর রাতে নৌকার সাহায্যে নদীর মাঝামাঝি জায়গায় যায় এবং প্রায় ১৫/২০ ফুট পানির নিচে অবস্থিত গ্যাস পাইপে ডিমোলিশন দ্বারা 'ডিলে সুইচ' (বিলম্বে কার্যকরী সুইচ)-এর সাহায্যে পাইপটি উড়িয়ে দেয়। ফলে গ্যাস পাইপের ভিতর পানি ঢুকে যায়। এতে গ্যাস সরবরাহ অনেক দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আড়াইহাজার থানার

গেরিলারা জানতে পারে যে, পাকসেনারা কামানদি চরে তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং স্থানীয় লোকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আরও জানতে পারে যে, পাকসেনারা নিকটস্থ গ্রাম থেকে মেয়েদের তাদের ক্যাম্প ধরে নিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে ২৯ জন গেরিলার একটি দল ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাকসেনাদের ঘাঁটি আক্রমণ করে। ৩/৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাঁচজন পাকসেনা এবং ৬ জন রাজাকার নিহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। গেরিলারা ক্যাম্প থেকে মেয়েদেরকে উদ্ধার করে তাদের স্ব স্ব বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়।

পাকসেনারা সিরাজদীখান থানার আবদুস সালাম নামক আমাদের একজন গেরিলাকে গ্রেফতার করে তালতলা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। স্থানীয় প্রায় ৫০ জন গেরিলার একটি দল পরদিন রাত সাড়ে আটটায় এই ক্যাম্পটির উপর আক্রমণ চালায়। তারা প্রায় তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর একজন পাকিস্তানি সুবেদার মেজরসহ কিছু সংখ্যক পাকসেনা, পাকপুলিশ ও রাজাকারকে হতাহত করে আবদুস সালামকে উদ্ধার করে আনে। এই ঘটনার একদিন পর নওয়াবগঞ্জ থানার গেরিলারা একটি লঞ্চকে (এমএল পয়েন্টার) পাকসেনা বহন করে নওয়াবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬ টার সময় লঞ্চটি যখন গালিমপুরের নিকট পৌঁছে তখন আমাদের গেরিলারা লঞ্চটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে প্রথমেই পাকসেনাদের কিছু লোক হতাহত হয়। পাকসেনারা লঞ্চটিকে পিছু হটিয়ে পাড়ে অবতরণের চেষ্টা করে। আমাদের গেরিলারা আবার তাদের উপর আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ ২৫ তারিখ দুপুর পর্যন্ত চলে। শেষ পর্যন্ত আমাদের গেরিলারা পাক সেনাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে পিএসএস ৯১৩৩ ক্যাপ্টেন জাফর আলী খান, সুবেদার আবদুল্লাহ, ৪৪ জন পাকসেনা এবং একজন বাঙালি পথপ্রদর্শক পুলিশ নিহত হয়। লঞ্চটিকে পরে ডুবিয়ে দেয়া হয়। আমাদের দু'জন গেরিলা আবদুর রহিম এবং মুহম্মদ আলী শহীদ হন। এই খবর পেয়ে পাকসেনারা আরেকটি লঞ্চে করে বড় খাল দিয়ে নওয়াবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের গেরিলাদের ৪০ জনের আরেকটি দল পাকসেনাদের লঞ্চটিকে ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৭ টার সময় অতর্কিতে আক্রমণ করে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে ৩ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। পাকসেনারা লঞ্চটির দিক পরিবর্তন করে দ্রুত নাগালের বাইরে চলে যায়। ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ১ টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল নওয়াবগঞ্জের দিকে আবার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। এই সংবাদ নওয়াবগঞ্জের গেরিলা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ৫০ জনের একটি শক্তিশালী দল গালিমপুরের নিকট পাকসেনাদের জন্য এ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পাকসেনারা গালিমপুরে এ্যামবুশের আওতায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গেরিলারা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণে একজন ক্যাপ্টেনসহ ৩৫ জন পাকসেনা নিহত এবং অনেকে আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের কিছু আহত লোককে নিয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা একটি এলএমজি, ৩টি স্টেনগান, প্রচুর গুলি ও বেশকিছু রাইফেল দখল করে। এর দু'দিন পর পাকসেনারা আরো শক্তিশালী হয়ে বড় খাল এবং আড়িয়াল বিল দিয়ে আবার অগ্রসর হবার চেষ্টা

করলে আমাদের গেরিলারা অতর্কিতে আক্রমণ করে। গেরিলারা তাদের এই চেষ্টাকেও ব্যর্থ করে দেয়। প্রায় তিনদিন ধরে পাকসেনারা অগ্রসরের চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের গেরিলারা তাদের প্রতিবারের চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দেয়। তিনদিনের যুদ্ধে ২০ জন পাকসেনা নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। অপরপক্ষে আমাদের একজন শহীদ এবং কিছুসংখ্যক গেরিলা আহত হয়। অক্টোবরের প্রথম তারিখ পর্যন্ত নওয়াবগঞ্জের সম্পূর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে। দোহার থানার পাকসেনারাও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের চাপে দুর্বল হয়ে পড়ে। ২৭ সেপ্টেম্বর পাকসেনাদের একটি দল মাগুলা বাজার থেকে তাদের রসদ নিয়ে দোহার থানার ক্যাম্পে যাবার পথে আমাদের গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রমণে ১৪ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। পাকসেনাদের সমস্ত রসদ মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। এরপর দোহার থানার পাকসেনাদের ক্যাম্পের সৈনিকরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্যাম্পের বাইরে আসা বন্ধ করে দেয়।

২৪ সেপ্টেম্বর লৌহজং থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ১৮ হাজার মণ পাটবাহী একটি জাহাজ পদ্মা নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। অক্টোবর মাসে পাকিস্তানিরা আবার ঢাকাতে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং ঢাকা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করে তোলে। পাক সামরিক জান্তা সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বাণিজ্য এবং শিল্প ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করে তোলার চেষ্টা করে। এ সময় আমরা ভবিষ্যতে ব্যাপক আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ফলে ঢাকা শহরে আমাদের গেরিলাদের কার্যকলাপও কিছুটা শিথিল করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হানাদার বাহিনীর স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টার খবর পেয়ে আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে একটি গেরিলা দলকে একটি বিশেষ মিশনে প্রেরণ করি। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গেরিলাদল একটি গাড়ির পেছনে ২৫ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ নিয়ে গাড়িটিকে তদানীন্তন ইপিআইডিসি এবং হাবিব ব্যাংকের সামনে পার্ক করে রাখে।

সে সময় এই ব্যাংকে যথেষ্ট পরিমাণ পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর আনাগোনা ছিল। এছাড়াও এই ব্যাংকটি পাকিস্তানিদের বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে অর্থ পাচারে সাহায্য করছিল। গেরিলারা দুপুর সাড়ে ১১ টার দিকে গাড়িতে ভর্তি বিস্ফোরণের বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে এই গাড়ির পার্শ্ববর্তী পার্ক করা ১০/১২টি গাড়ি ধ্বংস হয় এবং হাবিব ব্যাংকের বেশ ক্ষতি হয়। বিস্ফোরণে প্রায় ২৫ পাকিস্তানি ব্যবসায়ী আহত হয়। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে এবং ধ্বংস দেখে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় সমস্ত জনতা ছুটে পালায় এবং সকল ব্যবসাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি ব্যবসায়ী মহলের মধ্যেও একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান রেডিও'র ঢাকা কেন্দ্র থেকে এই বিস্ফোরণের ঘটনা স্বীকার করা হয়। হেডকোয়ার্টার থেকে ২ টি ৮১ মি.মি. মর্টারসহ একটি ডিটাচমেন্ট ঢাকাতে পাঠাতে হয়। এই ডিটাচমেন্টকে ঢাকা বিমান বন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পাকসেনাদের ওপর এবং পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর ঘাঁটির উপর শেল নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়ে

পাঠানো হয়। আমাদের এই দলটি হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকার পূর্বে এসে তাদের বেইস স্থাপন করে। এরপর একটি ছোট রেকি দল বিমানবন্দর ও ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিকে ৩/৪ দিন অনুসন্ধান চালায়। এই সময়ে পাকসেনারা বিমান বন্দর এবং ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাংকার তৈরি করে এবং টহল দিয়ে আমাদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। যেহেতু মর্টারের শেল চার হাজার গজ দূরত্বের বেশি নিক্ষেপ করা যায় না এবং মর্টার ফায়ার করার সময় ফ্লাশ এবং মর্টার পজিশন থেকে শব্দ শুনে পাকিস্তানি টহলদারী সৈনিকরা এর অবস্থান খুঁজে বের করতে পারে সেহেতু অনুসন্ধান চালবার পর আমাদের দলটি বাড্ডার নিকট থেকে ৯ অক্টোবর রাত ১ টা ৪০ মিনিটের সময় মর্টারের গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। ৬টি গোলা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটি লাইনের মধ্যে পড়ে। এতে ১৪ জন পাকসেনা নিহত হয়। কয়েকটি গোলা বিমানবন্দরের নিকট পড়ে কিন্তু কোনো এয়ারক্রাফ্‌ট-এর ক্ষতি সাধিত হয়নি। আরো কয়েকটি গোলা পাক টোবাকো কোম্পানির ফ্যাক্টরীতে পড়ে। এতে ফ্যাক্টরীর বেশ ক্ষতি হয়। কয়েকটি গোলা মহাখালী হাসপাতালের নিকটে রাস্তায় পড়ে। এই অতর্কিত মর্টার আক্রমণের ফলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরে আমাদের কাছে খবর পৌঁছে যে, পাকিস্তানিরা ভেবেছিল মুক্তিবাহিনী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সমস্ত পাকসেনারা চতুর্দিকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে—স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং ট্যাংকসহ গুলশান এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সমস্ত রাত পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে থাকে এবং সারারাত গোলাগুলি চালায়। আমাদের দলটি আরো কয়েকটি গোলা নিক্ষেপ করে পাকসেনাদেরকে আরো ব্যতিব্যস্ত করে সেখান থেকে সরে পড়ে।

১১ অক্টোবর দুপুর ১২ টার সময় আমাদের গেরিলারা তিতাস গ্যাস পাইপ লাইন আবার বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ঢাকার গ্যাস সরবরাহ পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল পিলখানাতে অবস্থান করছিল। পিলখানার পাশের রাস্তা দিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে পাকসেনাদের অনেক গাড়ি যাতায়াত করতো। আমাদের আজিমপুরের গেরিলা দল সেই রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখে। ১৬ অক্টোবর রাত সাড়ে ৯ টায় পাকসেনাদের একটি জীপ এই রাস্তায় টহল দেবার সময় মাইনের আঘাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪ জন পাকসেনা নিহত এবং ২ জন গুরুতররূপে আহত হয়। এর একদিন পর ২ জন পাক পুলিশ মিরপুর রোডে টহল দেবার সময় ধানমণ্ডির নিকট আমাদের গেরিলাদের হাতে নিহত হয়।

ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা এবং পাকসেনাদের নাজুক অবস্থা বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলো থেকেও ব্যাপক প্রচার করা হয়। এছাড়া এসব খবর ভয়েস অব আমেরিকা এবং বিবিসি থেকেও প্রচারিত হয়। ফলে হানাদার অধিকৃত এলাকার জনগণের মনেও মুক্তিসংগ্রামের সাফল্য সম্পর্কে নতুন আশার সৃষ্টি হয়।

৩০ আগস্ট পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল শালদা নদীর দক্ষিণ প্রান্তে সমবেত হয় এবং বিধ্বস্ত রেলওয়ে সেতুর উপর বাংকার তৈরি করার প্রস্তুতি নেয়। আমাদের

একটি পেট্রোল পার্টি তাদের উপর গুলি চালিয়ে বেশকিছু পাকসেনাকে হতাহত করে। পাকসেনারা পিছু হটে যায়। পরদিন সকাল ৮ টায় পাকসেনারা অগ্রসর হয়ে আবার বাংকার তৈরি করার চেষ্টা করে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ৬ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেক হতাহত করে। এরপর পাকসেনারা তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। পাকসেনাদের ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত কামানগুলো এরপর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানির অবস্থানের উপর ব্যাপকভাবে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এতে আমাদের একজন সৈনিক শহীদ এবং ২/৩ জন আহত হয়। পাকসেনাদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য কোনাবন থেকে ক্যাপ্টেন গাফফার ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানিকে চান্দলা পাঠান। এই কোম্পানিটিও ৩০ আগস্ট বিকাল ৪ টায় পাকসেনাদের একটি দলের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৯ জন পাকসেনা ও ২৪ জন রাজাকারকে নিহত করে। সংঘর্ষে অনেক পাকসেনা আহত হয়। পরে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ব্রাহ্মপাড়ার দিকে পালিয়ে যায়। ফলে ১টি হালকা মেশিনগান, ৩টি রাইফেলসহ অনেক গোলাবারুদ আমাদের সৈনিকরা দখল করে। এর পরদিন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের একটি দলকে মন্দভাগ বাজারের পূর্ব পাশে শালদা নদীতে আক্রমণ করে। পাকসেনাদের এই দলটি নৌকাযোগে মন্দভাগ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আক্রমণে একটি নৌকা ডুবে যায় এবং ২০ জন পাকসেনা নিহত ও বেশকিছু আহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। পাকসেনারা মন্দভাগ, সেনেরহাট, চান্দলা প্রভৃতি এলাকায় অবস্থিত আমাদের অবস্থানের ওপর তাদের চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে থাকে। ৩০ আগস্ট বিকেল ৪ টার সময় পাকসেনারা চারটি নৌকা বোঝাই করে এসে ছোট চান্দলা নিকট অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ১৫ জন পাকসেনাকে নিহত করে। এরপর পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের ওপর ব্রাহ্মণপাড়া এবং শাকুটিতে অবস্থিত মর্টার এবং কামানের সহায়তায় চড়াও হবার চেষ্টা করে। আমাদের সৈনিকরাও সাহসের সঙ্গে পাকসেনাদের এই আক্রমণ প্রতিহত করে। উল্লেখ্য যে, পাকসেনারা প্রায় তিন কোম্পানি সৈন্যশক্তি নিয়ে এই আক্রমণ পরিচালনা করে। সারারাত ধরে এই আক্রমণ অব্যাহত থাকে। এই আক্রমণে একজন অফিসারসহ ৩০ জন পাকসেনা নিহত এবং বেশ কিছু আহত হয়। পাকসেনারা পরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। আমাদের ২ জন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতরভাবে এবং ৬ জন সামান্য আহত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর পাকসেনারা আমাদের চান্দলা ও শীতলা অবস্থানের ওপর দু'দিক থেকে আক্রমণ চালায়। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। পাকসেনাদের পক্ষে অনেক হতাহত হয় তবে সঠিক ক্ষতির পরিমাণ জানা সম্ভব হয়নি। পরাজয়ের গ্লানিতে পশ্চাদপসরণকারী পাকসেনারা মনের আক্রোশে ব্রাহ্মণপাড়া, ছোট চান্দলা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় ও নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। দুই/তিন দিন বিরতির পর পাকসেনারা আবার আমাদের সেনেরহাট অবস্থানের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। সেনেরহাট অবস্থানটি দখল করে নেবার জন্য পাকসেনারা

সেনেরহাটের পশ্চিমে এবং শালদা নদী স্টেশনের পশ্চিমে বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। তারা দু'দিক থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। পাকসেনাদের সমাবেশের কৌশল দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, পাকসেনারা মন্দভাগের পশ্চিমে আশাবাড়ি পর্যন্ত আমাদের দখলকৃত সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে তাদের পক্ষে কসবা এবং মন্দভাগ পুনর্দখল করা সহজ হবে। পাকসেনাদের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে আমরা সেনেরহাট অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করে তুলি। ৮ সেপ্টেম্বর সকালে পাকসেনারা তাদের নয়ঘরে অবস্থিত ১২০ এমএম মর্টার, ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত কামান এবং শশীদলে অবস্থিত ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে আমাদের সেনেরহাট অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে—সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা সেনেরহাট অবস্থানের দিকেও অগ্রসর হতে থাকে। পাকসেনাদের কামানের গোলায় আমাদের বেশকিছু লোক শহীদ ও আহত হয়। পাকসেনাদের রকেট লঞ্চারের গোলায় আমাদের ৪টি বাংকার ধ্বংস হয়ে যায়। পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের দেড়শ গড় পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। কিন্তু এতদত্ত্বেও আমাদের সৈনিকরা এতটুকু মনোবল না হরিয়ে বরং দৃঢ়তার সঙ্গে পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। আমাদের সৈনিকদের গুলিতে অগ্রসরমান অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। আমাদের মুজিব ব্যাটারী গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের উপর গোলাবর্ষণ করে অনেক পাক সৈন্যকে হতাহত করে। পাকসেনারা সমস্ত দিন তাদের আক্রমণ চালিয়ে আমাদের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে এবং তাদের অনেক হতাহত হওয়াতে সন্ধ্যায় তাদের আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়। এর পরদিন পাকসেনারা আমাদের মন্দভাগ এবং মইনপুর অবস্থানের ওপরও আক্রমণ চালায়। সেই আক্রমণও একইভাবে প্রতিহত করা হয়। যাবার পথে পরাজয়ের আক্রোশে সকাল ৭ টার সময় পাকসেনাদের প্রায় দুই কোম্পানি সৈন্য প্রবল কামানের গোলার সহায়তায় আমাদের মইনপুরের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দু'ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনাদের প্রায় ৪০ জন সৈন্য হতাহত হয়। আমাদের সৈন্যরা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সেই আক্রমণকেও প্রতিহত করে। আমাদের পক্ষে ৯ জন সৈন্য আহত হয়। পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবল গোলাবর্ষণের জন্য আমাদের সৈনিকদের পক্ষে আমাদের অবস্থানে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের সৈনিকরা সে অবস্থান পরিত্যাগ করে ৬০০ গজ পিছনে বায়েকের নিকট জেলা বোর্ডের রাস্তায় নতুন অবস্থান গড়ে তোলে। পাকসেনারা এই অবস্থানের ওপরও আক্রমণ চালায়। তাদের সেই আক্রমণকে আমাদের সৈনিকরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করে। পাকসেনারা আর অগ্রসর হতে না পেরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। পাকসেনারা মনোরা, বাগরা, নাগাইশ, দুশিয়া, বড়দুশিরা, ধান্দুহল, সিদলাই প্রভৃতি প্রায় একশ'টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। ৯ সেপ্টেম্বর রাতে ক্যাপ্টেন গাফ্ফার একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও ৭৫ মি.মি. আরআরসহ পাকসেনাদের অবস্থানের দিকে পাঠিয়ে দেন। এই দলটি শালদা নদীর উত্তর তীর দিয়ে লক্ষ্মীপুরস্থ পাকসেনাদের অবস্থানের পেছনে অনুপ্রবেশ করে এবং দু'দিন রেকি করার পর ১১

সেপ্টেম্বর বিকাল ৫ টার সময় পাকসেনাদের অবস্থানের অতি নিকটে পৌঁছে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। এতে শত্রুদের দুটি বাংকার রকেটের গোলায় ধ্বংস হয়। গোলার আঘাতে ১১ জন শত্রুসৈন্য নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। পাকসেনারা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামের মধ্যে কামানের গোলাবর্ষণ করে। এরপর আমাদের রেইডিং পার্টি ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ৮ টায় কায়েমপুরে পাকসেনাদের আরো দুটি বাংকার রকেটের সাহায্যে ধ্বংস করে। এতে ৮ জন পাকসেনা নিহত ও ৩ জন জন আহত হয়। পাকসেনাদের দুটি নৌকাকেও এ্যামবুশ করে ডুবিয়ে দেয়া হয়। এতে ১৬ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টার সময় আমাদের আরেকটি রেইডিং পার্টি লক্ষ্মীপুরের নিকট পাকসেনাদের দুটি বাংকার অতর্কিত আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। এতে ৩ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৬ টায় লক্ষ্মীপুরস্থ পাকসেনাদের আরো দুটি বাংকার রকেটের গুলিতে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে দু'জন পাকসেনা নিহত এবং একজন আহত হয়।

ফরিদপুরে আমাদের মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। ৩ আগস্ট বিকাল ৪ টার সময় আমাদের গেরিলারা মাদারীপুরের ভাঙ্গা এবং মুতাফিজ সেতুগুলোতে পাহারারত শত্রুসেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণে তারা সেতুগলো ধ্বংস করে দেয় ও ৭টি রাইফেল দখল করে। ১০ তারিখে মিঠাপুরের ডাকঘর এবং ইউসুফপুরের তহসীল অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ১৪ তারিখে সকাল ৬ টায় আমগ্রামের সমাদ্দার সেতু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ঐ দিনই গেরিলাদের আরেকটি দল পাকসেনাদের একটি গাড়ি মাদারীপুর-টেকেরহাট রাস্তায় গাটমাকির নিকট এ্যামবুশ করে। গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে ৯ জন পাকসেনা আহত হয়।

২৭ আগস্ট আমাদের একটি টহলদার দল পরশুরাম থানার নিকট পাকসেনাদের একটি টহলদারী দলকে এ্যামবুশ করে ৭ জন পাকসেনাকে নিহত করে। দুইঘণ্টা সংঘর্ষের পর পাকসেনারা মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে আমাদের গেরিলাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পালাতে সক্ষম হয়। আরেকটি দল ফেনী-বিলোনিয়া সড়কের উপর হাসানপুর সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। শালদা নদীর নিকটে আমাদের একটি টহলদার দল দু'জন পাকসেনাকে রাতে টহল দিতে দেখে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে দু'জন পাকসেনাই নিহত হয়। নিহত পাকসেনাদের পকেট থেকে পাওয়া কাগজপত্রে তাদের নাম পাওয়া যায়। এদের একজনের নাম হাবিদার আবদুল আজিজ এবং অপরজনের নাম ছিল হাবিলদার রহমান গুল। ২০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪ টায় পাকসেনাদের একটি দল আমাদের শালদা নদী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের সৈনিকদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন গাফ্ফার একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি নিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর কায়েমপুরে পাকসেনাদের অবস্থানের পিছনে অনুপ্রবেশ করে। পরদিন ভোরে রেকি করার পর সকাল ১০ টায় পাকসেনাদের পেছনদিকের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে পাকসেনারা

হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং আতঙ্কিত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। আমাদের রেইডিং পার্টির গুলিতে ৩২ জন পাকসেনা নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। এরপর আমাদের দলটি আক্রমণ প্রত্যাহার করে শত্রু অবস্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসে। পাকসেনাদের একটি দল কায়েমপুরে তাদের অবস্থানের দিকে নৌকাযোগে অগ্রসর হবার পথে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের ওপরও অতর্কিত আক্রমণ চালায়। দুটি নৌকা আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এতে ১৫ জন পাকসেনা নিহত হয়।

আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের ওপর তাদের হামলা চালিয়ে যেতে থাকে। পাকসেনাদের চাপও আমাদের ওপর থেকে ধীরে ধীরে কমে যায়। পাকসেনারা তাদের বিপর্যস্ত অবস্থানগুলো বাঁচানোর জন্য ভারি তোপের সাহায্যে আমাদের মন্দভাগ কোনাবন এবং শালদা নদীর অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। এতে আমাদের ২ জন নন-কমিশন্ড অফিসার ও ১ জন গোলন্দাজ বাহিনীর ওপি শহীদ হয়। পাক সেনাদের একটি জঙ্গী বিমান ২৮ সেপ্টেম্বর তাদের সেনাদের সাহায্যের জন্য দুপুর ২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালায়। পাকসেনাদের অবস্থানগুলো আমাদের আক্রমণে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে আমরা বুঝতে পারি এবং তাদেরকে পূর্ণভাবে এই এলাকা থেকে হটিয়ে দেয়ার জন্য ২৭ তারিখে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮ তারিখ সাড়ে ১০ টার সময় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের একটি শক্তিশালী দল উত্তর দিক থেকে কায়েমপুরের শত্রু অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ৪ ঘন্টা স্থায়ী যুদ্ধের পর পাকসেনাদের ১৫ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। আমাদের কিছুসংখ্যক যোদ্ধাও শহীদ এবং আহত হয়। আমাদের সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকসেনারা তাদের কায়েমপুর ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আমাদের সৈন্যরা তাদের পরিত্যক্ত অবস্থান থেকে মেশিনগান, মর্টার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ দখল করে নেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখে আমাদের সৈন্যরা এইসব অবস্থানগুলো থেকে শত্রুর প্রবল চাপের মুখে পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। ফলে শত্রুরা এইসব জায়গা দখল করে নেয়। এর এক সপ্তাহ পরেই আমরা পুনরায় পাল্টা আক্রমণ চালাই। এই পাল্টা আক্রমণের ফলে প্রায় ২০১ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮৩ জন আহত হয়, ৭০টি বাংকার ধ্বংস করা হয় এবং অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি সে তুলনায় ছিল অতি অল্প—১০জন শহীদ এবং ৬ জন আহত হয়। আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের দখলকৃত কায়েমপুর, শ্রীপুর, মইনপুর, কামালপুর, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি জায়গা পুনরুদ্ধার করে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত দেউসসহ মন্দভাগের পশ্চিমের বিস্তীর্ণ এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করা হয়। এর ফলে পাকসেনাদের মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন এবং তার পশ্চিমে আশাবাড়ি পর্যন্ত আমাদের দখলে থাকা এলাকা পুনরুদ্ধারের সমস্ত আশা ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে পড়ে এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

কসবার পশ্চিমে টি. আলীর বাড়ির নিকট অবস্থিত পাকসেনাদের অবস্থানগুলোর উপর আমাদের সৈনিকরা ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছিলো। ২৮ আগস্ট ক্যাপ্টেন

আইনুদ্দিন ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি থেকে একটি প্লাটুন পাক অবস্থানের পিছনে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের কাছে খবর ছিল পাকসেনারা তাদের অগ্রবর্তী অবস্থাগুলোতে নৌকার সাহায্যে সরবরাহ কাজ চালাচ্ছে। এই প্লাটুনটিকে পাক সেনাদের সরবরাহকারী নৌকাগুলো এ্যামবুশ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। প্লাটুনটি ২৯ তারিখ সকালে পাকসেনাদের পেছনে জলপথের ওপরে এ্যামবুশ লাগিয়ে বসে থাকে। বেলা ২-৪০ মিঃ পাকসেনাদের দুটি নৌকা সেদিকে অগ্রসর হয়। এ্যামবুশের আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈনিকরা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড গোলাগুলির পর তাদের দুটি নৌকাই ডুবিয়ে দেয়া হয় এবং সেই সঙ্গে ৩০ জন পাকসেনাই নিহত হয়। আমাদের একজন সৈনিক শহীদ হয়। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানির আরও দুটি প্লাটুন সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত লাটুমুড়া, তাজিশ্বর, ফতেহপুর, চারনল বগাবাড়ি প্রভৃতি স্থানে পাকসেনাদের অতর্কিত আক্রমণ করে ৩৬ জন খানসেনা ও ১৭ জন রাজাকারকে নিহত ও আহত করে। পাকসেনারা এই এলাকায় আমাদের সৈনিকদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে একটি শক্তিশালী দল তাজিশ্বর এবং বগাবাড়ির দিকে ১১ সেপ্টেম্বর অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই দলটির অগ্রসরের খবর আমাদের কাছে আগে পৌঁছে যায়। 'ডি' কোম্পানির দুটি প্লাটুন বগাবাড়ির নিকট পাকসেনাদের পথে এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ১১ তারিখ সকাল ৬ টার সময় অগ্রগামী পাকসেনা দলটি আমাদের এ্যামবুশের আওতার পড়ে যায়। আমাদের সৈনিকরা তাদের অতর্কিত আক্রমণ করে। প্রবল আক্রমণের মুখে পাকসেনারা টিকতে না পেরে আবার পশ্চাদপসরণ করে। এই যুদ্ধের ফলে ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ২ জন আহত হয়। পাকসেনাদের এই এলাকায় বিপর্যস্ত অবস্থায় তাদের সাহায্যের জন্য ১৩ তারিখে পাকসেনাদের পাঁচটি জঙ্গিবিমান বিকাল ৫ টার সময় আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর একঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে। পাকসেনাদের বিমান হামলা আমাদের সৈনিকদের মনোবল ভাঙতে পারেনি। তারা তাদের অবস্থানে শত্রুর চাপের মুখেও অটল থাকে। পাকসেনাদের সংঘর্ষ উপরোল্লিখিত এলাকায় এর পরেও অব্যাহত থাকে।

পাকসেনারা এই সেক্টরে আরও সৈন্যসমাবেশ করতে থাকে। তাদের অবস্থানগুলোর দিকে পাকসেনাদের অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা দেওয়া জন্য ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি ১৬ সেপ্টেম্বর শত্রুর অবস্থানের পেছনভাগে মেহারী গ্রামে একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ১৭ তারিখ সকাল ৭ টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়ে আমাদের অবস্থানে আক্রমণের জন্য মেহারীতে আমাদের অ্যামবুশ এর নিকট সম্মিলিত হয়। পাকসেনারা সমবেত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। নিজেদের অবস্থানের এত কাছে তারা আক্রান্ত হবে তা তারা ভাবতেও পারেনি । ফলে এই আকস্মিক আক্রমণে তারা দিকবিদিক হারিয়ে ফেলে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। পাক গোলন্দাজ বাহিনী কামানের গোলাতে তাদেরকে পালাতে সহায়তা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের নিজেদের কামানের গোলাতেও তাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। এই এ্যামবুশে

পাকসেনাদের ২১ জন নিহত এবং ৪৩ জন আহত হয়। আমাদের সৈন্যরা নিরাপদে পিছু হটে আসতে সক্ষম হয়। ঐদিন রাত্রে আমাদের এই দলটি সায়েদাবাদের নিকট পাকসেনাদের একটি ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে দু'টো জীপ ও ১টি ৩টন গাড়ি ধ্বংস করে দেয়। এর পরদিন আমাদের রেইডিং পার্টি চারগাছা বাজারের নিকট পাকসেনাদের একটি টহলদার দলকে এ্যামবুশ করে ২০ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। পাকসেনারা এই সংবাদ পেয়ে তাদের টহলদার দলের সাহায্যার্থে একটি শক্তিশালী দল তিনটি নৌকা বোঝাই করে চারগাছার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু পৌঁছার আগেই আমাদের সৈনিকরা তাদেরকে শিমরাইলের নিকট এ্যামবুশ করে দুটি নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুটি নৌকা ভর্তি পাকসেনাদের সবাই নিহত হয়। এই সংঘর্ষে আমাদের ১ জন সৈনিক শহীদ হয়। আমাদের সৈনিকদের জন্য এই এলাকার পাকসেনাদের এহেন বিপর্যয়ের ফলে তারা পুনরায় আরো ব্যাপকভাবে এই এলাকায় সৈন্য সমাবেশ ঘটায় এবং চাপ বৃদ্ধি করতে থাকে। এতে আমরা আরেক অসুবিধার সম্মুখীন হই। ঢাকাতে এবং ফরিদপুরে যেসব গেরিলাদের পাঠানো হতো তারা এই এলাকার ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতো। পাকসেনাদের তৎপরতার জন্য সমস্ত অনুপ্রবেশ পথগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ২২ সেপ্টেম্বর আমাদের ৬০ জন গেরিলার একটি দল চারটি নৌকায় অনুপ্রবেশের পথে পাকসেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে দুটি নৌকা ডুবে যায়। চারজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। তিনটি স্টেনগান, চারটি রাইফেল এবং কিছু টাকা ও ১০০০ গুলি পানিতে পড়ে হারিয়ে যায়। গেরিলারা আহত ও শহীদদের নিয়ে আমাদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আমি মেজর আইনুদ্দীনকে যেকোনো উপায়ে এই এলাকাকে পুনঃমুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেই। তাকে আরেকটি অতিরিক্ত দল দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করে কসবা থেকে নবীনগর পর্যন্ত আমাদের তৎপরতা বাড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিই। পাকসেনাদের বিভিন্ন ঘাঁটির উপর বারবার আক্রমণ করে তাদেরকে এই এলাকা থেকে বিতাড়িত করার জন্য সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়। শক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে মেজর আইনুদ্দীন তার তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১০/১২টি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি কসবা, সাইদাবাদ, চরগাছা প্রভৃতি এলাকাতে পাঠিয়ে দেয়। এই রেইডিং পার্টিগুলো বিভিন্ন স্থানে পাকসেনাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ৩০ জনকে আহত করে ও ১টি গাড়ি ধ্বংস করে। আমাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে সমস্ত এলাকাতে আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ২৪ সেপ্টেম্বর সকাল ৭-৩০ টার সময় পাকসেনাদের একটি শক্তিমালী দল ১৭টি নৌকায় আমাদের একটি রেইডিং পার্টিকে আক্রমণ করার জন্য নবীনগরের দিকে অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের নৌকাগুলো যখন বিদ্যাকোট গ্রামের নিকট পৌছায় তখন আমাদের সৈনিকরা তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে পাঁচটি নৌকা ডুবে যায় এবং অন্তত ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং পঁয়ত্রিশ জন আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এই সকল আক্রমণে সে এলাকার

সমস্ত জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং বিপুল আনন্দে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অভিনন্দিত করে। এর কয়েকদিন পর ৩ অক্টোবর পাকসেনাদের একটি লঞ্চ গোলাবারুদ ও রসদ নিয়ে সাইদাবাদ যাবার পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা মলুগ্রামে আক্রান্ত হয়। আক্রমণের ফলে লঞ্চটির গোলাবারুদে আগুন লেগে ডুবে যায়। সেই সঙ্গে ১০ জন পাকসেনা নিহত ও আহত হয়। আমাদের ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং ২ জন আহত হয়। এই খবর পেয়ে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল আরেকটি লঞ্চযোগে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে চরগাছার নিকট আক্রমণ করে। প্রায় ২/৩ ঘণ্টা যুদ্ধের পর অনেক পাকসেনা লঞ্চ থেকে ঝাঁপিয়ে পালাবার চেষ্টা করে এবং ডুবে যায়। পাকসেনাদের ৭০/৮০ জন নিহত ও আরো অনেক আহত হয়। লঞ্চটিরও বেশ ক্ষতি হয় এবং বহু কষ্টে বাকী সৈন্যদের নিয়ে লঞ্চটি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। ঐ দিনই বিকেল ৫ টার সময় পাকসেনাদের ২০টি নৌকা ও ৩টি স্পীডবোট আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা কসবার নিকট আক্রান্ত হয়। ফলে ৩য় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কমাণ্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জামান ও একজন ক্যাপ্টেনসহ ১২ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং তিনটি স্পীডবোট ও কয়েকটি নৌকা ডুবে যায়।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই এলাকায় ছোট ছোট এ্যামবুশ এবং ছোট ছোট আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ৩ ও ৪ অক্টোবরে চারগাছা, মলুগ্রাম, কসবা প্রভৃতি জায়গায় পাকসেনাদের অন্তত ২৫০ থেকে ৩০০ সৈনিক নিহত হয়। ১টি লঞ্চ, ৩টি স্পীডবোট ও ১০টি নৌকা ডুবে যায় এবং অন্য আরেকটি লঞ্চ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় লক্ষাধিক পরিমাণের গোলাবারুদ পানিতে ডুবে যায় কিংবা আমাদের দখলে আসে। একজন লে. কর্নেলসহ বেশ ক'জন অফিসার নিহত হয়। এর ফলে এই এলাকায় পাকসেনাদের তৎপরতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা অনেকে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়।

কুমিল্লার দক্ষিণে এবং নোয়াখালী এলাকাতেও আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের তৎপরতা আরো জোরদার করে তোলে। ৩০ আগস্ট সকাল ১০ টায় লাকসাম থেকে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি আমাদের অবস্থানের ২০০ গজের মধ্যে পৌঁছলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে সমস্ত দিন ধরে গোলাগুলি চলতে থাকে। পাকসেনারা আক্রোশে রাস্তার চতুর্দিকের সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। প্রচণ্ড আক্রমণ সত্বেও আমাদের সৈনিকরা নিজেদের অবস্থানে অটল থাকে। সমস্ত দিনের যুদ্ধে তাদের প্রায় ২০ জন সৈন্য নিহত এবং অনেক আহত হয়। তারা অগ্রসর হতে সক্ষম না হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। পরদিন ল্যান্স নায়েক লোকমান আলী ও ল্যান্স নায়েক আহসানউল্লাহর নেতৃত্বে একটি ডিমোলিশন পার্টিকে চৌদ্দগ্রাম-বাংগোড়া লাকসাম রাস্তা দিয়ে শত্রুসৈন্যদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য রাস্তার মাঝে মাঝে ডিমোলিশন দিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। দলটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানোর পর তাদের ডিমোলিশন কাজ শুরু করে। কিন্তু স্থানীয় শান্তিকমিটি ও তাদের লোকেরা পাকসেনা

কর্তৃক প্রতিশোধের ভয়ে রাস্তায় ডিমোলিশন লাগাতে বাধা দেয়। ল্যান্স নায়েক স্থানীয় লোকদেরকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বুঝিয়ে বলেন। বোঝানোর পর শান্তি কমিটির লোকেরা তাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। তারা নিজেরাই রাস্তা খুঁড়ে তিন জায়গাতে ৫০ পাউন্ডের জিলেটিন এক্সপ্লোসিভ-এর ব্যাগ লাগায় এবং ৮০ ফুট রাস্তা উড়িয়ে দেয়। এতে পার্শ্ববর্তী রাস্তার দু'পাশের পানি রাস্তার খাদে প্রবেশ করে। ফলে চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঐদিন রাতে আমাদের আরেকটি টহলদার দল কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্বে বিবির বাজারের নিকট রাস্তায় মাইন লাগিয়ে ১ জন ক্যাপ্টেন ও ৩ জন পাকসেনাসহ একটি জীপ উড়িয়ে দেয়। আর একটি দল লাঙ্গলকোট ও লাকসামের মাঝামাঝি রেললাইনের উপর মাইন পুঁতে একটি ইঞ্জিনসহ তিনটি রেলওয়ে বগী ধ্বংস করে দেয়। কাজলপুরের নিকট আরেকটি মালবাহী ট্রেন আমাদের পোতা মাইনের আঘাতে লাইনচ্যুত হয়। ফেনী ও লাকসামের মাঝে নাওতি স্টেশনের নিকট ডিমোলিশন লাগিয়ে রেললাইনের ১৪ ফুট রাস্তা ধ্বংস করে দেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লা-ফেনী রেললাইনের পাশে টেলিফোনের তার কয়েক জায়গায় কেটে দেয়। ৩ সেপ্টেম্বর আমাদের আর একটি ডিমোলিশন পার্টি লালমাই ও জাঙ্গালিয়া স্টেশনের মাঝে রেলওয়ে রাস্তার উপর ডিমোলিশন লাগিয়ে রেললাইনের খানিকটা উড়িয়ে দেয় এবং জমুরা ও বেতুরার রেভিনিউ অফিস পুড়িয়ে দেয়।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিলোনিয়াতে পাকসেনারা তাদের তৎপরতা আরো বাড়িয়ে তোলে। ৬ সেপ্টেম্বর পাক সামরিক জান্তা নয়নপুরের নিকট বিপুল পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। ঐ দিন রাত প্রায় ৩ টার সময় পাকসেনাদের দুটি প্লাটুন সেলোনিয়া নদী অতিক্রম করে। আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। পাকসেনাদের দলটি নৌকাযোগে যখন নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে তখন আমাদের অগ্রবর্তী দল তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং বেশকিছুসংখ্যক আহত হয়। অবশিষ্ট সৈন্যরা মর্টারের গোলার সহায়তায় পশ্চাদপসরণ করে। পরদিন বিকেলে ৪ টায় পাকসেনাদের আরেকটা শক্তিশালী দল আরো পশ্চিমে মহুরী নদী অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এখানেও আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। গোলাগুলিতে পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ ১৫ জন নিহত এবং প্রায় ২০ জন আহত হয়। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখে এবং আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর প্রচণ্ডভাবে কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের সৈনিকরা টিকতে না পেরে অগ্রবর্তী অবস্থান পরিত্যাগ করে স্থায়ী অবস্থানে ফিরে আসে। পাকবাহিনী তাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখে। সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত এই আক্রমণ চলতে থাকে। আমাদের বীর সৈনিকরা তাদের অবস্থান থেকে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসেনাদের আক্রমণকে দেড়ঘণ্টার যুদ্ধে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। পাকসেনাদের অনেক হতাহত হয় ও পরে আমাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর পাকসেনারা পরশুরামের নিকট সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। প্রায় এক ব্যাটালিয়ন

সৈন্য পরশুরামে মোতায়েন করে। ৯ সেপ্টেম্বর আমাদের খবর সংগ্রহকারী লোকেরা জানতে পারে যে পাকসেনারা বেশ কয়েকটি ১০৫ এমএম কামানসহ সালিয়ার নিকট অবস্থান নিচ্ছে। পাকসেনাদের তৎপরতা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে মুহুরী নদীর পূর্ব পাড়ে তাদের অবস্থান পাকা করে নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এছাড়া বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা আরো জানতে পারি, যে কোন উপায়ে বিলোনিয়া এলাকা নিজেদের দখলে আনার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৯ টা থেকে পাকসেনারা মহুরী নদী পার হয়ে প্রচণ্ড কামানের গোলার সহায়তায় আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর পাকসেনাদের এই আক্রমণকে আমাদের যোদ্ধারা প্রতিহত করে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের আবার পশ্চিম তীরে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। আমাদের সেনারা যখন পাকসেনাদের ওপর সম্মুখসমরে প্রতি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল সে সময়ে গেরিলাদের বেশ কয়েকটি দল পাকবাহিনীর পিছনে আঘাত হেনে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মতিগঞ্জে গেরিলারা পাকসেনাদের একটি ক্যাম্পে অতর্কিতে আক্রমণ করে একজন অফিসারসহ ১১ জন পাকসেনাকে নিহত এবং ২০০ জনকে আহত করে। পাকসেনাদের ক্যাম্প থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, ২ টি মটর সাইকেল, তিনটি রেডিও এবং তিন বাক্স ওষুধ দখল করে নেয়। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা এই সংঘর্ষে শহীদ হয়। আরেকটি দল ১০ সেপ্টেম্বর রাত ১০ টায় নয়াপাড়ার শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। এখানেও আমাদের গেরিলারা বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। অপর আরেকটি গেরিলা দল ফেনীর নিকট ফতেপুর রেলসেতু ডিমোলিশন লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে পঞ্চাশ ফুটের একটি খাদের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে লাকসাম-ফেনীর মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ফেনীর শহরেও আমাদের গেরিলারা গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পাকসেনাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। গেরিলারা ফেনী থেকে ফুলগাজী পর্যন্ত পাকসেনাদের টেলিফোন লাইন কেটে তাদের টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পাকসেনারা তাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলোতে ফেনী থেকে ট্রলির সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতো। তাদের এই সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চিথলিয়ার নিকট ঘানিমোড় রেলসেতুটি উড়িয়ে দেবার জন্য আমাদের পাইওনীয়ার প্লাটুন পাঠানো হয়। এই প্লাটুনটি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রাতে পাকসেনাদের অবস্থানের পিছনে অনুপ্রবেশ করে। পরদিন সকালে তারা সেতুটি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারে পাকসেনারা সেতুটিকে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেছে। অতি কষ্টে তারা মহুরী নদী সাঁতরিয়ে রাতের অন্ধকারে সেতুটির নিচে ডিমোলিশন লাগিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি উড়িয়ে দেয়। এর ফলে ফেনী এবং বিলোনিয়াতে পাকসেনাদের ট্রলির সাহায্যে সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

শত্রুদের উপর আমাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখা হচ্ছিলো। ১১ সেপ্টেম্বর আমাদের একটি শক্তিশালী দল কামানের সহায়তায়, সন্ধ্যা ৭ টায় পরশুরামের নিকট পাকঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ করে ৭ জন পাকসেনাকে নিহত এবং ১৫ জনকে আহত করে। এর পরদিন আমাদের দুটি শক্তিশালী দল সালদার এবং জগন্নাথ দীঘির

শত্রুঘাঁটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ৪ জন পাকসেনাকে নিহত এবং অনেককে আহত করে। আমাদের এই পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে পাকসেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ফেনীর দক্ষিণে তাদের কামানের অবস্থান গড়ে তোলে। সেখান থেকে আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড কামানের আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে আমাদের অবস্থান বেশ কিছু বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। পাক সেনারা তাদের কামানের আক্রমণ অব্যাহত রাখে। তাদের এই কামানের ঘাঁটিগুলোকে ধ্বংস করে দেবার জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে সকালে আমাদের একটি কোম্পানিকে তিনটি মর্টারসহ পাকসেনাদের অবস্থানের পেছনে পাঠানো হয়। গোপন পথে অনুপ্রবেশ করে এই দলটি ফেনী বিমান বন্দরের পশ্চিমে বিকেলে পৌঁছে এবং পাকসেনাদের বিঞ্চিত অবস্থিত কামানঘাঁটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে রাত ১-৩০ টায় পাক অবস্থানের উপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এই ধরনের আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আক্রমণের চাপে উপায়ান্তর না দেখে তারা ফেনীতে অবস্থিত তাদের জন্য গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য আহ্বান জানায়। ফেনী থেকে পাকসেনাদের কামানগুলো আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের দুর্ধর্ষ গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের ফেনী অবস্থানের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। দু'ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের দশজনকে নিহত, ১৬ জনকে আহত এবং তাদের আরো বহু ক্ষতিসাধন করে নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসে। আমাদের কামানের আক্রমণ পাকসেনাদের ঘাঁটি যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে এবং তারা তাদের গোলাবর্ষণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। পরে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের এই আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের গোলন্দাজ ঘাঁটিতে ১১ জন পাকসেনা নিহত এবং ২৩ জন আহত হয়। বিঞ্চিতে তিনটি জীপ ধ্বংস হয়ে যায়। একটি কামানেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়। ফেনীতে পাকসেনাদের মনোবল অনেকটা ভেঙ্গে পড়ে। বিশেষ করে পাকসেনাদের সহকারী শান্তি কমিটির সদস্য দালালরা ভয়ে ফেনী শহর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। অপরদিকে এই আক্রমণের ফলে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। এর পরদিন আমাদের আর একটি কোম্পানি সালদার শত্রুঘাঁটি রেইডিং করার জন্য পাঠানো হয়। সমস্ত দিন রেকি করার পর রাত ৮-৩০ মিনিটে আমাদের কোম্পানিটি গোলন্দাজ বাহিনী এবং ৩ ইঞ্চি মর্টারের সহায়তায় পাকসেনাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং প্রায় একঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো দখল করে নেয়। পাকসেনারাও তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের অগ্রসর পথে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সৈনিকরা ক্ষিপ্রতা ও বীরত্বের সঙ্গে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর তাদের হামলা অব্যাহত রাখে। পাকসেনাদের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের ফলে আমাদের অগ্রসর পথে কিছুটা বাধা আসে। কিন্তু তবুও আমাদের সৈনিকরা ডানদিক থেকে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যহত রাখে। সকাল পর্যন্ত সংঘর্ষে পাকসেনারা তাদের অবস্থান থেকে কিছুটা হটে যেতে বাধ্য হয়। আমাদের সৈনিকরা এই অবস্থানের পেছনে অবস্থিত একটি প্রেট্রোল পাম্পও ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। এতে প্রায় ২০/২৫ জন

পাকসেনা হতাহত হয়। সারদার অবস্থান থেকে পাকসেনাদের বিতাড়িত করার পর আমরা পরশুরামের নিকট অনন্তপুর গ্রামে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর চাপ বাড়িয়ে তুলি। প্রথমদিন এই অবস্থানে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী আক্রমণ চালায়। ফলে ১০ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো বেশকিছু আহত হয়। এর একদিন পর আবার অনন্তপুর গ্রামের অবস্থানের উপর আমাদের গোলন্দাজ। বাহিনী আক্রমণ চালায়। ফলে ১৩ জন পাকসেনা নিহত ও ২ জন আহত হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭ টার সময় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানির পাকসেনাদের নয়নপুর অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীও সহায়তা করে। যুদ্ধ প্রায় ৩০ তারিখ রাত ২ টা পর্যন্ত চলতে থাকে। ছ'ঘণ্টার যুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা ১০ জন পাকসেনা নিহত, ১৫ জন আহত ও ৬ জনকে বন্দি করে। তাছাড়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। পাকসেনারা মাসীর হাট থেকে আরো সৈন্য এনে শক্তি বৃদ্ধি করে আমাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা সাহসিকতার সাথে পরে আক্রমণের মোকাবিলা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের বাহিনী গোলাবারুদ ফুরিয়ে এলে অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে মূল অবস্থানে ফিরে আসে। এই সংঘর্ষে আমাদের পক্ষে একজন শহীদ ও ১১ জন আহত হয়। আমাদের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকসেনাদের একটি সরবরাহবাহী ট্রলী মুন্সীরহাট থেকে বিলোনিয়ার দিকে যাওয়ার পথে আমাদের সৈনিকদের পুঁতে রাখা মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়। এতে তিনজন পাকসেনা নিহত ও ৬ জন আহত হয়। ট্রলীতে বোঝাই গোলাবারুদ এবং রেশনও ধ্বংস হয়ে যায়।

এই ঘটনার দু'দিন পর ১ অক্টোবর রাত ১১ টার সময় আমাদের একটি শক্তিশালী দল পাকসেনাদের মুন্সীরহাট অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মুন্সীরহাট পাকসেনাদের জন্য বিলোনিয়া সেক্টরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। কারণ এই ঘাঁটির মাধ্যমে বিলোনিয়ার পশ্চিম দিকে তাদের অবস্থানগুলোতে সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল। বস্তুত সেই জন্যই আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এর পরদিন ২ অক্টোবর পরশুরাম শত্রুঘাঁটির উপর আমাদের সৈনিকরা আক্রমণের চাপ বাড়াতে শুরু করে। পাকসেনারা বিপুল সংখ্যক সমাবেশ করে তাদের এই অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য আমাদের উপরও পাল্টা আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের পরশুরামের দিক থেকে এই পাল্টা-আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করে। এতে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পাকসেনাদের আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্যান্য অবস্থান থেকে প্রায় ২/৩ কোম্পানি সৈন্য একত্রিত করে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া পাকসেনাদের উপর পুনরায় পাল্টা আক্রমণ চালাবার জন্য নির্দেশ দিই। আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেয় এবং মহুরী নদী অতিক্রম করে পরশুরামের পাকসেনাদের অনেকগুলো অবস্থান দখল করে নেয়। পাকসেনারা তাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ হওয়াতে নিজেদের গোলন্দাজ বাহিনীকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানায়। আমজাদ নগরে

অবস্থিত পাক গোলন্দাজ বাহিনী পরশুরামের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমাদের আক্রমণের চাপ শত্রুঘাঁটির অতি নিকটবর্তী থাকায় সে গোলাগুলি বেশিরভাগই তাদের নিজেদের অবস্থানের উপর আঘাত হানতে থাকে। আমাদের আক্রমণের চাপ ও তাদের নিজেদের গোলার আঘাতে পাকসেনাদের অবস্থানটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ৩০/৪০ জন পাকসেনা নিহত ও প্রচুর সংখ্যক সৈন্য আহত হয়। তারা উপায়ান্তর না দেখে তাদের পশুরামের অবস্থানটি পরিত্যাগ করে অনেক পেছনে নতুন করে অবস্থান নেয়। কয়েকদিনের যুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সৈনিকদের কাছে বিপর্যস্ত হয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে বিলোনিয়া ও পশুরামের পাকসেনাদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়। পাকসেনাদের এহেন শোচনীয় অবস্থা দেখে আমরা তাদের উপর আমাদের চাপ অব্যাহত রাখি। ২ অক্টোবর সন্ধ্যায় আমাদের একটি দল পাকসেনাদের শালদার অবস্থানের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৯ জন পাকসেনা নিহত করে এবং তাদের অনেক রসদ বিনষ্ট করে দেয়। পাকসেনারা তাদের অবস্থানগুলোকে রক্ষা করার জন্য ২ ও ৩ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে ফেনী থেকে মুন্সীরহাট ও চিথলিয়াতে আরো এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য সমাবেশ করে। ৩ তারিখ সকাল ৬ টার সময় তাদের একটি শক্তিশালী দল আমাদের অনন্তপুর ও ধনীকুণ্ডা অগ্রবর্তী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। ভারি কামান ও মর্টারের সাহায্যে তারা আমাদের অবস্থানগুলোতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে তাদের পদাতিক বাহিনীও আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা যখন অবস্থানের ৪০/৫০ গজের মধ্যে পৌঁছে, তখন আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর প্রচণ্ড গুলি চালিয়ে প্রায় ২৫/৩০ জন পাকসেনাকে নিহত করে। পাকসেনারা হামলা চালিয়ে আমাদের অনন্তপুরের অবস্থানের দক্ষিণাংশের ট্রেঞ্চগুলো দখল করে নেয়। দক্ষিণাংশে একটি হালকা মেশিনগান বাংকারের উপর কামানের গুলি লেগে ধ্বংস হয়। এই আঘাতে আমাদের কয়েকজন সৈনিক শহীদ হয়। পাকসেনাদের এই প্রবল চাপ ও প্রচণ্ড কামানের গুলির মুখে প্রয়োজনীয় গোলা বারুদ ও অস্ত্রের অভাবে টিকতে না পেরে আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটির সৈনিকরা পিছু হটে মূল অবস্থানে আসে। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ আমাদের মূল অবস্থানের উপরও চালাতে থাকে। এই সময় আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী এবং মর্টারের গোলাতে তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়ে যায়। আমাদের মূল অবস্থান থেকে একটি শক্তিশালী দল তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের পাল্টা আক্রমণকারী দলটি আরো অগ্রসর হয়ে অনন্তপুর এবং ধানীকুণ্ডা পুনর্দখল করে। পাকসেনাদের প্রায় ৪০/৫০ জন হতাহত হয়। আমাদের ১ জন শহীদ ও ৫ জন আহত হয়। পাকসেনারা মজুমদারহাট এবং চিথলিয়াতে তাদের অবস্থানগুলোতে আরো সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। আমরাও আমাদের চাপ অব্যাহত রাখি। ৪ অক্টোবর রাতে আমাদের একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে সকাল ৬ টা পর্যন্ত চিথলিয়ার নিকট পৌঁছে। সকাল ৬ টায় ৩ ইঞ্চি মর্টারের সহায়তায় চিথলিয়া পাকসেনাদের অবস্থানের দক্ষিণে আতর্কিত আক্রমণ চালায়। আধঘণ্টা পর্যন্ত আক্রমণের ফলে প্রায় ৩০ জন পাকসেনা হতাহত করে এবং

একটি আরআর ধ্বংস করে দেয়। এরপর পাক অবস্থান থেকে সরে পড়ে নিরাপদে ফিরে আসে। ৬ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পরশুরাম, মজুমদারহাট, চিথলিয়া এবং নোয়াপাড়ার উপর বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ১০ জন পাকসেনা হতাহত করে। ১১ তারিখ সন্ধ্যা ৭ টায় পাকসেনারা পরশুরাম ও মুজমদারহাটের দিক থেকে এক ব্যাটালিয়ন শক্তিসহ গোলন্দাজ বাহিনী ও ৩ ইঞ্চি মর্টারের সহায়তায় আমাদের অনন্তপুর অবস্থানের উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের অতি নিকটে পৌঁছতে সমর্থন হয়। কিন্তু আমাদের সৈনিকরা বীরবিক্রমে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। সমস্ত রাত আক্রমণ চালাবার পর পাকসেনাদের প্রায় ৩৫ জন সৈনিক নিহত হয়। শক্তি প্রতিরোধ ব্যর্থ এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির জন্য পাকসেনারা তাদের মৃতদেহ ফেলে ভোরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যায়। এই সাফল্যের ফলে আমাদের সৈনিকদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। ১৩ এবং ১৪ অক্টোবর পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের সামনের এলাকায় তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে চলে। ১৪ অক্টোবর সালধরের নিকট পাকসেনাদের দুটি প্লাটুন আমাদের প্রতিরক্ষা মাইনের শিকার হয়, ফলে ১৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১৩ তারিখ সকাল ১০ টার সময় আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের পরশুরাম অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে একটি মেশিনগানসহ ৫ জন পাকসেনাকে ধ্বংস করে দেয়। পাকসেনারা ২/৩ দিন নীরব থাকার পর আবার তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১৬ অক্টোবর আমাদের দুটি প্লাটুন বিকেল সাড়ে ৩ টায় পাকসেনাদের শালদার অবস্থানের উপর আবার অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ২০ মিনিটের এই আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা ৫ জন পাকসেনাকে নিহত ও ১০ জনকে আহত করে নিরাপদে ফিরে আসে। ওই দিনই সাড়ে চারটার সময় আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের পরশুরাম অবস্থানে হামলা চালিয়ে ১০ জনকে হতাহত করে এবং একটি বাংকার উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা ১৫ তারিখ সন্ধ্যা ৭ টায় প্রায় এক ব্যাটারিয়ন সৈন্যশক্তি নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আমাদের সাহেবনগর, চন্দনা এবং জঙ্গলখোলা অবস্থানগুলোর সাহায্যার্থে পাক সেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী এই অবস্থানগুলোর সাহায্যার্থে পাক সেনাদের উপর আক্রমণ চালায় প্রায় তিনঘণ্টা যুদ্ধে আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকসেনারা পিছু হটে যায়। তাদের হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি।

কুমিল্লার দক্ষিণে জুলাই মাসের শেষের দিকে আমরা শত শত গেরিলাকে ট্রেনিং দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিই। এইসব গেরিলা কুমিল্লা, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, হাজীগঞ্জ, বকরা, চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ প্রভৃতি জায়গাতে প্রবেশ করে নিজ নিজ জায়গায় বেইস তৈরি করে তোলে। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ফরিদগঞ্জে অবস্থিত আমাদের গেরিলাদের একটি প্লাটুন পাকসেনাদের একটি টহলদারী দলকে বোয়াল নামক স্থানে এ্যামবুশ করে। একঘণ্টা যুদ্ধের পর ১২ জন পাকসেনা নিহত ও ১৫ জন আহত হয়। বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের গেরিলারা দখল করে নেয়। লাকসাম থানার সাহাপুর গ্রামে পাকসেনাদের একটি ছোট ঘাঁটি ছিল। লাকসামের গেরিলারা ৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৭ টার

সময় এই ঘাঁটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ১০ জন পাকসেনা নিহত ও ২ জন আহত হয়। আমাদের আরেকটি গেরিলা দলের দুটি প্লাটুন মিয়াবাজারের নিকট পাকসেনাদের একটি ঘাঁটির বিস্তারিত সংবাদ পায়। তিনটি প্লাটুনের এই দলটি ৭ তারিখে রাত পৌনে তিনটার সময় সেই ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রায় আধঘণ্টা যুদ্ধের ফলে ২৮ জন পাকসেনা নিহত এবং একজন অফিসার ও জেসিওসহ ১২ জন আহত হয়। বেশ কিছুসংখ্যক বাংকার উড়িয়ে দেয়া হয়।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণে এবং কুমিল্লার দক্ষিণে কৃষ্ণনগর, কলাতলা, আমজাদহাট প্রভৃতি জায়গায় আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের উপর বিভিন্ন সময় আঘাত হেনে প্রায় ২০ জনকে নিহত ও ১৬ জনকে আহত করে। এসব সংঘর্ষে আমাদের ৩৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং ৩ জন আহত হয়। সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে আমাদের একটি গেরিলা দল চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তায় জগন্নাথ দীঘির নিকট বাজানকারা সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে সেতু থেকে কিছু উত্তরে ১০ জন গেরিলা ও একটি নিয়মিত বাহিনীর পাকসেনাদের অপেক্ষায় এ্যামবুশ পেতে বসে। সেতুটি ধ্বংসের সংবাদ পেয়ে ফেনী থেকে পাকবাহিনীর একটি শক্তিশালী দল সেতুর দিকে অগ্রসর হয়। সেতুতে পৌছার আগেই পাকসেনারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে একজন অফিসারসহ ২৫ জন পাকসেনাকে নিহত করে। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ফেনীর দিকে পালিয়ে যায়।

পাকসেনারা লাকসামের নিকট হাসনাবাদ নামক এক জায়গায় তাদের একটি ঘাঁটি তৈরি করে। তাদের সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যকে রাজাকারও ছিল। এই ক্যাম্প থেকে তারা চাঁদপুর-লাকসাম-কুমিল্লা রাস্তায় অনবরত টহল দিয়ে বেড়াতো। ফলে চাঁদপুরে এবং দক্ষিণ ঢাকা ও ফরিদপুরে অনুপ্রবেশকারী আমাদের গেরিলাদের জন্য মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এই ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেবার জন্য লে. মাহবুবকে নির্দেশ দেয়া হয়। লে. মাহবুব এই ঘাঁটিটি সম্পর্কে পুরোপুরি সংবাদ সংগ্রহ করে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানি ও গেরিলা সমন্বিত একটি শক্তিশালী দল লাকসাম এলাকায় অনুপ্রবেশ করে এবং পরদিন পাকসেনাদের হাসনাবাদ ঘাঁটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। ফলে প্রায় ২৫ জন পাকসেনা ও ৩০ জন রাজাকার নিহত হয়। পাকসেনারা ক্যাম্প ছেড়ে কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। হাসনাবাদ অবস্থান থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে। এই সংঘর্ষের একদিন পর আমাদের দলটি হাজীগঞ্জে অবস্থিত রাজাকারদের একটি বিরাট ট্রেনিং ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে ৩০ জন রাজাকারকে নিহত করে। এর ফলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রবেশ পথটি আবার বিপদমুক্ত হয়। পাকসেনারা এই অঞ্চলে আমাদের ধ্বংস করার জন্য আরো সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। তাদের একটি ব্যাটালিয়ন চৌদ্দগ্রামে মোতায়েন হয়। পাকসেনাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার একটি মাদ্রাসা বিল্ডিং-এ স্থাপন করে। এইসব সংবাদ আমাদের কাছে স্থানীয় গেরিলাদের মারফত পৌছে। পাকসেনাদের এই নতুন ব্যাটালিয়নটি আসার সাথে সাথেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলার জন্য লে. ইমামুজ্জামান সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে আমাদের মর্টার প্লাটুন ও একটি গেরিলা দলকে চৌদ্দগ্রাম

পাঠায়। আমাদের দলটি বিকেল ৫ টায় চৌদ্দগ্রামের নিকট উপস্থিত হয়ে পাকসেনাদের হেডকোয়ার্টারের উপর মর্টারের গোলাবর্ষণ শুরু করে। বেশ ক'টি গোলা মাদ্রাসা ঘরের মধ্যে পড়ে। এর ফলে পাকসেনাদের প্রায় ৩০/৪০ জন হতাহত হয়। আমাদের একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় গেরিলা আহতদের লাকসামের দিকে নিয়ে যেতে দেখে। পাকসেনারা কামানের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের উপর গোলাগুলি চালায়। এতে কিছু বেসামরিক লোক নিহত হয়। এর দু'দিন পর পাকসেনাদের একটি দল হরিসর্দার বাজারের নিকট স্থানীয় দালাল, শান্তি কমিটির লোকদের নিয়ে এক সভায় মিলিত হয়। এই সভা পণ্ড করে দেয়ার জন্য আমাদের একটি টহলদার দল পাকসেনাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে একজন জেসিওসহ ৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। শান্তি কমিটির লোকেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। পাকসেনারা সেপ্টেম্বর মাসেই চৌদ্দগ্রামের উত্তরে হরিসর্দার বাজারের নিকট পুনরায় নতুন করে তাদের ঘাঁটি তৈরি করার চেষ্টা চালায়। এই সংবাদ পেয়ে লে. ইমামুজ্জামান পাকসেনাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবর সংগ্রহ করার জন্য রেকি দল পাঠায়। রেকি দলটি রাত ৯ টার সময় খবর সংগ্রহ করে ফেরত আসে। তারা দেখতে পায়, পাকসেনাদের প্রায় এক কোম্পানি শক্তি হরিসর্দার বাজারের উত্তরে ঘাঁটি তৈরি করার জন্য ট্রেঞ্চ খোঁড়ায় ব্যস্ত। সংবাদ পেয়ে লে. ইমামুজ্জামান ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানি এবং দুটি গেরিলা কোম্পানি নিয়ে মর্টারের সহায়তায় রাত সাড়ে ৪ টার সময় পাকসেনাদের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আমাদের তীব্র আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের দুটি হালকা মেশিনগান পোস্ট ছাড়া সম্পূর্ণ অবস্থানগুলো পর্যুদস্ত হয়ে যায়। পাকসেনারা তাদের বাংকার থেকে আক্রমণের চাপে পালাবার চেষ্টা করলে আমাদের সৈনিকরা তাদের নিহত করে। প্রায় ২৫ জন পাকসেনা বেঞ্জারসহ নিহত হয় এবং অনেকে আহত হয়। দু'ঘণ্টা আক্রমণ চালাবার পর আমাদের সৈনিকরা নিরাপদে তাদের অবস্থানে ফিরে আসে। পরে পাকসেনারা তাদের আহত সৈনিক ও নিহতদের নিয়ে জীপে করে লাকসামের দিকে পালিয়ে যায়। প্রায় ৮ টার সময় পাঁচটি হেলিকপ্টারে করে পাকসেনাদের আরেকটি দল সেই অবস্থানের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আসে। শক্তি বৃদ্ধির পর পাকসেনারা প্রায় ১০ টার দিকে আমাদের অবস্থানে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। আমাদের অবস্থানটি পাকসেনাদের এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। লে. ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে পাকসেনাদের আক্রমণকে আমাদের সৈনিকরা প্রতিহত করতে থাকে। আমাদের প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যেও পাকসেনারা আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। এ সময় আমাদের মর্টারগুলো তাদের উপর মারাত্মক আঘাত হানে। ফলে পাকসেনাদের আক্রমণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র একটি পাকসেনা দল আমাদের ডানদিক দিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু লে. ইমামুজ্জামানের সময়মত পাল্টা আক্রমণের ফলে তারাও নিহত হয়। ৫/৬ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের বীর সৈনিকরা সাফল্যের সঙ্গে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে একজন মেজরসহ ৩৮ জন পাকসেনারা নিহত হয়। মর্টারের গোলার আঘাতে পাকসেনাদের অফিসার নিহত হবার পর পাকসেনারা মনোবল হারিয়ে পশ্চিম দিকে পিছু হটে যায়। এর দু'দিন পর ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার সময় আমাদের

একটি গেরিলা দল ফতেহপুরের নিকট একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। এতে ৫০ ফুট গ্যাপ সৃষ্টি হয়। ফলে লাকসাম-ফেনীর মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িসা এবং গোবিন্দমানিক্যর দীঘিতে পাক সেনাদের দুটি ঘাঁটি ছিল। লে. ইমামুজ্জামান ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় এই দুটি পাক অবস্থানের উপর একযোগে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৮১ মি.মি. মর্টার, ৭৫ মি.মি. আরআর এবং মেশিনগান ব্যবহার করা হয়। মানিক্যর দীঘিতে অবস্থিত পাকসেনারা আমাদের আক্রমণের পূর্বাভাস পেয়ে সতর্ক হয়ে ছিল। ফলে সাতসা অবস্থানের শুধু দুটি বাংকার ধ্বংস ও ৬ জন পাকসেনা আমাদের আক্রমণে নিহত হয়। আমাদের দু'জন সৈনিক আহত হয়। বাড়িসা ঘাঁটির উপর আমাদের আক্রমণ সম্পূর্ণ সফল হয়। আরআর-এর গোলার আঘাতে প্রায় ছ'টি বাংকার ধ্বংস হয়। পাকসেনাদের ২০ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়। আমাদের আক্রমণকারী দলটি দু'ঘণ্টা পর নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই সংঘর্ষের চারদিন পর ২৩ সেপ্টেম্বর ভোর ৫ টার সময় একটি প্লাটুন ও ১৬ জন গেরিলা লে. ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে মর্টার এবং আরআর-এর সাহায্যে আবার গোবিন্দমানিক্য দীঘিতে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের সময় আমাদের সৈনিকরা শত্রুর বেশকিছু বাংকার আরআর-এর সাহায্যে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। ফলে প্রায় ১৫ জন পাকসেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। একঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের সৈনিকরা তাদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসে।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল কুমিল্লার দক্ষিণে পায়েলগাছা থেকে নারায়ণপুরের দিকে অগ্রসর হয় এবং নারায়ণপুরের অনেকগুলো বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং নারীধর্ষন করে। ২/৩ ঘণ্টা যাবত তাদের অত্যাচার চলে। নারায়ণপুরের নিকট অবস্থিত আমাদের মাত্র ১৩ সদস্যের ছোট একটি গেরিলা পাকসেনাদের নারায়ণপুরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। পরে এই দল পায়েলগাছার রাস্তায় এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনারা নারায়নপুরে অত্যাচার চালাবার পর ফেরার পথে তাদের এ্যামবুশের আওতায় পড়লে গেরিলারা আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ১৪ জন পাকসেনা ও ২৮ জন রাজাকার নিহত এবং ১৩ জন পাকসেনা ও ১৬ জন রাজাকার আহত হয়। আমাদের বীর যোদ্ধারা তাদের গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণপণে আক্রমণ চালিয়ে যায়। এই এ্যামবুশে শেষ পর্যন্ত ৫ জন গেরিলা শহীদ হয় এবং বাকি ৮ জন ফিরে আসতে সমর্থ হয়। শক্তিশালী পাকবাহিনীর দলের সঙ্গে ক্ষুদ্র এই গেরিলা বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ এবং আত্মত্যাগ কোনোদিন ভুলে যাবার নয়।

চাঁদপুরের নিকট আকন্দহাট বাজারের নিকট আমাদের একটি কোম্পানি তাদের বেইস স্থাপন করে। স্থানীয় দালাল এবং রাজাকাররা পাকসেনাদেরকে এই বেইস সম্বন্ধে খবর দেয়। এই বাজারটির তিনদিকে পানি থাকায় আমাদের সৈনিকরা বেইসটিকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে করতো। ৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৬ টার সময় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল স্থানীয় দালালের সহযোগিতায় আমাদের এই বেইসটি আক্রমণের জন্য আসে। আক্রমণের সময় তারা নৌকার সাহায্যে খাল পার হয়ে বেইস-এর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। পাকসেনারা নিকটে পৌঁছলে আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর

আক্রমণ চালায়। দু'ঘণ্টা যুদ্ধে একজন মেজর ৩৭ জন পাকসেনাসহ নিহত হয়। খাল পার হতে না পেরে এবং অনেক হতাহতের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের কোম্পানিটি পরে সেখান থেকে নিরাপদে অন্য বেইস-এ চলে আসে।

কুমিল্লার দক্ষিণে পাকসেনাদের কংসতলা ঘাঁটিটি আমাদের গেরিলা বাহিনীর যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। এই ঘাঁটি থেকে পাকসেনাদের টহলদার দল আমাদের যাতায়াত পথে বিশেষ তৎপরতা চালাতো। এই ঘাঁটিটিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য ক্যাপ্টেন মাহবুবকে নির্দেশ দেয়া হায়। বিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করে ৫০ জনের একটি দল লে. মাহবুবের নেতৃত্বে ৩০ সেপ্টেম্বর রাত একটায় এই ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করে আক্রমণ চালায়। তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর সুবেদার শাহজাহানসহ ১৬ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। পাকসেনারা এই আক্রমণের ফলে এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, সেখান থেকে তারা তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে কুমিল্লায় চলে যেতে বাধ্য হয়। এর দু'দিন পর আমাদের ডিমোলিশন পার্টি পেপুলিয়া বাজারের নিকট লালমাই সোনাগাজী সড়কের একটি সেতু বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা এই রাস্তাটিকে ট্যাংক এবং ভারি গাড়ি চলাচলের জন্য পুনঃনির্মাণের চেষ্টা করছিল। সেতুটি ধ্বংস করে দেবার পর তারা রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ করে দেয়। আমাদের আরেকটি গেরিলা দল চান্দিনার নিকটে দোতুলাতে রাস্তায় মাইন পুঁতে পাকসেনাদের একটি গাড়ি ধ্বংস করে দেয়। এছাড়াও কুমিল্লার দক্ষিণে ও উত্তরে ১ অক্টোবর থেকে ৩ অক্টোবর আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন সংঘর্ষে প্রাণছড়া, কোটেশ্বর, আজনাপুর, বিবিরবাজার, আমতলী প্রভৃতি জায়গায় ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়।

আমাদের ৪১ জনের একটি গেরিলা দল ১ অক্টোবর তাদের ট্রেনিং শেষ করে রাত ৮ টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কসবার দক্ষিণ দিক দিয়ে এই দুটি নৌকায় উজানিশ্বর সেতুর নিকট পৌঁছে। পাকসেনাদের একটি টহলধারী দল রাত ১১ টায় আমাদের দ্বিতীয় নৌকাটিকে দেখতে পায় এবং আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে আমাদের ৫ জন গেরিলা শহীদ ও তিনজন আহত হয়। ১৫টি রাইফেল ও ৫টি স্টেনগান পানিতে পড়ে হারিয়ে যায়। বাকী গেরিলারা অতিকষ্টে শত্রুদের নাগালের বাইরে চলে আসতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার তিনদিন পর লে. ইমামুজ্জামানের ৪ অক্টোবর সকাল ৫ টায় চৌদ্দগ্রামের ৫ মাইল উত্তরে হরিসর্দার বাজারে পাক অবস্থানের উপর ১০৬ মি.মি. আরআর ও ৮১ মি.মি. মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর ৭টি বাংকার ধ্বংস করে ২৫ জন পাকসেনা ও ৭ জন রাজাকারকে হতাহত করে। মুক্তিযোদ্ধারা চৌদ্দগ্রামের তিনমাইল দক্ষিণে একটি সেতুও ধ্বংস করে দেয়। ৪ ও ৫ অক্টোবর কুমিল্লার উত্তরে আজনাপুর ও জামবাড়ি এলাকায় আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের বেশ ক'টি টহলদারী দলকে আক্রমণ করে ১৫ জনকে নিহত ও ২০ জনকে আহত করে। আমাদের ১ জন শহীদ ও ১ জন আহত হয়। কুমিল্লাতে গোমতী বাঁধে মাইন পুঁতে পাকসেনাদের ১টি জীপ ধ্বংস করে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে একজন অফিসারসহ তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। এছাড়া রামচন্দ্রপুর এবং বাংগোরা ডাকঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। হোমনা থানায় অবস্থিত পাকসেনাদের একটি দলের সঙ্গে তিন তারিখ রাত সাতে ৩ টার সময়

আমাদের একটি গেরিলা দলের সংঘর্ষ হয়। ৬ ঘণ্টার যুদ্ধে পাকসেনারা সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের দ্বারা বন্দি ১৯ জন ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেয় এবং ৯টি রাইফেল দখল করে। এরপর হোমনা এলাকা সম্পূর্ণরূপে আমাদের কর্তৃত্বে আসে। ৬ অক্টোবর রাত ৩ টার সময় পাকসেনাদের একটি দল দুর্লভপুরের নিকট আমাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। এই এ্যামবুশে একজন ইঞ্জিনিয়ার কোর-এর অফিসারসহ ১২ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা গোমতীর উত্তরে আবার তাদের আধিপত্য পুনরুদ্ধারের জন্য তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। পাকসেনাদের এই তৎপরতাকে বাধা দেবার জন্য ক্যাপ্টেন দিদারুল আলম দুটি প্লাটুন পানছড়া এবং মোহনপুরে পাঠায়। এই প্লাটুনগুলো পাকসেনাদের চলাচলের রাস্তায় এ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। ৮ তারিখ পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল গোমতী পার হয়ে পানছড়ার দিকে অগ্রসর হয়। সকাল ৬ টায় সময় এই দলটি আমাদের এ্যামবুশের আওতায় আসে। ফলে ২০ জন পাকসেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। পরদিন পাকসেনাদের আরেকটি ছোট দল মনোহরপুরে আমাদের এ্যামবুশের আওতায় আসে এবং এ্যামবুশে ৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। ঐদিনই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের আরেকটি দলকে বুড়ীচং-এর নিকট সাদেকপুরে জেরুইনে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে ১ জন মেজর ও ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ২০ জন পাকসেনা নিহত ও ৭ জন ইপিসিএএফ নিহত হয়। নিহত একজন ক্যাপ্টেনের নাম সৈয়দ জাভেদ শাহ বলে পরে আমরা জানতে পারি। একজন পাকসেনা আমাদের হাতে বন্দিও হয়। এই সংঘর্ষে আমাদের একজন শহীদ এবং তিনজন আহত হয়। ৭টি রাইফেল আমরা দখল করে নেই। এর দু'দিন পর ১১ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১১ টার সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লার সার্কিট হাউস এবং গোমতীর চাঁদপুর ফেরীতে মর্টারের গোলাবর্ষণ করে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে পাকসেনাদের মার্শাল ল' হেডকোয়ার্টার ছিল। এই গোলাবর্ষণের ফলে প্রায় ৩৯ জন পাকসেনা ও রাজাকার হতাহত হয়। শহরের ভিতরে বসে মর্টারের গোলাবর্ষণ করাতে পাকসেনাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরে আমরা জানতে পারি যে, শহরে অবস্থিত অনেক টহলদার পাকসেনা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের দিকে পালিয়ে যায়। আমরা আরো জানতে পারি যে, সার্কিট হাউসে গোলাবর্ষণের সময় সেখানে পাকিস্তানি ৯ ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং উপস্থিত ছিলেন। অল্পের জন্য তিনি আমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। পাকসেনারা কুমিল্লা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা এই আক্রমণের খবর পাকিস্তানি রেডিও থেকেও প্রচার করে। তারা ৫ জন সৈনিক নিহত ও ৩৯ জন আহত হওয়ার কথা স্বীকার করে। আমাদের গেরিলারা কালির বাজার গ্রামে পাকসেনাদের একটি হেডকোয়ার্টারের সন্ধান পায়। এই সংবাদ পেয়ে লে. ইমামুজ্জামান একটি ৭৫ মি.মি. আরআর, মেশিনগান ও হালকা মেশিনগানসহ একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি পথ প্রদর্শকের সহায়তায় পাকসেনাদের হেডকোয়ার্টারের নিকটে রাতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ১২ অক্টোবর ভোর ৫ টায় আমাদের এই দলটি রকেট এবং মেশিনগানের সাহায্যে

পাকসেনাদের এই হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ করে একটি বিল্ডিং-এ অবস্থিত দুটি বাংকার সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়। ঐ অবস্থানের আরো পাকসেনারা রকেট হামলায় ইতস্তত পালাবার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতি মেশিনগানের সাহায্যে গুলিবর্ষণ করে তাদের ১২ জনকে নিহত ও ৪ জনকে আহত করে। এরপর আমাদের দলটি নিরাপদে আমাদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই ঘটনার একদিন পর বগাবাড়ি ও জাজিশ্বরে আরেকটা আক্রমণে ৭ জন পাকসেনা ও ৫ জন রাজাকার নিহত হয়।

বুড়ীচং থানার রামনগর গ্রামে আমাদের গেরিলাদের একটি অবস্থান ছিল। পাকসেনারা স্থানীয় দালালদের নিকট সংবাদ পেয়ে ৮ অক্টোবর দুপুরে একটি শক্তিশালী দল নিয়ে সেই অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে সেই আক্রমণের মোকাবেলা করে। দুপুর ১ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে পাকসেনাদের প্রায় ১৬ জন সৈনিক ও ১৪ জন রাজাকার নিহত হয়। পাক আক্রমণের চাপ বাড়তে থাকলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে জাগলপুরে নতুন করে অবস্থান নেয়। পরদিন পাকসেনাদের আরেকটি শক্তিশালী দল সেই অবস্থানের উপরও আক্রমণ চালায়। প্রায় ৪ ঘণ্টা যুদ্ধ করে আমাদের যোদ্ধারা ৩৫ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। এরপর সেই অবস্থান পরিত্যাগ করে প্রধান ঘাঁটিতে আসে। আসার পথে পাঁচজন পাকসেনা আমাদের হাতে বন্দি হয়। আমাদের একজন শহীদ, দু'জন আহত এবং ১ জন বন্দি হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন ১৫ তারিখ সকাল ৮ টায় কুমিল্লার দক্ষিণে পাকসেনাদের একটি অবস্থানের আধমাইল দূরে বারচর গ্রামে এ্যামবুশ পাতে। একঘণ্টা অবস্থানের পর পাকসেনাদের একটি দল তাদের ঘাঁটিতে ফেরার পথে এই এ্যামবুশের আওতায় পড়ে। এ্যামবুশে ১২ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়। ঐ দিনই বিকেলে মনোহরের নিকট পাকসেনাদের আরেকটি দলের উপর আমাদের সৈনিকরা আক্রমণ করে। পাকসেনাদের এই দলটি নিকটবর্তী একটি গ্রাম জ্বালিয়ে তাদের ঘাঁটিতে ফেরত যাচ্ছিলো। দু'দিন পর ১৮ অক্টোবর রমজানপুরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা একটি এ্যামবুশ পাতে। রাত প্রায় সাড়ে ৩ টার সময় একটি টহলদারী দল এই এ্যামবুশে পড়ে যায়। উভয়পক্ষে প্রায় আধঘণ্টা গোলাগুলি বিনিময় হয়। এতে ১০ জন পাকসেনা ও ১৮ জন রাজাকার হতাহত হয়। আমাদের একজন আহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পাকসেনারা অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিয়াবাজারের নিকট তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। আগস্ট মাসে এই অবস্থান থেকে আমরা পাকসেনাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। পুনরায় এই ঘাঁটি স্থাপন করায় আমরা বুঝতে পারি যে, পাকসেনারা আবার চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তা খুলবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য প্রথম অবস্থাতেই মিয়াবাজারের শত্রুঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেবার জন্য লে. মাহবুব একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ রাত ৭ টার সময় আমাদের একটি কোম্পানি পাকসেনাদের ঘাঁটি রেইড করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের বেইস থেকে রওনা হয়। রাত প্রায় ১১ টার সময় শত্রুঘাঁটির নিকট পৌঁছে অতর্কিতে আক্রমণ

চালায়। প্রায় দেড়ঘণ্টা যুদ্ধের পর ২ জন পাকসেনা নিহত ও ৫ জন আহত করে আমাদের দলটি অবস্থান পরিত্যাগ করে। এর তিনদিন পর ২০ অক্টোবর ভোর ৪ টার সময় মিয়াবাজারের আরেকটি শত্রুঘাঁটির উপর আমাদের সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। এই অকস্মাৎ আক্রমণে পাকসেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দু'ঘণ্টা যুদ্ধের ফলে প্রায় ২১ জন পাকসেনা নিহত এবং অনেক আহত হয়। পাকসেনাদের নিহত ও আহত সৈনিকদেরকে পরের দিন গাড়িতে কুমিল্লার দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায়। আমাদের দলটি যে রাস্তায় ফিরে আসে পাকসেনাদের ঘাঁটির কিছু দূরে সেই রাস্তার উপর মাইনের সাহায্যে বুবীট্র্যাপ লাগিয়ে আসে। পরদিন সকালে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল সেই রাস্তায় খবরাখবর নেয়ার জন্য অগ্রসর হবার পথে বুবীট্র্যাপ-এর কাছে পড়ে যায় এবং মাইন বিস্ফোরণের ফলে ১৬ জন পাকসেনা নিহত ও ৫ জন আহত হয়।

আমাদের আরেকটি দল লে. ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে ২২ অক্টোবর ভোর ৪টার সময় মর্টার এবং ১০৬ মি.মি. আরআর-এর সহায়তায় হরিসর্দার বাজারের উপর পাকসেনাদের আরেকটি নতুন ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় ১২ ঘণ্টার যুদ্ধে আমাদের মর্টার, মেশিনগান এবং আরআর-এর গোলা পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে। আরআর-এর সাহায্যে বেশ ক'টি বাংকার আমাদের সৈন্যরা উড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। তাদের প্রায় ৩৫ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা কুমিল্লা বিমানবন্দরে অবস্থিত কামানের সাহায্যে আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। প্রচণ্ড কামানের আক্রমণের ফলে সন্ধ্যা ৬ টার সময় আমাদের সৈনিকরা গোলার অভাবে পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। আসার সময় পাকসেনাদের অবস্থানের নিকট রাস্তায় মাইন লাগিয়ে আসে। পরদিন সকালে মাইন বিস্ফোরণের ফলে ৭/৮ জন পাকসেনা আহত হয়। এর একদিন পর আমাদের আরেকটি দল সকাল ৭ টার সময় চৌদ্দগ্রামের এক মাইল উত্তরে পাকসেনাদের কালিরবাজার ঘাঁটির উপর মর্টার এবং আরআর-এর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে প্রায় ১২ জন পাকসেনা হতাহত হয়। পাকসেনারা তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এর কয়েকদিন পর পাকসেনাদের একটি টহলদারী দল চৌদ্দগ্রাম থেকে সাড়ে চার মাইল দক্ষিণে আমাদের বাজারের নিকট আমাদের সৈন্যদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। ফলে ৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১৮ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় আমাদের একটি শক্তিশালী দল মর্টার এবং আরআর-এর সহায়তায় পাকসেনাদের বাড়িসা ঘাটের উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দেড়ঘণ্টার এই যুদ্ধে ২০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। বাড়িসা ঘাটের আক্রণের সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের রাজাসার দীঘির অবস্থানের উপরও আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণের ফলেও প্রায় ৬ জন নিহত এবং বেশ ক'টি বাংকার আমাদের সৈন্যরা ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হয়। আমাদের একটি ছোট দল আরিউরার নিকটে রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখে। পাকসেনারা বাড়িসা এবং রাজাসার দীঘি আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ৪/৫ টি গাড়ি ভর্তি সৈন্য নিয়ে সাহায্যের জন্য সেদিকে অগ্রসর হয়। পথে পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে একটি ট্রাক ও একটি জীপ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ১৮ জন পাকসেনা নিহত এবং ২ জন অফিসারসহ ৫ জন আহত হয়। এই

এলাকাতে সর্বত্র আমাদের আক্রমণের তীব্রতার দরুন পাকসেনারা নাজেহাল হয়ে যায়। ফলে এই এলাকায় পুনঃ প্রাধান্য ফিরে পাবার আশায় ২০ অক্টোবর বিকেল ৪ টার সময় তাদের একটি শক্তিশালী দল হরিসর্দার ঘাঁটি থেকে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি কামানের সহায়তায় প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে পাক সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করে। আমাদের গোলাগুলিতে অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এই এলাকা থেকে আমাদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্য সেই সাথে বিফল হয়ে যায়।

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে নোয়াখালী এলাকায় আমাদের গেরিলাদের শক্তিবৃদ্ধি পায়। অনেক গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ নিজ এলাকাতে পাঠানো হয়। সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য নোয়াখালী জেলাকে চারটি ভাগে বিভিক্ত করে বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারজন সুবেদারকে এইসব এলাকার গেরিলা এবং নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের তত্ত্বাবধানের ভার দেয়া হয়। সোনাইমুড়ি, ফরিদগঞ্জ এলাকার ভার সুবেদার আলী আকরব পাটোয়ারী, নোয়াখালী সদরের ভার সুবেদার লুৎফর রহমান, দক্ষিণ ফেণীর ভার সুবেদার জব্বার এবং লক্ষ্মীপুর ও রামগতির ভার অন্য আরেকজন সুবেদারের প্রতি আরোপিত হয়। এলাকা বিভক্তের পর স্থানীয় কম্যাণ্ডাররা সম্মিলিত গেরিলা ও নিয়মিত বাহিনীর পূর্ণ সহযোগিতায় তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। সুবেদার আলী আকবার পাটোয়ারীর নেতৃত্বে আগস্ট মাসের শেষের দিকে ফরিদগঞ্জ থানার রাওয়াল নামক গ্রামে পাকসেনাদের একটি দলকে অতর্কিত আক্রমণ করে ১২ জন পাকসেনাকে নিহত এবং ১০ জনকে আহত করে। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধাও শহীদ হয়। সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের আরেকটি গেরিলা দল গুণবতী ও সরিষাদী রেলস্টেশনে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ৩২ জন পাকসেনা ও রাজাকারকে হতাহত করে। সোনাইমুড়ির উত্তরে কাদের বাজারের নিকট পাকসেনাদের ১০টি দলকে এ্যামবুশ করে ৩ জনকে নিহত ও ১০ জনকে আহত করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। পাকিস্তানি রেঞ্জার ও রাজাকাররা রায়পুরের নিকট এল,এম, হাইস্কুলে একটি শিবির স্থাপন করে। ৬ আগস্ট সন্ধ্যার সময় আমাদের একটি গেরিলা দল শত্রুদের এই ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। ফলে ৯ জন রেঞ্জার হতাহত হয়। আমাদের একজন আহত হয়। এর দু'দিন পর আমাদের আরেকটি গেরিলা দল পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দলকে লক্ষ্মীপুর থানার দালাল বাজারে এ্যামবুশ করে ১৫ জন শত্রুসেনাকে হতাহত করে। ১৪ আগস্ট কোম্পানিগঞ্জ থানার বসুরহাটের নিকট পাক মিলিশিয়াদের এ্যামবুশ করে প্রায় ৩০ জনকে হতাহত করে। তারা একটি টয়োটা জীপও ধ্বংস করে দেয়। সংঘর্ষে আমাদের একজন সিপাই নুরুন্নবী মারাত্মকভাবে আহত হয়। পাকসেনারা আনুমানিক ৩০টি মেশিনগানের সাহায্যে গোলাগুলি চালায়। ১৮ আগস্ট রামগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এবং কয়েকজন দালালকে পাকসেনাদের ক্যাম্পে যাবার পথে নিহত করা হয়।

পাকপুলিশ এবং রাজাকাররা লক্ষ্মীপুর থানার চন্দ্রগঞ্জ প্রতাপ হাইস্কুলে একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৫ তারিখ রাত ১১ টার সময় আমাদের সৈনিকরা এই ঘাঁটি আক্রমণ করে

প্রায় ৪০ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। এবং সেখান হতে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। ১৬ আগস্ট সোনাইমুড়ি রেলস্টেশনের নিকট বগাদিয়া রেলসেতু গেরিলারা উড়িয়ে দেয়। আমাদের গেরিলাদের এইসব তৎপরতায় পাকসেনারা আরো ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল বেগমগঞ্জ থানার সোনাপুর ও গোপালপুরের নিকট দালালদের কাছে আমাদের ঘাঁটির খবর জেনে ৩০ আগস্ট সকালে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই আক্রমণকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে প্রতিহত করে। প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনাদের ৪০ জন নিহত হয়। আমাদের সেনাদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তারা তাদের মৃতদেহগুলো ফেলেই পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা ২০টি অস্ত্র দখল করে। আমাদের একজন সিপাই শহীদ হয়। এই ঘটনার দু'দিন পর আমাদের সৈনিকরা মাইন পুঁতে সোনাইমুড়ির নিকট বানোয়াইতে পাকসেনাদের একটি গাড়ি ধ্বংস করে। ফলে ১ জন পাকসেনা নিহত ও ৮ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দল রামগঞ্জের নিকট তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বাধীনে ২০ সেপ্টেম্বর আমাদের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল এই ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দু'ঘণ্টা যুদ্ধে ১৪ জন পাকসেনা নিহত ও ১৭ জন আহত হয়। এর ৩ দিন পর ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে ২৫০ সদস্যবিশিষ্ট পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দল রামগঞ্জ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ৫০ সদস্যের একটি দল এই খবর পেয়ে রাজগঞ্জ বাজারের পূর্বদিকে পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পেতে রাখে। পাকসেনারা অগ্রসর হবার পথে এই এ্যামবুশে পড়ে যায়। ফলে ২০ জন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত ও ২৭ জন আহত হয়। আহত পাকসেনা ও রাজাকারদের মাইজদী বেসামরিক হাসপাতালে ভর্তি করে। ২৫ সেপ্টেম্বর আরো দু'জন আহত পাকসেনা হাসপাতালে মারা যায়।

আমাদের অপর একটি গেরিলা দল লৌহজং থানার নিকট পদ্মানদীতে ১৮ হাজার মণ পাটসহ কয়েকটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এই পাটগুলো নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন পাটকলে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। ফেনীর নিকট বারদিন সেতুটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। ফলে ফেনী ও কুমিল্লার মাঝে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

রাজাকারসহ পাকসেনাদের একটি দল রামগঞ্জ থেকে লক্ষ্মীপুরের রাস্তায় ১০টি গাড়িতে ২৯ সেপ্টেম্বর অগ্রসর হচ্ছিলো। এই সংবাদ পেয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বে মীরগঞ্জ এবং ফজলচাঁদ হাটের নিকট পাকসেনাদের কনভয়টিকে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে পাকসেনারা মারাত্মাকভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। পাকসেনারাও গাড়ি থেকে নিচে নেমে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। উভয় পক্ষের মধ্যে সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। এই প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং স্থানীয় জনসাধারণের মনোবল আরো সুদৃঢ় হয়। অপর পক্ষে পাকসেনাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আমাদের ৬০ সদস্যের একটি গেরিলা দলে ১ অক্টোবর রায়পুরে

অবস্থিত রাজাকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৪০ জন রাজাকারকে নিহত করে। ১০ অক্টোবর পাকিস্তানিদের একটি রেঞ্জার দলে লক্ষ্মীপুর থেকে রামগঞ্জ যাবার পথে আমাদের গেরিলারা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে রেঞ্জারদের একটি গাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। এতে একজন রেঞ্জার নিহত ও ১২ জন আহত হয়। এর একদিন পর পাকিস্তানিদের একটি দল সোনাইমুড়িতে তাদের গাড়িতে আরোহণ করার সময় সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের একটি গেরিলা দল তাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দেড়ঘণ্টা গোলাগুলির পর ৬ জন পাকসেনা নিহত ও ৩ জন আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা সোনাইমুড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ১২ অক্টোবর আমাদের গেরিলারা ফেনী থানার অন্তর্গত লেমুয়ার একজন কুখ্যাত দালালকে হত্যা করে। এই সংবাদ পেয়ে পরদিন সকালে পাকিস্তানিদের একটি শক্তিশালী দল ওই এলাকায় আসে। এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপর নৃশংস অত্যচার শুরু করে। আমাদের ঐ এলাকার গেরিলারা পাকসেনাদের উপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করে। আমাদের ঐ এলাকার গেরিলারা পাকসেনাদের এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য প্রায় ৫০ জন একত্রিত হয়ে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। চারঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনারা পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে। প্রায় ৭ জন পাকসেনা ঐ যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়। বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে।

জুলাই এবং আগস্ট মাসে আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে কয়েকশ' গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে অপারেশনের জন্য তৈরি হয়। এইসব গেরিলাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ফরিদপুর সদর এবং মাদারীপুর মহকুমার বিভিন্ন থানায় অপারেশনের দায়িত্ব অর্পণ করার হয়। এইসব দলগুলোকে নবীনগর, দাউদকান্দি হয়ে নদীপথে তাদের নিজস্ব জায়গাতে পাঠানো হয়। ৩/৪ হাজার গেরিলা ছোট ছোট দলে গ্রাম্যপথে এবং নদীপথে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ অনুপ্রবেশ করে তাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়। শুধু একটি দল যাওয়ার পথে হোমনার নিকট পাকসেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাকসেনাদের গুলিতে একটি নৌকা ডুবে যায়। ফলে ৪ জন গেরিলা শহীদ হয় এবং ৪ জন আহত হয়। ৩টি স্টেনগান ও ৫টি রাইফেল পানিতে পড়ে ডুবে যায়। নিজ নিজ জায়গায় পৌঁছে গেরিলা দলগুলো তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। এই সময় পাকসেনারা ফরিদপুর হয়ে বরিশালের রাস্তায় যাতায়াত করতো। সেপ্টেম্বরে মাদারীপুরের একটি গেরিলা দল ভুরঘাটার নিকট একটি সড়ক সেতুতে আক্রমণ চালিয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। ফলে পাকসেনাদের বরিশাল যাতায়াতের রাস্তায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এরপর গেরিলাদের আরেকটি দল নড়িয়া থানা আক্রমণ করে। সেই সঙ্গে ডাকঘর ও রেজিস্ট্রি অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ১,৫০০ মণ পাটও তারা পুড়িয়ে দেয়। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে গেরিলারা ভেদরগঞ্জ থানা আক্রমণ করে সকল পাক পুলিশকে নিহত করে। সেখানকার রেজিস্ট্রি অফিস, পোস্ট অফিস, কালেক্টরেট অফিস ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই গেরিলারা পালং থানার রাজগঞ্জ এবং কোটালীপাড়ায় আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত সরকারি অফিস ধ্বংস করে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৪ হাজার মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়। পরের সপ্তাহে গেরিলাদের একটি

শক্তিশালী দল জাজিয়া থানার রাজস্ব অফিস এবং রেজিস্ট্রি অফিস বন্ধ করে দেয়। মাদারীপুরের অন্যান্য থানা আক্রমণ হওয়ার ফলে পাকসেনারা নড়িয়া থানাতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই থানার পাকসেনা ও পুলিশরা নিকটস্থ গ্রামে তাদের অকথ্য অত্যাচার চালায়। স্থানীয় গেরিলারা এই থানাটির শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবরাখবর সংগ্রহ করে। ৬ সেপ্টেম্বর ৫০ জনের একটি গেরিলা দল রাত ৮ টার সময় এই থানার উপর অতির্কত আক্রমণ চালায়। পাকসেনা ও পুলিশরা সর্বশক্তি দিয়ে থানাকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রায় তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের গেরিলারা থানাটি দখল করে নিতে সমর্থ হয়। প্রায় ১৭ জন পাকসেনা ও পুলিশ নিহত এবং বাকীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। থানার দারোগা এতে নিহত হয়। থানা থেকে ৩০টি রাইফেল এবং একটি বেতারযন্ত্র গেরিলাদের হস্তগত হয়। গেরিলারা থানাটি ধ্বংস করে দেয়। গেরিলাদের আরেকটি দল ঝিকরকাঠির নিকট বরিশাল-ফরিদপুর টেলিফোন লাইনের ৬শ' গজ তার নষ্ট করে দেয়। টেলিফোন বিভাগের টেকনিশিয়ানরা পাকসেনাদের পাহারায় টেলিফোন লাইনটি মেরামত করতে আসার পথে গেরিলাদের বসানো বিস্ফোরণে তাদের জীপটি ধ্বংস হয়ে যায়। পাকসেনাদের আরেকটি টহলদার দল মাদারীপুরের হওলাদার জুট মিলের নিকট গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় চারজন পাকসেনা নিহত হয়। গেরিলারা মাদারীপুরের নিকট ঘাটমাঝিতে প্রায় ৩০/৪০ গজ রাস্তা কেটে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মাদারীপুরের চরমুগরিয়ায় সরকারি পাটগুদামে আগুন লাগিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মণ পাট জ্বালিয়ে দেয় হয়। মাদারীপুর-ফরিদপুর রাস্তায় সমাদ্দার ফেরীঘাটে একটি ফেরী অগ্নিসংযোগে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। একটি মটর লঞ্চও ধ্বংস করা হয়। এই মটর লঞ্চটি পাকসেনারা টহল দেয়ার কাজে ব্যবহার করতো। আমাদের গেরিলাদের এইসব ব্যাপক তৎপরতায় পাকসেনারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ৬ সেপ্টেম্বর পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল লঞ্চে মাদারীপুরে দিকে তৎপরতা আরো জোরদার করার জন্য অগ্রসর হয়। এই খবর আমাদের গেরিলারা আগেই পেয়ে যায়। ২০ জনের একট গেরিলা দল পালং থানার রাজগঞ্জের নিকট নদীর তীরে পাকসেনাদের জন্য এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। সকাল ১০ টার সময় লঞ্চটি আমাদের গেরিলা দলের এ্যামবুশের আওতায় এলে তৎক্ষণাৎ গেরিলারা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে ১০/১২ জন পাকসেনা নিহত এবং বেশকিছু আহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে পাকসেনাদের লঞ্চটি শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায়। এর কয়েকদিন পর পাকসেনারা আরো অধিক সংখ্যক সৈন্য ফরিদপুর থেকে পালং থানায় মোতায়েন করে। ঐ এলাকার গেরিলারা পাকসেনাদের পালং থানার ঘাঁটি পুনর্দখলের পরিকল্পনা নেয়। গেরিলারা সঠিক সংবাদ নেয়ার পর জানতে পায় যে, থানাতে প্রায় এক প্লাটুন পাকসেনা ও ৫০/৬০ জন পাকপুলিশ এবং রাজাকার রয়েছে। ২/৩শ' গেরিলা একত্রি হয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২১ সেপ্টেম্বর রাত ১১ টায় পালং থানার উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় চারঘণ্টা সম্মুখযুদ্ধের পর ওই ঘাঁটি থেকে অনেক সংখ্যক পাকসেনা উপায়ান্তর না দেখে পালিয়ে যায়। গেরিলারা যুদ্ধে ৫০ জন পাকসেনা, রাজাকার ও পাকপুলিশকে নিহত করে। এর পর থেকে সম্পূর্ণ এলাকাটি আমাদের গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

কুমিল্লার উত্তরে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে এবং 'এ' কোম্পানি মেজর সালেক ও মেজর আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে মন্দভাগ ও শালদা নদী এলাকায় পাকসেনাদের উপর তাদের চাপ অব্যাহত রাখে। ফলে পাকসেনারা মন্দভাগ বাজার, লক্ষীপুর ও সাইতসালা প্রভৃতি জায়গা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে চান্দলা, পানছড়া ও সেনেরহাট ইত্যাদি জায়গায় তাদের ঘাঁটি পিছিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পাকসেনারা পুনরায় তাদের পূর্বোক্ত অবস্থানগুলো দখল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সৈনিকদের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষার সামনে তাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তাদের সঙ্গে যখন আমাদের সৈনিকদের সম্মুখযুদ্ধ তীব্রভাবে চলছিল সেই সময় আমাদের গেরিলারাও পাকসেনাদের পিছনে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলো। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকট বিদ্যাকোটে আমাদের গেরিলাদের একটি দল পাকসেনাদের একটি টহলদার কোম্পানিকে এ্যামবুশ করে একজন অফিসারসহ ৫০ জন পাকসেনাকে নিহত করে। তাদের চারটি নৌকাও ডুবিয়ে দেয়। গোসাইরহাট রেলস্টেশনের নিকট একটি রেলইঞ্জিন মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেল সড়কে গেরিলারা একটি টহলদার পাক সেনাদলকে এ্যামবুশ করে ৭ জন পাকসেনাকে নিহত করে। এসব সংঘর্ষে আমাদের গেলিরা অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকসেনারা কসবার পশ্চিমে প্রায় দুই কোম্পানি সৈন্য সমাবেশ করে। পাক সমাবেশে আমরা বুঝতে পারি যে, কসবাকে পুনর্দখল করার জন্য তারা পরিকল্পনা নিয়েছে। আমরা তাদের সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নেই। আমি আমাদের কসবা অবস্থানের সাহায্যার্থে আমাদের প্রথম গোলন্দাজ ব্যাটারিকে অনুরূপভাবে মোতায়েন করি।

১৩ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৫ টায় পাকসেনারা গোলন্দাজ বাহিনী সহায়তায় আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি বিপুল সাহস ও দৃঢ় আস্থার সঙ্গে এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। প্রায় একঘণ্টা যুদ্ধের পর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় তীব্র পাল্টা আক্রমণের মুখে পাকসেনারা টিকতে না পেরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে প্রায় ৪৫ জন পাকসেনা হতাহত হয়। ১৫টি জি-III রাইফেল, একটি ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং ৩,৫০০টি ৭.৬২ গুলি ও ৮টি ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা আমাদের হস্তগত হয়। এছাড়াও ন'টি বাংকার ধ্বংস করা হয়। এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমাদের ২ জন শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। পরে জানা যায় যে, পাকসেনারা এই আক্রমণে ৫ম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্য নিয়োগ করেছিল। পরদিন পাকসেনারা যখন কসবার পশ্চিম দিক থেকে আরো পিছু হটে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই সময় আমাদের একটি প্লাটুন তাদের একটি দলকে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে প্রায় ১৫ জন পাকসেনা এবং ১৫ রাজাকার নিহত হয়। আমাদের ২ জন সৈনিক শহীদ এবং একজন আহত হয়। আমাদের একটি হালকা মেশিনগান বিনষ্ট হয়।

এই সময় পাকসেনারা তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোতে লঞ্চ ও নৌকার সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতো। নদীপথে জলযান বন্ধ করে দেয়ার জন্য আমি একটি গেরিলা দলকে বাঞ্ছারাম থানার উজানচরের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহকারী পাইলনগুলো কেটে নদীতে

ফেলে নদীপথে বাধা সৃষ্টি করার নির্দেশ দেই। নির্দেশমতো আমাদের গেরিলা দল বৈদ্যুতিক পাইলগুলো কেটে নদীতে ফেলে দিয়ে একটু দূরে এ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পাইলন কাটার সংবাদ পেয়ে ৩/৪টি লঞ্চভর্তি পাকসেনা, মুজাহিদ ও রাজাকার নদীপথের এই বাধাগুলো পরিষ্কার করার জন্য আসে। পাকসেনারা যখন কাজে লেগে যায় ঠিক এমন সময় অদূরেই এ্যামবুশ পেতে অবস্থানরত আমাদের গেরিলারা তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে প্রায় ৭০/৮০ জন পাকসেনা, মুজাহিদ এবং রাজাকার নিহত হয়। গেরিলাদের প্রচণ্ড গোলার মুখে অবশিষ্ট পাকসেনা লঞ্চ নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। এই বিপর্যয়ের কয়েকদিন পর পাকসেনারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ৫/৬টি লঞ্চে বিপুল সংখ্যক সৈন্য বিমান বাহিনীর সহায়তায় আমাদের উজানচরের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা শুধু হালকা মেশিনগান, রাইফেল ও এসএলআর নিয়ে পাকসেনাদের এই বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ চালায়। কিন্তু বিমান হামলার বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে অবশেষে অবস্থান'টি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর তিনদিন পর ১১ অক্টোবর বিকাল ৪ টায় আমাদের এই দলটি জানতে পারে যে, পাকসেনাদের একটি প্লাটুন লঞ্চযোগ বাঞ্ছারাম থানার আসাদনগর এলাকা লুট করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এই খবর পেয়ে আমাদের গেরিলা দলটি পাকসেনাদের লঞ্চটিকে আসাদনগরের কাছে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে ৮ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং অন্যরা পলায়ন করে প্রাণ বাঁচায়। আমাদের আরেকটি দল হোমনায় তাদের বেই'স তৈরি করে। এই সময় হোমনা থানাতে পাকসেনারা পশ্চিম পাক পুলিশ মোতায়ন করে। আমাদের গেরিলা দলটি হোমনা থানাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ৭ জন পাকপুলিশকে নিহত করে এবং ৭টি রাইফেল ও কয়েকশ' রাউণ্ড গুলি দখল করে নেয়।

পাকসেনারা কসবাতে বিপর্যস্ত হওয়ার পর কুমিল্লা থেকে চান্দলার নিকট সৈন্য সমাবেশ করে। পাকসেনাদের মূল কারণ ছিল মন্দভাগকে পুনর্দখল করা। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি এই সময় মন্দভাগের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। ১৮ তারিখ রাত সাড়ে ৩ টায় পাকসেনারা প্রায় এক কোম্পানি শক্তি নিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষার উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। প্রায় তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর সকাল সাড়ে ৬ টা পর্যন্ত আমাদের সৈনিকরা এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। পাকসেনারা প্রতিহত হয়ে আমাদের রক্ষাব্যূহের সামনে থেকে গোলাগুলি চালাতে তাকে। বেলা ১০ টার সময় পাকসেনারা আরো দুই কোম্পানি সৈন্য নিয়ে দু'বার আক্রমণ চালায়। পাকসেনাদের এই শক্তিশালী দলগুলো গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় প্রবল বাধার মাঝেও সামনে অগ্রসর হতে থাকে। অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের সৈনিকদের গুলিতে তাদের অনেক হতাহত হয়। অবশেষে পাক সেনারা আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা যাবত হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদের দুর্ধর্ষ সৈনিকরা আমারেদ প্রতিরক্ষাব্যূহে প্রবেশকারী পাকসেনাদেরকে সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। পাকসেনারা তাদের মৃতদেহ ফেলে রেখেই পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের চতুর্দিকস্থ কর্দমাক্ত নিম্ন জলাভূমি দিয়ে পালাবার পথে তারা আরো

অধিকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আমাদের সৈন্যরা এই যুদ্ধে ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্টের সেকেণ্ড লে. পারভেজ খানসহ ৮ জন পাকসেনারকে বন্দি করে। এছাড়া একজন অফিসারসহ ৫০ জন পাকসেনা নিহত হয়। ৬টি ৮১ মি.মি. মর্টার, কুড়িটি ৭.৬২ চীনা রাইফেল, চারটি জি-III রাইফেল, ১টি MG1A3, ১টি মর্টার ১টি হালকা পিস্তল, ৫ টি সাবমেশিনগান, ১৫ বাক্স মেশিনগানের গুলি, ৩১টি ৯৪-এনার্গা গ্রেনেড, ২০টি ৩৬-এইচই গ্রেনেড, ১০টি ৮১ মি.মি. মর্টারের গোলা, অনেকগুলো বেয়োনেট, বেশকিছু জি-III রাইফেল ম্যাগজিন, ১৫টি বিভিন্ন দলিলপত্রসহ বেশকিছু ফাইল আমাদের সৈন্যরা দখল করে নেয়। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে আমাদের ৫ জন সৈনিক গুরুতরভাবে আহত হয়, কেউ শহীদ হয়নি। তারে এই বিপুল বিপর্যয়ের ফলে পর্যুদস্ত দিশেহারা পাকবাহিনীর এফ-৮৬ জঙ্গীবিমান দিয়ে আমাদের অবস্থানে প্রয় ৪৫ মিনিটকাল ধরে মারাত্মকভাবে হামলা চালায়। পাকসেনার গোলন্দাজ ইউনিটও ভারি কামানের সাহায্যে শত শত গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের এই অবস্থানটি দখল করতে না পেরে পাকসেনারা কিছু পিছনে গিয়ে পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২০ অক্টোবর পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল সকাল থেকে কামালপুরের নিকট আমাদের আরেকটি অবস্থানের উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণেও তারা আমাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে বিফল হয়। পাকিস্তানিদের একজন অফিসারসহ ৩০ জন সৈনিক নিহত হয়। বারবার ব্যর্থ হওয়ায় পাকবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। পাকসেনারা ৩/4 দিন ধরে আমাদের অবস্থানগুলো দুর্বলতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালায়। ২৫ তারিখ অপরাহ্ন ৩ টা ২৫ মিনিট থেকে মন্দভাগ, মঙ্গলপুর ও শ্রীপুরস্থ আমাদের অবস্থানগুলোর উপর বিকাল ৪টা ১০ মিনিট পর্যন্ত চারটি এফ-৮৬ জঙ্গীবিমান প্রবলভাবে হামলা চালায় এবং একই সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসৈনিকরাও এইসব অবস্থানগুলোর উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টা পর্যন্ত চলতে থাকে। আমাদের সৈনিকরাও মনোবল না হারিয়ে পাকসেনাদের এই সম্মিলিত আক্রমণকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করে। সংঘর্ষে পাকসেনাদের প্রায় ৫৮ জন সৈনিক হতাহত হয়। ফলে তাদের আক্রমণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে পিছু হটে যায়। যুদ্ধে আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ এবং ৯ জন আহত হয়।

আমরা যখন মন্দভাগে পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত এবং পাকসেনাদের প্রতিহত করার জন্য কসবার অবস্থান থেকে কিছু সংখ্যক সৈন্য মন্দভাগ নিয়ে মন্দভাগ অবস্থানকে শক্তিশালী করছিলাম ঠিক তখনই আমাদের কসবার অবস্থানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাকসেনারা অগ্রসর হয়ে কসবার পুরানো বাজার পর্যন্ত পুনর্দখল করে নেয়।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমার সেক্টরের সৈনিকদের পুনর্গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ আসে 'কে' ফোর্স গঠনের। আমি আগে থেকেই মনস্থ করেছিলাম যে, পাকসেনাদের উপর পুনঃআক্রমণের পূর্বে আমার অধীনস্থ সৈনিকদের পুনর্গঠনের দরকার। গত ৪/৫ মাস ধরে অবিরাম যুদ্ধে এবং জীবন ধারণের নিম্নতম প্রয়োজন

আহার-নিদ্রা থেকে বঞ্চিত ও যুদ্ধ সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি প্রবল প্রতিকূলতার দরুন তারা স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে শত্রুপক্ষকে আক্রমণের পূর্বে আমাদের সৈনিকদের কিছু বিশ্রাম ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়া নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকদের নিয়ে এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের পুরানো ও অভিজ্ঞ সৈনিকদের নিয়ে আরো কয়েকটি ব্যাটালিয়ন গঠন করার ইচ্ছা ছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি আমার সাব-সেক্টর কামান্ডারদের নিয়ে আমার হেডকোয়ার্টার মেলাঘরে একটি কনফারেন্স করি। সে কনফারেন্সে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয় :

ক. ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল থেকে পুরানো ও অভিজ্ঞ সৈনিক নিয়ে আরো দুটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হবে।

খ. ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি এবং হেডকোয়ার্টারের কিছু সৈনিক ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলেই থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলকে পুনর্গঠন করা হবে। এই ব্যাটালিয়নটি কমান্ড করার জন্য ক্যাপ্টেন গাফফারকে নিযুক্ত করা হল। এই ব্যাটালিয়নটি পুনর্গঠন এবং পুনর্বিন্যাসের জন্য কোনাবন বেইস-এ একত্রিত করা হবে।

গ. ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি এবং 'বি' কোম্পানির কিছু সৈন্য নিয়ে নতুন করে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হবে। মেজর আইনউদ্দিনকে এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হল। এই ব্যাটালিয়নটিকে কসবা বেইস-এর পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হবে।

ঘ. ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি এবং 'বি' কোম্পানির অবশিষ্ট সৈনিকদের নিয়ে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হবে। মেজর সালেককে এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হল। মেজর সালেক এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি শালদা নদীতে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তাকে তার সৈন্যসহ বিলোনিয়াতে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বিলোনিয়া রাজনগর বেইস-এ পুনর্বিন্যাস করা হবে।

ঙ. ২ নং সেক্টরের অধীনস্থ সব যোদ্ধাদের তিনভাগে বিভক্ত করা হবে। নবগঠিত ৪র্থ, ৯ম ও ১০ম ইস্ট রেজিমেন্টকে নিয়ে 'কে' ফোর্স নামে ব্রিগেড গঠন করা হলো।

চ. নবগঠিত 'কে' ফোর্স ব্রিগেডের আলাদা হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে সেখানে স্টাফ অফিসার হিসেবে মেজর মতিন এবং ক্যাপ্টেন আনোয়ারুল আলমকে নিযুক্ত করা হল।

ছ. গেরিলা হেডকোয়ার্টার মেলাঘরেই রাখা হবে। মেজর হায়দার আমার অধীনে গেরিলা স্টাফ অফিসার নিযুক্ত হল।

জ. ১৮টি সেক্টর কোম্পানি হিসেবেই থাকবে এবং তারা 'কে' ফোর্স হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ মেনে চলবে। তাদেরকে সাধারণত কমান্ডো হিসেবে

শত্রুপক্ষের পশ্চাৎভাগে (গভীর অভ্যন্তরে) ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাবার কাজে নিয়োগ করা হবে।

ঝ. গেরিলারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় পাকসেনাদের নির্মূল করে নিজ নিজ এলাকা শত্রুমুক্ত করবে। পাকসেনাদের ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন করে তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলোকে অনুরোধ করে আত্মসমর্পণ করাতে বাধ্য করবে।

ঞ. 'কে' ফোর্স ব্রিগেডকে পাকসেনাদের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলোকে দখল করার কাজে নিয়োগ করা হবে এবং উদ্ধারকৃত মুক্ত এলাকার প্রতিরক্ষায় কাজে নিয়োজিত থাকবে।

ট. অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখের মধ্যেই 'কে' ফোর্স পুনর্গঠনের কাজ শেষ করা হবে।

ঠ. 'কে' ফোর্স পুনর্গঠনকালে পাকসেনারা যাতে তাদের হৃত মনোবল পুনরুদ্ধার না করতে পারে এবং প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম না হয় সেজন্য সেক্টর কোম্পানিগুলো এবং কমান্ডো প্লাটুনগুলো গেরিলাদের সহায়তায় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের অপারেশন এলাকায় নিয়োজিত থেকে শূন্যতা পূরণ করবে এবং তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখবে।

ড. অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম যা কিছু আছে তা পুনরায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা হবে।

ঢ. গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট 'কে' ফোর্স-এর অধীনে নিযুক্ত করা হলো।

ণ. 'কে' ফোর্স এবং ২ নং সেক্টরের অধিনায়কত্ব যৌথভাবে আমার অধীনে থাকবে। আমার অবর্তমানে এই দুটি বাহিনী বিভক্ত হবে। 'কে' ফোর্স-এর অধিনায়কত্ব করবেন মেজর সালেক ও ২ নং সেক্টরের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করবেন মেজর হায়দার।

কনফারেন্সের বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ নং সেক্টরের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হয়। নিয়মিত বাহিনীর 'কে' ফোর্স ব্রিগেড গঠন করার কাজে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। যেহেতু যুদ্ধসামগ্রীর যথেষ্ট অভাব ছিল, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও পোশাকের, তবুও সংগঠনের কাজ মোটামুটি এগিয়ে চলে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কসবাতে, ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট শালদা নদীতে এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিলোনিয়াতে সংগঠিত হয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যায়। যুদ্ধে পুনঃনিয়োগের আগে এইসব ইউনিটগুলোকে তিন সপ্তাহের জন্য ব্যাপকভাবে সমন্বিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল পরীক্ষামূলকভাবে যুদ্ধেক্ষেত্রে পুনঃনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেই। এই সময়ে আমাদের সেক্টর ট্রুপস কসবা, মন্দভাগ প্রভৃতি এলাকায় পাকসেনাদের উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হেনে চলছিল। ফলে পাকসেনারা এই এলাকায় ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে এই এলাকা থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেই। কসবার পূর্বাংশ ইতোমধ্যেই আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। পাকসেনারা

সেখান থেকে পিছু হটে পূর্বেই পশ্চিমাংশে পুরানা বাজারের নিকট তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। পাকসেনাদের এই ঘাঁটিটিও ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আক্রমণের নির্দেশ দেই। নির্দেশ অনুযায়ী মেজর আইনউদ্দিন তার ব্যাটালিয়নকে লাতুমুড়ার পিছনে সমবেত করে এবং ২০ অক্টোবর পর্যন্ত শত্রুর অবস্থানের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে। শত্রুর অবস্থানের তথ্য জানার পর বোঝা যায় যে পাকসেনারা তাদের অবস্থানটি পূর্ব এবং দক্ষিণমুখী করে অধিক শক্তিশালী করে তুলেছে। আমি মেজর আইনউদ্দিনকে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি দিয়ে উত্তর দিক থেকে পাক অবস্থানের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেই। শত্রুসেনারা মনোযোগ অন্যদিকে পরিবর্তন করার জন্য একটি কোম্পানি দিয়ে কসবার দিক থেকে অবস্থানের উপর চাপ সৃষ্টি করার নির্দেশ দেই। আরেকটি কোম্পানি রিজার্ভে থাকার আদেশ করি। ১ম ফিল্ড ব্যাটারিকে এই আক্রমণে সহায়তার জন্য মেজর আইনউদ্দিনের অধীনে দেই।

২২ অক্টোবর ভোর সাড়ে ৫ টার সময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় ১০ মিনিট তীব্র কামানের গোলার আক্রমণের পর উত্তর দিক থেকে দুটি কোম্পানি লে. আজিজ ও সুবেদার মেজর শামসুর হকের নেতৃত্বে পাকসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাকসেনারা প্রস্তুত ছিল না। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাদের অবস্থানগুলো ভেঙ্গে পড়ে। তারা দিশেহারা হয়ে অবস্থান পরিত্যাগ করে পেছনের দিকে পালিয়ে যায়। তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকসেনাদের অবস্থানটি দখল করে নেয়। যুদ্ধে ২৬ জন পাকসেনা নিহত ও ১৮ জন আহত হয়। ১১টি এলএমজি, ১টি পিস্তল সিগনাল, ৪০টি এইচই-৩৬ গ্রেনেড, ৩টি ৯৪ এনার্গা, ৪৪টি প্লাস্টিক মাইন, ১টি ম্যাপ, ২টি র‍্যাঙ্কের 'ব্যাজ' আমাদের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের লে. আজিজ ও ৩ জন সৈনিক শহীদ হয় এবং ১৫ জন আহত হয়। পাকসেনাদের একটি ছোট দল পিছনে হটে গিয়ে ছোট একটি নালার পশ্চিম তীরে পুনরায় দ্রুত অবস্থান গড়ে তোলার চেষ্টা করে। পরদিন ভোর ৪ টায় সুবেদার মেজর শামসুল হকের কোম্পানি পাকসেনাদের এই অবস্থানের উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ২০ জন পাকসেনা নিহত ও ২২ জন আহত হয়। বিপর্যস্ত হয়ে পাকসেনারা সম্পূর্ণরূপে পশ্চাতে হটে যায়। এই আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ কসবা আমাদের দখলে আসে। পাকসেনারা পিছু হটে গিয়ে মইনপুর, কায়েমপুর, কামালপুর, গুবগুইট প্রভৃতি জায়গায় তাদের নতুন অবস্থান তৈরি করে।

কসবা শত্রুমুক্ত করার পর ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কৃশানপুর, বগাবাড়ি, ইয়াকুবপুর এলাকা জুড়ে তাদের নতুন প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করে। এই অবস্থানগুলো থেকে পেট্রোল পার্টি ও শক্তিশালী রেইডিং পার্টি পাক অবস্থানগুলোর উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের সংঘর্ষে ২২ জন পাকসেনা নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কোনাবনে তাদের বেইস-এ পুনর্গঠিত হওয়ার পর অক্টোবর মাসে পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যায়। আমি এই ব্যাটালিয়নকে শালদা

নদী থেকে পাকসেনাদের বিতাড়িত করার নির্দেশ দেই। শালদা এলাকার কমপ্লেক্স ট্যাকটিক্যাল এলাকা বলে তাদেরকে পুরো ব্যাটালিয়ন হিসাবে আক্রমণ করার নির্দেশ প্রদান করি। কোম্পানি এবং প্লাটুন-এ ভাগ হয়ে প্রথম তৎপরতা চালিয়ে এলাকার উপর পুরো আধিপত্য অর্জন করার নির্দেশ দেই। এই নির্দেশের পর ক্যাপ্টেন গাফফার তার মন্দভাগ অবস্থান থেকে শালদা নদীর পশ্চিমে ও উত্তরে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি প্লাটুন কায়েমপুরের নিকট এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনাদের প্রায় ৪০ জন সৈনিক এই এ্যামবুশে আক্রান্ত হয়। ফলে ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং অনেক আহত হয়। এর ৩/৪ দিন পর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের আরেকটি রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের চত্তরা অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে রকেট লঞ্চার দ্বারা একটি বাংকার উড়িয়ে দেয় এবং ১৫ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। এর কিছুদিন পর নায়েব সুবেদার সিকদার আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানি পাকসেনাদের পেছনে অনুপ্রবেশ করে চাপিতলায় এ্যামবুশ পাতে। পরদিন ভোর ৪ টায় পাকসেনাদের দুটি কোম্পানি তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলো শক্তিশালী করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলো। পাকসেনাদের এই দলটি ভোর পাঁচটায় আমাদের এ্যামবুশে এসে যায়। প্রায় চার ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে প্রায় ৫০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। এই আক্রমণের পরপরই পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের উপর জঙ্গী বিমান দিয়ে ৯ টা ৪৫ মিনিট থেকে ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রচণ্ড আক্রমণ করে। আমাদের পক্ষে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকসেনাদের কামালপুর, মইনপুর, লক্ষ্মীপুর অবস্থানগুলোর উপর তাদের চাপ আরো জোরদার করে তোলে। ১১ নভেম্বর আমাদের একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি পাকসনাদের কামালপুরের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। সাড়ে ৯ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত এই আক্রমণে পাকসেনাদের ১৬ জন নিহত এবং ২২ জন আহত হয়। এর পরদিন সকাল সাড়ে ৫ টায় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানি লক্ষ্মীপুর এবং শালদা নদী ফেরী এলাকা আক্রমণ করে দখল করে নেয়। যুদ্ধে প্রায় ১০০ জন পাকসেনা হতাহত হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়। আমাদের ১ জন সৈনিক শহীদ ও ৭ জন আহত হয়। শত্রুদের কাছ থেকে ১৫টি রাইফেল, ৩টি এলএমজি, ১২টি এলএমজি বাক্স, ২টি পিস্তল, একটি ৪০ মি.মি. রকেট লঞ্চার, ৭২টি ৬০ মি.মি. মর্টার বোমা, ৩টি টেলিফোন সেট, ১টি জেনারেটর, ৫টি অয়্যারলেস সেট ব্যাটারী, ১টি মেশিনগানের ব্যারেল এবং ৪টি ম্যাপসহ অনেক যুদ্ধসরঞ্জাম দখল করে নেয়। শালদা নদী ফেরী এবং লক্ষ্মীপুর এলাকা আমাদের দখলে আসার পর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে শালদা নদী কমপ্লেক্স দখল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

শালদা নদীর যুদ্ধ

শালদা নদী এলাকায় শত্রুদের ঘাঁটিটি খুবই শক্তিশালী ছিল। এই ঘাঁটির উত্তরদিক দিয়ে শালদা নদী প্রবাহিত হওয়ায় শত্রুদের উত্তর দিকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ছিল। পূর্ব দিকে রেলওয়ে স্টেশন ও উঁচু রেল লাইন সম্মুখবর্তী এলাকায় শত্রুদের নিরাপত্তায় প্রাধান্য

বিস্তার করে। পশ্চিমের গুদাঘরের উঁচু ভূমি তাদের শক্তিশালী ঘাঁটির নিরাপত্তায় বেশ সহায়ক ছিল। এই অবস্থানটিকে নিয়মিত প্রথায় আক্রমণ করে সফল হওয়া দুষ্কর ছিল। শত্রুঘাঁটির এই সকল বৈশিষ্ট্য তাদের পক্ষে সহায়ক হওয়ায় আমরা এই ঘাঁটিটিকে নিয়মিত প্রথায় আক্রমণ না করে অনিয়মিত পদ্ধতিতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেই। শত্রুদের ঘাঁটিটি পর্যবেক্ষণের পর আমরা আরো জানতে পারি যে, শালদা নদীর তীর বরাবর আমাদের ঠিক সামনে তারা চারটি বড় পরিখা খনন করেছে। শালদা নদীর গুদামঘরের পাশ দিয়েও তারা একই রকম পরিখা খনন করেছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘাঁটিটিকে তিনদিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন গাফফার ও নায়েব সুবেদার সিরাজের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন শালদা নদী রেলস্টেশনের পূর্বে পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান নেয়। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার নেতৃত্বে আরেকটি প্লাটুন শালদা নদী ও গুদামঘরের পশ্চিমে নদী অতিক্রম করে অবস্থান নেয়। সুবেদার বেলায়েতের নেতৃত্বে আরেকটি প্লাটুন শালদা নদীতে শত্রুঘাঁটির বিপরীত দিকে অবস্থান নেয়। পাকসেনারা যাতে আক্রমণের সময় আমাদের পেছন থেকে আঘাত হানতে না পারে সেজন্য সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে একটি কোম্পানি মঙ্গল মিয়ার অবস্থানের পেছনে নিরাপত্তামূলক অবস্থান গ্রহণ করে। এছাড়া পাকসেনাদের মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করার জন্য চারটি ছোট রেইডিং পার্টিকে বড় ধুশিয়া, চান্দলা, গোবিন্দপুর, কায়েমপুর প্রভৃতি শত্রুঘাঁটির দিকে পাঠানো হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এইসব রেইডিং পার্টিগুলো ১৫ নভেম্বর রাতে পাকসেনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য শত্রুঘাঁটির উপর হালকা আক্রমণ চালায়। সঙ্গে পাকসেনারা শালদা নদী থেকে রেইডিং পার্টির উপর কামান এবং মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে। এই গোলাবর্ষণ সমস্ত রাত ধরে চলে এবং ভোরের দিকে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের আক্রমণ শেষ হয়ে গেছে ভেবে পাকসেনারা পরদিন সকালে কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়ে এবং বিশ্রামের সুযোগ নেয়। এই সময় তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলো রাজাকার এবং ইপকাপ-এর প্রহরাধীন ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শত্রুরা সাধারণত রাতের বেলায় আমাদের সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য যতটা সতর্ক থাকতো, দিনের বেলায় ততোটা প্রস্তুত থাকতো না।

এমতাবস্থায় আমরা তাদের এই অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সকাল ৮ টার দিকে তাদের উপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচণ্ড আক্রমণ চালাই। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার দলটি পশ্চিম দিকে থেকে শালদা নদী গুদাঘরের পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর এবং নায়েব সুবেদার রিয়াজ পূর্বদিকের পাহাড়ী এলাকার অবস্থান থেকে শালদা নদী রেলস্টেশন-এর পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে নায়েব সুবেদার মুহম্মদ হোসেন নায়েব সুবেদার বেলায়েতের অবস্থান থেকে নদীর অপর তীরের পরিখাগুলোতে আরআর-এর সাহায্যে শত্রুদের চারটি পরিখা ধ্বংস করে দেয়। এতে আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হয় এবং পাকসেনারা সম্মুখবর্তী পরিখা ছেড়ে পিছু হটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নায়েব সুবেদার বেলায়েত তার সৈন্যদের নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাঁতরিয়ে অপর তীরে শত্রুদের সম্মুখবর্তী পরিত্যক্ত পরিখাগুলো দখল করে নেয় এবং কিছু সৈনিক সেইসব পরিখাতে রেখে সামনের দিকে আরো অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার

পথে নায়েব সুবেদার বেলায়েত শত্রুসেনা কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হয়। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে নায়েব সুবেদার বেলায়েত বীরবিক্রমে সম্মুখভাগের শত্রুপরিখার উপর গ্রেনেড চার্জ করে। এরা কয়েকটি শত্রু বাংকার ধ্বংস করে এবং শত্রুসৈন্য নিহত করে। নায়েব সুবেদার বেলায়েত ও তার দলের প্রচণ্ড আক্রমণে শালদা নদীর তীরবর্তী এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হয়ে যায়। ফলে শালদা নদী রেলস্টেশনে অবস্থানরত পাকসেনাদের সঙ্গে শালদা নদী গুদামঘরে অবস্থানরত পাকসেনাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তারা দুই ভাগে বিভিক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। পাকসেনারা আমাদের উপর কামান কিংবা মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করার সুযোগ পাচ্ছিলো না। কেননা, আমাদের সৈনিকরা তাদের দু'দলের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে যাওয়ায় তাদের গোলাবর্ষণে নিজেদেরই ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। গুদামঘরে অবস্থানরত পাকসেনারা বুঝতে পরে যে, তারা দু'দিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণের শিকার হয়ে মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের পক্ষে এই আক্রমণের মুখে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। এই সময় পাকসেনাদের একটি অয়্যারলেস ম্যাসেজ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এতে তারা কর্তৃপক্ষকে জানায় যে, মুক্তিবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছে। তাদের পক্ষে এই ঘাঁটিতে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এই ম্যাসেজ পাওয়ার পর পাকসেনাদের দুর্বলতা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি। তাদের মনোবল যে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে তা বেশ বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার মঙ্গল মিয়াকে তার আক্রমণ আরো জোরদার করার নির্দেশ দেই। এই প্রচণ্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে গুদামঘরে অবস্থানরত পাকসেনারা নয়নপুর রেলস্টেশনের দিকে পালাতে থাকে। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার দলটি গুদামঘর এলাকা দখল করে নেয়। আরো কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর নায়েব সুবেদার বেলায়েত এবং নায়েব সুবেদার সিরাজের প্রচণ্ড আক্রমণে শালদা নদী রেলস্টেশনে অবস্থানকারী পাকসেনারাও রেললাইন ধরে নয়নপুরের দিকে পালাতে থাকে। আমাদের সৈনিকরা পলায়নপর পাকসেনাদের উপর গুলি চালিয়ে অনেককে হতাহত করে। দুপুর নাগাদ সমস্ত শালদা নদী এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। পাকসেনারা যাতে এই এলাকাটি আবার দখল করে নিতে না পারে সেজন্য আমাদের অবস্থানটিকে শক্তিশালী করে তোলা হয়। পাকসেনারা নয়নপুর রেলস্টেশনের ঘাঁটি থেকে বেশ কয়েকবার এই অবস্থানের উপর মর্টার ও কামানের আক্রমণ চালায় এবং এই অবস্থানটি পুনর্দখলের জন্য শালদা নদী গুদামঘরের দক্ষিণে কিছুসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করে। এই খবর পেয়ে নায়েব সুবেদার বেলায়েত একটি দল নিয়ে পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য গুদামঘর এলাকায় আক্রমণ চালায়। পাকসেনাদের আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু একজন পাকসেনা আড়াল থেকে নায়েব সুবেদার বেলায়েতকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। নায়েব সুবেদার বেলায়েতের মাথায় গুলি বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিকিৎসার জন্য ২ নং সেক্টরে মুক্তিবাহিনী হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, হাসপাতালে পৌঁছার আগেই পথে সে শাহাদাত বরণ করে। তার মতো বীর সৈনিকের শহীদ হওয়াতে আমরা

সবাই মর্মাহত হয়ে পড়ি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা বাংলাদেশ একজন মহান বীরকে হারালো। সুবেদার বেলায়েতের কীর্তি এবং বিক্রমের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শালদা নদী এলাকা দখল করা একটি দুঃসাহসী পরিকল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনা অত্যন্ত অপ্রচলিত কৌশলের একটি বিরাট সাফল্য। এর ফলে কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। আমাদের সরকার ক্যাপ্টেন গাফফার এবং শহীদ বেলায়েতকে কৃতিত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য 'বীরউত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। এগুলোর মধ্যে ২১ টা রাইফেল, ৫ টা এলএমজি ৩ টা MG1A3 মেশিনগান, ৩১ টা হালকা মেশিনগান ম্যাগাজিন, ৪ টা রকেট লঞ্চার (৮০ টি গোলা সহ), ১ টা এসএমজি, ১ টা অয়্যারলেস সেট, ২০২৫০টি গুলি, ২০০ টা ২" মর্টার শেলা, ৩ টা টেলিফোন সেট, ১ টা জেনারেটর, ১ টা এমজি ব্যারেল, অনেক রেশন ও কাপড়-চোপড়, ম্যাপ ও বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র আমাদের দখলে আসে। এইসব দলিলপত্র থেকে জানা যায় ৩০ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের 'বি' কোম্পানি ও 'ডি' কোম্পানি পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা ব্যূহে নিয়োজিত ছিল। এই সংঘর্ষে প্রায় ৮০/৯০ জন পাকসেনা হতাহত হয় এবং ১২ পাকসেনা আমাদের হাতে জীবন্ত ধরা পড়ে। ভোর ৫ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত ১৬ ঘণ্টা যুদ্ধে আমাদের ২ জন শহীদ এবং ৮ জন আহত হয়।

শালদা নদী কমপ্লেক্স আমাদের হস্তগত হওয়ার পর পাকসেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই এলাকা পুনর্দখলের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। পাকসেনারা চান্দলার নিকটে অন্যান্য এলাকা থেকে প্রচুর সৈন্য এনে সমাবেশ ঘটায়। ১৬ নভেম্বর রাত ২-১৫ মিনিটে পাকসেনারা প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্যশক্তি নিয়ে আমাদের শালদা নদী, মন্দভাগ, কামালপুর, মঙ্গল প্রভৃতি অবস্থানের উপর গোলন্দাজ বাহিনী ও মর্টারের সহায়তায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ প্রায় ৩/4 ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে পাকসেনাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করে। সকাল পর্যন্ত যুদ্ধে পাকসেনারা আক্রমণ পরিত্যাগ করে পিছু হটে যায়। এর একদিন পর আমাদের একটি ছোট দল মঙ্গলপুরের নিকট পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ১৭ জন পাকসেনাকে নিহত ও অনেককে আহত করে। আরেকটি রেইডিং পার্টি কায়েমপুরে পাকসেনাদের অবস্থানের দুটি বাংকার আরআর দিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে ১৪ জন পাকসেনাকে নিহত করে। ২০ এবং ২১ নভেম্বর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি এবং 'বি' কোম্পানি মঙ্গলপুর এবং কায়েমপুরের উপর তাদের চাপ বাড়িয়ে তোলে। ২১ তারিখ সকাল ৯ টার সময় এই দুই কোম্পানি পাক অবস্থনের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ১৬ জন পাকসেনাকে নিহত এবং ৯ জনকে আহত করে। ১০৬ আরআর-এর সাহায্যে পাকসেনাদের বেশ ক'টি বাংকার উড়িয়ে দেয়া হয়। আমাদের সৈনিকরা অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। ২৩ নভেম্বর পাকসেনারা আমাদের মন্দভাগ অবস্থানটি পুনর্দখলের জন্য আবার তাদের সৈন্য একত্রিত করতে থাকে। দুপুর ২ টার সময় আমাদের একটি কোম্পানি

পাকসেনাদের সমাবেশের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে পাকসেনাদের অনেক হতাহত হয়। পরে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। মন্দভাগ পুনর্দখল করতে অসমর্থ হয়ে পাকসেনারা শালদা নদীর নিকটে মনোরা রেলসেতুর নিকটবর্তী আমাদের অবস্থানগুলোর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মেশিনগান, ১০৬ মি.মি. আরআর ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের একটি বাংকার ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয় এবং তাদের বহু সৈনিককে হতাহত করে। আমাদের একজন সৈনিক শহীদ এবং ৪ জন আহত হয়। একটি মেশিনগান গোলন্দাজ বাহিনীর গুলিতে নষ্ট হয়ে যায়। ২৩ নভেম্বর থেকে পাকসেনাদের সঙ্গে বেশ ক'টি খণ্ডযুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা শত্রুদেরকে বিতাড়িত করে দিতে সমর্থ হয়। এই এলাকায় শত্রুরা পর্যুদস্ত হয়ে বুড়িচং এবং কুমিল্লার দিকে সরে যায়।

এর কয়েকদিন পর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলকে শালদা নদী থেকে ফেনীর দিকে আক্রমণ চালানোর জন্য 'কে' ফোর্স-এর অধীনে বিলোনিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কামালের অধীনে কয়েকটি সেক্টর কোম্পানি শালদা নদীতে রেখে ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল বিলোনিয়াতে কে ফোর্স-এর যোগদান করে। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রাজনগরে তাদের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের পর তাদেরকে দু'সপ্তাহের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপক প্রশিক্ষণের পর বিলোনিয়াতে পুনরায় তাদেরকে পুরানো প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলোতে পাঠানো হয় এবং এই সেক্টরে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সময়ে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে মেজর জাফর ইমাম নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পুনরায় রণক্ষেত্রে পৌঁছানোর পর ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ১৫ অক্টোবর ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের অনন্তপুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের সামনে পরশুরাম, চিথলিয়া প্রভৃতি জায়গায় পাকসেনাদের ঘাঁটিগুলোর উপর ছোট ছোট আক্রমণ চালিয়ে ২৪ জন পাকসেনাকে নিহত এবং ৩০ জনকে আহত করে। পাকসেনাদের তিনটি বাংকারও তারা ধ্বংস করে দেয়। ১৮ অক্টোবর সকাল ৬ টার সময় পাকসেনাদের একটি প্লাটুন আমাদের ঘাঁটি দিয়ে অগ্রসর হবার পথে বিলোনিয়া নদীর পূর্ব তীরে আমাদের সৈনিকদের এ্যামবুশ-এ পড়ে। ফলে, ১২ জন পাকসেনা নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়। ফুলগাজীর নিকট ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের পাইওনিয়ার প্লাটুন ঐ দিনই রাস্তায় মাইন পুঁতে সকাল ১০ টার সময় পাকসেনাদের একটি ট্রাক ধ্বংস করে দেয়। ৭ জন পাকসেনা এতে নিহত এবং ৩ জন আহত হয়। ২০ অক্টোবর আমাদের মর্টার ডিটাচমেন্ট সন্ধ্যা ৬ টায় পাকসেনাদের অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে চিথলিয়া ঘাঁটিটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ১২ জন পাকসেনাকে নিহত ও ৭ জনকে আহত করে। ২৫ অক্টোবর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পাক সেনাদের চিথলিয়া ঘাঁটির উপর আবার আক্রমণ চালায়। ফলে দুটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। এবং ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২৬ অক্টোবর ভোর ৫ টার সময় ফুলগাজীর নিকট আমাদের একটি প্লাটুন পাকসেনাদের টহলদারী দলকে এ্যামবুশ করে ৯ জন পাকসেনা নিহত এবং ৬ জনকে আহত করে। এই যুদ্ধে আমাদের একজন

মুক্তিযোদ্ধা কুটি মিয়া শহীদ হয়। ঐদিনই পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল আমাদের ঘাঁটির সামনে এসে মাইন পোঁতার চেষ্টা করে। কিন্তু পাকসেনাদের এই দলটির সঙ্গে আমাদের একটি দলের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ১২ জন পাকসেনা নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা আহত এবং নিহতদের ফেলে ও অস্ত্রশস্ত্র রেখেই পালিয়ে যায়। ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের তৎপরতার কারণে এই এলাকায় পাকসেনাদের বিপুল সমাবেশ ঘটানো হয়। তারা ১০ম ইস্ট বেঙ্গলকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ২৭ অক্টোবর চিথলিয়ার নিকট এক ব্যাটালিয়নের অধিক শক্তির সামবেশ ঘটায়। সন্ধ্যা ৬ টার সময় গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসেনাদের দু'টো কোম্পানি অগ্রসর হয়ে আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি নিলক্ষ্মীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা সাহসের সঙ্গে পাকসেনাদের আক্রমণে বাধা দেয়। কিন্তু প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে তারা মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসে। পাকসেনারা নিলক্ষ্মী অগ্রবর্তী ঘাঁটিটি দখল করে নেয়। পরদিন সকালে ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের তিন কোম্পানি আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় নিলক্ষ্মীর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। সকাল ১০ টা পর্যন্ত তিনঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। প্রচণ্ড চাপে পাকসেনারা টিকতে না পেরে নিলক্ষ্মী ঘাঁটি পরিত্যাগ করে পিছু হটে যায়। আমাদের সৈনিকরা নিলক্ষ্মী পুনর্দখলের পর প্রতিরক্ষাব্যূহ মালিবিল ও গাবতলী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে। পরদিন সন্ধ্যা ৬ টায় আমাদের একটি প্লাটন দুবলা চাঙ্গের নিকট একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকসেনাদের একটি দল বিলোনিয়া যাবার পথে সেই এ্যামবুশ-এ পড়ে। আমাদের প্লাটুনটি পাকসেনাদের আক্রমণ চালিয়ে ১৩ জন পাকসেনাকে নিহত করে এবং ২ জন পাকসেনাকে জীবিত বন্দি করে। এছাড়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। নিলক্ষ্মীতে পাকসেনারা পুর্দস্ত হওয়ার পর পুনঃ আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। ২৯ অক্টোবর ভোর ৪ টার সময় পাকসেনারা শালদার নয়াপুর এবং ফুলগাজী থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির উপর কামানের সাহায্যে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। আমাদের কামানগুলোও পাকসেনাদের গোলার প্রত্যুত্তর দেয়। সাকলে পাকসেনারা তিনদিক থেকে আমাদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় ৫ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে পাকসেনাদের আক্রমণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড বাধার সামনে টিকতে না পেরে পাক সেনারা পিছন দিকে পালিয়ে যায়। সংঘর্ষে ৪০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ হয়।

এই সময়ে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটি চিথলিয়া, পরশুরাম ও বিলোনিয়া থানার নিকট ছিল। এসব ঘাঁটিগুলোতে রেলওয়ে ট্রলির সাহায্যে পাকসেনারা ফেনী থেকে রসদ যোগাতো। ৫ নভেম্বর রাতে আমাদের একটি রেইডিং পার্টি চিথলিয়ার দক্ষিণে রেলওয়ে লাইনের উপর এ্যামবুশ পাতে। ৬ নভেম্বর সাকল ৭ টায় পাকসেনাদের একটি ট্রলি আমাদের রেইডিং পার্টির এ্যামবুশ-এর আওতায় এসে যায়। ট্রলিটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ চারজন সৈনিক নিহত হয়। আমাদের রেইডিং পার্টি একটি হালকা মেশিনগান, ১টি রাইফেল, ১টি স্টেনগান, ১টি ব্লেনডিসাইড, ২০০০ রাউন্ড গুলি ও ১০টি ব্লেন্‌ডিসাইড গোলা হস্তগত করে। ১০ম ইস্ট

বেঙ্গল পাকসেনাদের আক্রমণকে ব্যর্থ করার পর বিলোনিয়া থেকে পাকসেনাদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করার জন্য পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে পরশুরাম ও চিথলিয়ার মাঝে পাকসেনাদের সরবরাহ লাইনের সড়কটি বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতি নেয়। ৬ নভেম্বর ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানি গোলন্দাজ বাহিনী ও মর্টারের সহায়তায় চিথলিয়ার উত্তরাংশে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রয় ৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পর ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের কোম্পানিটি চিথলিয়ার উত্তরাংশ দখল করে নিয়ে সালিয়া এবং ধনীকুণ্ডার মাঝখানে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে পরশুরাম ও ফেনীর মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হয়। এর ফলে বিলোনিয়ার উত্তরাংশের পাকসৈনিকরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। একজন অফিসারসহ ১২ জন পাকসেনা যুদ্ধে নিহত এবং পাঁচজন বন্দি হয়। অফিসারের পকেট থেকে প্রাপ্ত এমও ফর্ম থেকে জানা যায় যে, সে ১৫ বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন এবং বিলোনিয়াতে সে সময় ১৫ বেলুচ রেজিমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই সংঘর্ষে আমাদের মর্টার প্লাটুন কমান্ডার হাবিলদার ইয়ার আহমদ শহীদ হয় এবং আরো ৫ জন আহত হয়। পাকসেনাদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। পাকসেনারা চিথলিয়ার দক্ষিণে পশ্চাদপসরণ করে। বিপুল অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের চিথলিয়ার অবস্থানটি পুনর্দখলের জন্য পাকসেনারা পরদিন ভোর ৫ টায় দুই কোম্পানি শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের কোম্পানিটি গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তার অসীম সহাসের সঙ্গে এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। আপ্রাণ চেস্টা সত্ত্বেও আমাদের সৈনিকদের গুলির সামনে এবং গোলন্দাজ বাহিনীর গোলার মুখে পাকসেনাদের এই আক্রমণটি ব্যর্থ হয়ে যায়। ৩৫ জন পাকসেনা নিহত এবং অনেক আহত হয়। কয়েকটি হালকা মেশিনগানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যায়।

১০ম ইস্ট বেঙ্গল উত্তর চিথলিয়া দখলের পর তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ৯ নভেম্বর রাত সাড়ে ১১ টার সময় আমাদের একটি পেট্রোল পার্টে পাঁচজন পাক সেনাকে বন্দি করে এবং একটি মেশিনগান ও ৪টি চীনা রাইফেল দখল করে নেয়। ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি ৯ নভেম্বর রাত সাড়ে ১১ টায় সময় পরশুরাম এবং বিলোনিয়া শত্রুঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণে অনেক পাকসৈন্য নিহত হয় এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। চারঘণ্টা যুদ্ধের পর এই দুই ঘাঁটি আমাদের সৈনিকরা দখল করে নেয়। পাকসেনারা পরদিন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর জঙ্গী বিমানের আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা ভারি মেশিনগানের সাহায্যে বিমান আক্রমণের পাল্টা জবাব দেয়। শত্রুদের একটি জঙ্গী বিমান আমাদের মেশিনগানের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে সলিয়ার নিকট ভূপাতিত হয়। বিমান আক্রমণে আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ ও ৫ জন আহত হয়। এর পরদিন ১০ ইস্ট বেঙ্গলের আরো দুটি কোম্পানি সকাল ১০ টায় দক্ষিণ চিথলিয়ার উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। ৩ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা এবং মর্টারের গুলিতে শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং চিথলিয়া রেল স্টেশন ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে

পাকসেনাদের অনেক হতাহত হয়। আমাদের ৫ জন শহীদ এবং ১৩ জন আহত হয়। শেষ পর্যন্ত চিথলিয়া আমাদের দখলে আসে। আমাদের সৈনিকরা শত শত অস্ত্রশস্ত্র, অয়্যারলেস সেট, পোশাক, রেশন প্রভৃতি দখল করে নেয়। ৪ দিনের যুদ্ধের ৫৭ জন পাকসেনা ও ১৫ জন ইপিসিএএফ আমাদের হাতে বন্দি হয় এবং আরো অনেক হতাহত হয়। পাকসেনারা চিথলিয়া থেকে পালিয়ে মুন্সীরহাটের দক্ষিণে এবং পাঠাননগরের কাছে তাদের রক্ষাব্যূহ পুনরায় স্থাপন করে। তাদের মূল ঘাঁটি ফেনীতে পিছিয়ে নেয়। এই সময় 'কে' ফোর্স-এর এই দুই ব্যাটালিয়নের প্রচণ্ড চাপে পাকসেনারা টিকতে না পেরে তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি পাঠাননগর ও দক্ষিণ মুন্সীরহাট ছেড়ে পেছনের দিকে পালিয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে 'কে' ফোর্স ছাগলনাইয়া ও ফেনীর উপকণ্ঠে পাকসেনাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলে এবং পাকসেনাদের অবস্থানগুলোর উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই প্রচণ্ড চাপে পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আমাদের আক্রমণের চাপ আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়। উপায়ান্তর না দেখে ৬ ডিসেম্বর পাকসেনারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে শুভপুর সেতু হয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। ৬ ডিসেম্বর দুপুরে 'কে' ফোর্স ফেনীকে শত্রুমুক্ত করে। ফেনীতে পাক সেনাদের অজস্র গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয়। শত্রুরা পালাবার সময় শুভপুর সড়ক ও রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। যার ফলে পাকসেনাদের পিছু ধাওয়া করা 'কে' ফোর্স-এর পক্ষে অসুবিধা হয়ে পড়ে এবং তাদের অগ্রাভিযান বাধাপ্রাপ্ত হয়। শুভপুর সেতু মেরামতের জন্য দুদিন সময় লেগে যায়। মিত্র বাহিনীর প্রকৌশলীরা একটি সেতু পুনঃনির্মাণ করে এবং এরপর সেতু ও নৌকার সাহায্যে চট্টগ্রামের দিকে 'কে' ফোর্স-এর অগ্রাভিযান পুনরায় শুরু হয়। এই সময় আমি আহত হওয়ার ফলে 'কে' ফোর্স-এর নেতৃত্বে মেজর সালেকের উপর ন্যস্ত ছিল। 'কে' ফোর্স ফেনী থেকে করেরহাট পর্যন্ত পাকসেনাদের ছোটখাট রক্ষাব্যূহ দখল করে তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে এবং করেরর হাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করে। করেরহাট থেকে চট্টগ্রামে অগ্রসর হওয়ার জন্য নতুন এক পরিকল্পনা নেয়া হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল ও 'মুজিব' ব্যাটারীকে (বাংলাদেশের প্রথম গোলন্দাজ বাহিনী) নিয়ে হিয়াকু ফটিকছড়ি নাজিরহাট হয়ে চট্টগ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমণ চালাবে এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল ফেনী-চট্টগ্রাম প্রধান সড়কে সীতাকুণ্ড হয়ে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হবে। এই দ্বিমুখী অগ্রাভিযান চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে পৌঁছে চট্টগ্রাম শহরের উপর সাঁড়াশী আক্রমণ চালাবে। পরিকল্পনা মতো ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল 'মুজিব' ব্যাটারীসহ হিয়াকুর দিকে ৭ ডিসেম্বর রাত ১২ টায় অগ্রসর হয়। পরদিন সকাল ৬ টায় হিয়াকু বাজারের নিকট পৌঁছার পর পাকসেনাদের এক অগ্রবর্তী ঘাঁটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পাকসেনাদের এই ঘাঁটিতে প্রায় ৪০/৫০ জন সৈনিক ছিল। তারা আমাদের বাধা দেয়, কিন্তু আমাদের সৈনিক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকসেনারা ফটিকছড়ির দিকে পালিয়ে যায়। ফলে হিয়াকু বাজার আমরা অতি সহজেই শত্রুমুক্ত করে নিজেদের দখলে আনি। হিয়াকু থেকে চট্টগ্রামের দিকে একটি কাঁচা রাস্তা গেছে। রাস্তাটি খুবই খারাপ। সেই রাস্তা হয়ে

পায়ে হেঁটে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয়। অগ্রসরের পথে নারায়ণহাটের নিকট পাকসেনাদের আরেকটি আক্রমণের চাপে টিকতে না পেরে ফটিকছড়ির দিকে পিছু হটে যায়। যাওয়ার সময় একটি কাঠের সেতু ধ্বংস করে দেয়। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল ওই দিন রাতে নারায়ণহাটে বিশ্রাম নেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতুটি মেরামত করার পর আমাদের অগ্রযাত্রা পুনরায় শুরু হয়। পথে কাজীরহাটে পাকসেনারা আমাদের অগ্রাভিযানে বাধা দেবার জন্য পথে অনেক মাইন পুঁতে রাখে। এই মাইনগুলোকে সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয়। ১০ ডিসেম্বর ফটিকছড়ির উপকণ্ঠে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের অগ্রাভিযানকে পাকিস্তানের ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট বাধা দেয়। ফটিকছড়িতে পাকিস্তানিদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। সেজন্য ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন গাফফার পাকসেনাদের ঘাঁটিটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলকে দুইভাবে বিভক্ত করা হয়। একটি দল ফটিকছড়ির সন্নিকটে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রধান দলটি কাজীরহাট-ফটিকছড়ি রাস্তার দিকে অগ্রসর হয়। ১১ ডিসেম্বর বিকাল ৪-৩০ টায় এই দুটি দল সম্মিলিতভাবে দু'দিক থেকে পাক অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে টিকতে না পেরে রাত ১২ টার পর পাকসেনারা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, বিছানাপত্র ফেলে পিছন দিকে পালিয়ে যায়, ফলে ফটিকছড়ি শত্রুমুক্ত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের দু'জন শহীদ হয়, অপরদিকে শত্রুপক্ষের কমপক্ষে ৩০/৪০ জন হতাহত হয়। এই সময়ে খবর আসে যে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল তাদের রামগড় অবস্থান পরিত্যাগ করে মানিকছড়ির পথে ফটিকছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল থেকে দুটি প্লাটুন এবং মর্টার প্লাটুন এই দলটিকে বাধা দেবার জন্য মানিকছড়ির রাস্তায় পাঠানো হয়। আমাদের প্লাটুনগুলো পাকসেনাদের মানিকছড়ির রাস্তায় সাফল্যের সঙ্গে এ্যামবুশ করতে সমর্থ হয়। পাকসেনারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে নাজিরহাটের দিকে পালিয়ে যায়। ১২ ডিসেম্বর ভোরে ফটিকছড়ি থেকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। ২/৩ ঘণ্টা পর প্রায় ৯/১০ টার সময় নাজিরহাট নদীর পাড় থেকে পাকসেনারা আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে আমাদের অগ্রযাত্রায় বাধা দেয়। ক্যাপ্টেন গাফফার নদীর নিকটস্থ একটি দোতলা বাড়ি থেকে পাকসেনাদের অবস্থানের তথ্য সংগ্রহ করে। খবরাখবর নিয়ে বোঝা যায় যে, পাকসেনাদের ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তাদের প্রায় তিনটি কোম্পানি ও বেশ কিছু সংখ্যক ইপিসিএএফ সহ নাজিরহাট নদীর তীর বরাবর একটি শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে আছে। ১৩ ডিসেম্বর পাকসেনাদের সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তার পরই পাক অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু শত্রুদের অবস্থান এত শক্তিশালী ছিল যে, চার ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চালানোর পরও পাকসেনারা আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। সুতরাং এইভাবে আক্রমণ চালিয়ে কোনো লাভ নেই মনে করে অন্য পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সেজন্য আমাদের সৈন্যদেরকে কিছুটা পিছিয়ে নেয়া হয়। এই সময় একজন পাকসেনা আমাদের হাতে জীবিত ধরা পড়ে। ধৃত সেই পাকসেনার কাছ থেকে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ সম্বন্ধে আরো সঠিক খবর জানা যায়। সেখানে জানা যায়, ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-এর

মেজর আশেক এই প্রতিরক্ষা ব্যূহের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই প্রতিরক্ষা বূহ্যের শক্তি প্রায় এক ব্যাটালিয়নের মতো। নদী বরাবর ব্যাটালিয়নটি অসংখ্য বাংকার তৈরি করে তাদের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু এদের নজর ফটিকছড়ির দিকে বেশি থাকাতে পশ্চিম ভাগ বেশি শক্তিশালী নয়। অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য দিয়ে পশ্চিমের চা বাগানের দিকে রক্ষাব্যূহ রচনা করা হয়েছে, এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে পশ্চিমের চা-বাগানের দিক থেকে পাকসেনাদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী লে. শওকতের নেতৃত্বে গণবাহিনীর একটি কোম্পানি চারঘণ্টা আগে নাজিরহাট এবং চট্টগ্রামের রেলপথের মাঝে পাকসেনাদের অবস্থানের পেছন দিকে অনুপ্রবেশ করে অবস্থান নেয়। এরপর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল ১৪ ডিসেম্বর রাতে পশ্চিম দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চা-বাগানের ভিতর দিয়ে ভোর ৫ টায় নাজিরহাটে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে তারা এত হতভম্ব হয়ে পড়েছিল যে, আমাদের আক্রমণে বাধা পর্যন্ত দিতে পারেনি এবং শত্রুরা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পায় আমরা তাদেরকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছি। উপায়ান্তর না দেখে সবকিছু ফেলে তারা চট্টগ্রামের দিকে পালাতে থাকে। পালাবার পথে আমাদের মর্টারের এবং মেশিনগানের গুলিতে অনেক পাকসৈন্য হতাহত হয়। প্রায় ৪০ জন হতাহত পাকসেনাকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পাই। ৮ জন পাকসেনা বন্দি হয়, ৪৯ জন ইপিসিএএফ অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। প্রচুর গোলাবারুদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র আমাদের হস্তগত হয়। রেশন বোঝাই কয়েকটি ট্রাকও আমাদের দখলে আসে। পালাবার সময় পূর্ব থেকে লে. শওকতের গণবাহিনীর কোম্পানিও পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং অনেককে হতাহত করে। পাকসেনারা রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। ১৪ ডিসেম্বর নাজিরহাট সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হয়। আমাদের একজন শহীদ ও ১ জন সৈনিক আহত হয়। পাকসেনারা নাজিরহাট সড়কসেতু আগে থেকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল। সেজন্য নাজিরহাট থেকে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রযাত্রা একদিন দেরি হয়ে যায়। নাজিরহাটের স্থানীয় জনগণের সাহায্যে সেই সেতুটির আংশিক পুনঃনির্মাণ করা সম্ভব হয় এবং ১৫ ডিসেম্বর নাজিরহাট থেকে চট্টগ্রামের দিকে আমাদের অগ্রাভিযান পুনরায় শুরু হয়। সকালে হাটহাজারী পৌঁছার পর ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল মেজর জাফর ইমামের নেতৃত্বে সীতাকুণ্ড হয়ে চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিল। হাটহাজারীতে যোগাযোগের পর 'কে' ফোস-এর ১০ম ইস্ট বেঙ্গল ও ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে এই সম্মিলিত বাহিনী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রাম শহর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এই সময় বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার আক্রমণ স্থগিত রাখার নির্দেশ পাঠায়। আরো খবর আসে যে, পাকসেনারা ওইদিন আত্মসমর্পণ করবে। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪-৩০ টায় পাকসেনাদের এক ডিভিশন সৈন্য 'কে' ফোর্স-এর নিকট অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। পাকসেনাদেরকে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, নৌ ঘাঁটি ট্রানজিট ক্যাম্প প্রভৃতি জায়গায় বন্দি করে রাখা হয়। সমস্ত চট্টগ্রাম 'কে' ফোর্স-এর

নিয়ন্ত্রণে আসে। স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ বিজয়মাল্যে ভূষিত করে আমাদের বিজয়ী বীর সৈনিকদের নিয়ে উল্লাসে শহর প্রদক্ষিণ করে।

১১ এবং ১২ নভেম্বর ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি এবং 'বি' কোম্পানি কৃষ্ণপুর ও বগাবাড়ি অবস্থান থেকে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে কুমিল্লার দিকে আরো পিছু হটিয়ে দেয়। দু'দিনের যুদ্ধে পাকসেনাদের ১৪ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে ২ জন শহীদ এবং ১ জন আহত হয়। এই সময় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল শালদা নদীর দিক থেকে পাকসেনাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। এই দুই ব্যাটালিয়নের আক্রমণে পাকসেনারা পরাস্ত হয়ে শালদা নদী, কসবা, মন্দভাগ প্রভৃতি এলাকা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কুমিল্লাতে আশ্রয় নেয়। ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখে কুমিল্লার উত্তর এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হওয়ার পর চারটি সেক্টর কোম্পানিকে এই এলাকায় মোতায়েন রেখে ৯ম ইস্ট বেঙ্গলকে কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্বে মিয়াবাজার এলাকায় সমাবেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল মেজর আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে মিয়াবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। মিয়াবাজারে লে. মাহবুবের ছ'টি সেক্টর কোম্পানিও তার সঙ্গে যোগ দেয়। ৩ ডিসেম্বর সকালে এই সম্মিলিত বাহিনী মিত্রবাহিনীর কামানের সহায়তায় মিয়াবাজারে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এই আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে কুমিল্লার দিকে পিছু হটে যায়। মিয়াবাজার শত্রুমুক্ত করার পর ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের একটি দলকে লাকসামের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে মেজর আইনউদ্দিন কুমিল্লা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে থাকে। যাত্রাপথে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ধ্বংস করে অগ্রাভিযানের গতি অব্যাহত রেখে ৪ ডিসেম্বরের ভোরে মেজর আইনউদ্দিনের দল কুমিল্লার বিমানবন্দর এলাকা পর্যন্ত পৌঁছতে সমর্থ হয়। কুমিল্লা বিমানবন্দরের নিকট পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ৯ম ইস্ট বেঙ্গল মিত্রবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় এই ঘাঁটিটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এই আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে কুমিল্লা শহরের দিকে পালিয়ে যায়। দুপুর পর্যন্ত সমস্ত কুমিল্লা বন্দর এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি কুমিল্লার দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক (রাজগঞ্জ বাজার) থেকে কুমিল্লা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকসেনাদের আরো বিতাড়িত করে ময়নামতির পথে রেলওয়ে ক্রসিং এলাকা পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে কুমিল্লা শহরে অবস্থানরত পাকসেনারা ময়নামতি সেনানিবাসের দিকে পালিয়ে যায়। এই সময়ে হাজার হাজার জনতা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকসেনাদের পেছনে অগ্রসর হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে এই জেলা শহরটি সর্বপ্রথম মুক্তিবাহিনী কর্তৃক শত্রুমুক্ত হয়। ১০ ডিসেম্বর ৯ম ইস্ট বেঙ্গল কুমিল্লা শহরের রেলওয়ে ক্রসিং থেকে ময়নামতি ছাউনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই অগ্রাভিযানের সময় মিত্র বাহিনীর তিনটি ট্যাংক ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের সহায়তার জন্য মেজর আইনউদ্দিনের কমান্ডের অধীনে দেয়া হয়। রেলওয়ে ক্রসিং থেকে দেড় মাইল পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার পর ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের অগ্রবর্তী দলগুলো

টেক্সটাইল মিল এলাকার সামনে পাক সেনাদের গোলাগুলির সম্মুখীন হয়। ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানি কোর্টবাড়ির পথে ময়নামতির দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিলো। এই দলটি মিল এলাকায় পাক সেনাদের গোলাগুলির সম্মুখীন হলেও অগ্রবর্তী দলগুলো পাকসেনাদের অবস্থানগুলো দখল করার চেষ্টা করে। কিন্তু একঘন্টা রেকি করার পর বোঝা যায় যে, পাকসেনাদের অবস্থানগুলো খুবই শক্তিশালী। অবস্থানগুলোতে মেশিনগান এবং ১০৬ মি.মি. আরআর বাংকারের ভিতর রেখে কুমিল্লা-ময়নামতির রাস্তাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে। এই সংবাদ আমাদের অগ্রবর্তী দলগুলো মেজর আইনউদ্দিনকে অবগত করে। মেজর আইনউদ্দিন পাকসেনাদের অবস্থানগুলোর উপর চাপ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে নিজে আরো সম্মুখবর্তী অবস্থানে এসে পাকসেনাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করে। সংবাদ সংগ্রহের পর সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ান দিয়ে মিত্র বাহিনীর ট্যাংকের সহায়তায় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন ভোরে মিত্র বাহিনীর ট্যাংকগুলোকে সড়কের বাঁ দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং ৯ম ইস্ট বেঙ্গলকে উত্তর দিক থেকে আক্রমণের পরামর্শ দেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী মিত্রবাহিনীর ট্যাংকগুলো রাস্তার দক্ষিণ দিক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পাকসেনারা ট্যাংকগুলোর উপর ১০৬ মি.মি. আরআর-এর সাহায্যে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। মিত্রবাহিনীর একটি ট্যাংক পাকবাহিনীর গোলায় বিনষ্ট হয়ে যায়। শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ট্যাংকগুলোর অগ্রসর হওয়া উচিত নয় ভেবে মেজর আইনউদ্দিন ট্যাংকগুলোকে নিজ নিজ অবস্থানে লুক্কায়িত অবস্থান থেকে পাকসেনাদের বাংকারগুলোর উপর আক্রমণ চালাবার নির্দেশ দেয়। অপরদিকে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল তাদের আক্রমণ আরো জোরদার করে। এই সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে পাকসেনারা দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৫ ডিসেম্বর সকালে পাকসেনাদের সর্ব বামদিকে সাদা পতাকা উড়তে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণ পর সেই জায়গা থেকে গোলাগুলিও বন্ধ হয়। মেজর আইনউদ্দিন সাদা পতাকা দেখে আক্রমণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয় এবং শত্রুসেনাদের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়। প্রায় আধঘন্টা পর গোলাগুলি স্তিমিত হয়ে এলে উত্তর দিকের পুকুর পাড়ের উঁচু বাঁধের উপর প্রায় ২৫/৩০ জন পাকসেনাকে অস্ত্রশস্ত্রসহ সাদা পতাকা হাতে সামনের দিকে অগসর হতে দেখা যায়। মেজর আইনউদ্দিন তৎক্ষণাৎ সেইসব পাকসেনাদের আরো সামনে আসতে নির্দেশ দেয়। পাকসেনারা নির্দেশমতো মেজর আইনউদ্দিনের কাছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে। এই সময় হাজার হাজার স্থানীয় জনসাধারণ পাকসেনাদের ঘেরাও করে তাদেরকে বেঁধে ফেলে। বাকি পাকসেনারা, যারা তখনো বাঁধ থেকে সামনের দিকে আসছিল তারা ভয়ে সামনের দিকে না এসে পেছনের দিকে পালাতে থাকে মেজর আইনউদ্দিন তাদেরকে পুনরায় আত্মসমর্পণের আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও পাকসেনারা নিজেদের বাঙ্কারে আশ্রয় নেয়। আত্মসমর্পনের আদেশ না মানায় মেজর আইনউদ্দিন ৯ম ইস্ট বেঙ্গলকে পুনরায় আক্রমণের নির্দেশ দেয়। প্রায় ৪০ ঘণ্টা আক্রমণের পর শত্রু অবস্থানটি ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের হস্তগত হয়। প্রায় ১৫০ জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে। অবশিষ্ট পাকসেনা ময়নামতি ছাউনীতে

পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। পাকবাহিনীর ৩৯ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এই অবস্থান প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। অবস্থানটি শত্রুমুক্ত করার পর ৯ম ইস্ট বেঙ্গল ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয়—ময়নামতি সেনানিবাসের উপকণ্ঠ পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। ৯ম ইস্ট বেঙ্গল পাকসেনাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহের সম্মুখীন হয়। পাকসেনারা ময়নামতি সেনানিবাসের উঁচু ভূমির সহায়তায় এই ঘাঁটিটিকে একট দুর্গে পরিণত করেছিল। চতুর্দিকে পরিখা খনন এবং বাংকার তৈরি করে প্রতিরক্ষাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিল।

৯ম ইস্ট বেঙ্গল উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে ময়নামতি এলাকা সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলে। কুমিল্লার হাজার হাজার গেরিলা ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দিয়ে পশ্চিম দিকে অবস্থান নিয়ে ময়নামতিকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ১৫ তারিখ বিকেলে অবরোধ সম্পন্ন হয়। এ সময় পাকসেনাদেরকে আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়া হয়। পাকসেনারা সেই আদেশ প্রত্যাখ্যান করে তাদের প্রতিরক্ষার কাজে অটল থাকে। ময়নামতি ছাউনীতে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য ৯ম ইস্ট বেঙ্গল, গেরিলা এবং মিত্রবাহিনী প্রস্তুতি নেয়। ১৬ ডিসেম্বর ময়নামতি গ্যারিসন কমান্ডার আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করে সংবাদ পাঠায়। সেই দিনই বিকেল ৪ টায় ময়নামতি গ্যারিসনে অবস্থানরত পাকসেনারা অন্যান্য জায়গার মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল এবং মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের পর সমস্ত পাকসেনাকে বিভিন্ন জায়গাতে ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের তত্ত্বাবধানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র বেঙ্গল লাইনে একত্রে জমা করে। ৯ম ইস্ট বেঙ্গল আবার জয়ী হয়ে তাদের পুরানা বেঙ্গল লাইনে ফিরে এসে বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ন' মাস পূর্বে এখান থেকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশমাতৃকার প্রতি প্রাণের টানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলেরই অধিকাংশ সৈনিক ও নতুন রিক্রুট করা সৈনিকদের নিয়ে যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত সময়ে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে উঠেছিল।